বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব

(১২০৪—১৩৩৮ খ্রীঃ)

সুখময় মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

এই পর্বের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে
যিনি আজ সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ, যাঁর
বাংলার ইতিহাস [সুলতানী আমল],
Corpus of the Muslim Coins of Bengal
এবং Social History of the Muslims in Bengal
বই থেকে অশেষ সাহায্য পেয়েছি,
সেই
ডক্টর আবদুল করিম
মহোদয়ের করকমলে

ভূমিকা

মুসলমান আমলের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বই 'রাজা গণেশের আমল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। দ্বিতীয় বইটি হচ্ছে 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল' (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ)। এ বইয়ের এ পর্যন্ত চারটি সংস্করণ হয়েছে। বর্তমান বই-খানি বাংলায় প্রথম মুসলমান বিজয় (যা ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল বলে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি) থেকে সুরু হয়েছে এবং দু'শো বছর ব্যাপী স্বাধীন সুলতানদের আমল সুরু হওয়ার ঠিক আগেকার ঘটনার (১৩৩৮ খ্রীঃ) বর্ণনা দিয়ে শেষ হয়েছে। এই আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আমি ইতিপূর্বে লিখেছিলাম ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ২য় খণ্ডে। কিন্তু তা লেখা হয়েছিল জনসাধারণের জন্য। পক্ষান্তরে বর্তমান বইটির উদ্দেশ্য—গবেষণার মধ্য দিয়ে আলোচ্য পর্বের পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করা। এটি সম্পূর্ণ নতুন বই।

ইতিপূর্বে যাঁরা এই পর্বের ইতিহাস লিখেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই লেখা এখন কালবারিত হয়ে পড়েছে। অনেকে কিংবদন্তী, কল্পনা ও কুলগ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন বলে তাঁদের রচনা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় নি। কেউ কেউ একটি মাত্র বিষয় (যেমন বখতিয়ারের নদীয়া জয়) নিয়ে লিখেছেন। সমগ্র পর্বের ইতিহাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মাত্র তিনজন গবেষক। তাঁরা হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিকারঞ্জন কানুনগো ও আবদুল করিম।

রাখালদাসের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ [১৯১৮তে প্রকাশিত] আলোচ্য পর্ব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে লেখা সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এই বইতে রাখালদাস মূল সূত্র (original source)-গুলিকে সযত্নে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত মুদ্রা ও শিলালিপিকে ব্যবহার করেছেন। কিংবদন্তী ও কল্পনাকে তিনি আমল দেন নি এবং কুলগ্রন্থকে (অন্তত এই পর্বের ক্ষেত্রে পরিহার করেছেন। রাখালদাসই পরবর্তী গবেষকদের পথপ্রদর্শক।

ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো আলোচ্য পর্বের ইতিহাস লিখেছেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal, Vol II (১৯৪৮-এ প্রকাশিত)-তে। তাঁর লেখা বহুলপ্রচারিত এবং সবচেয়ে বেশি পঠিত। ডঃ কানুনগো বহু নতুন সূত্র ব্যবহার করেছেন এবং নতুন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছু পরিমাণে সাবধানতার অভাব ছিল বলে মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, সরযূ-তীরে বুগরা খান ও কায়কোবাদের মিলনের বর্ণনা দেবার সময়ে তিনি সমসাময়িক গ্রন্থ 'কিরান-ই-সদাইন' ও পরবর্তী গ্রন্থ 'ফুতুহ-উস্-সলাতীন'-এর বিবরণকে এবং তুগরলের প্রসঙ্গে 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' ও 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণকে একত্র মিশিয়ে ফেলেছেন। দু'এক জায়গায় তিনি অপ্রামাণিক কুলগ্রন্থের উক্তির উপর নির্ভর করেছেন—যা তাঁর পক্ষে করা সঙ্গত হয় নি। কালিকারঞ্জন র‍্যাভার্টির "ইজাফৎ-ম্যানিয়া"কে নিয়ে (সঙ্গত-ভাবেই) ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের স্কন্ধে "মমলুক-ম্যানিয়া" ভর করেছিল—আলোচ্য পর্বের অধিকাংশ শাসনকর্তাকেই তিনি বিনা বিচারে "মমলুক" অর্থাৎ ক্রীতদাস বলেছেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেই ক্রীতদাস ছিলেন না। এ বইতে আমি ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর অনেক মত ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর গবেষণার মূল্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

ডঃ আবদুল করিম এই পর্বের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর 'বাংলার ইতিহাস [সুলতানী আমল]' (১৯৭৬) বইয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ করিম পূর্বজ্ঞাত সূত্রগুলি ছাড়া সর্বাধুনিক ও সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সূত্রগুলিকেও ব্যবহার করেছেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত বলে সমস্ত সূত্র, বিশেষভাবে মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্যকে সম্যকভাবে ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ডঃ করিমের কাছে যে আমি কতখানি ঋণী, তা এই বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি ওলটালেই বোঝা যাবে। তবে কয়েকটি মূল্যবান সূত্র তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, সেগুলি আমি এই বইয়ে ব্যবহার করেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বই সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এটি হ'ল ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের History of Medieval Bengal; এ বইটি গবেষণা-গ্রন্থের পর্যায়ে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে এ বইটি (কয়েক পৃষ্ঠা বাদ দিলে) কার্যত পূর্বোল্লিখিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (প্রথম সংস্করণ)-এর অনুবাদ। দু'টি বই মেলালেই তা বোঝা যাবে। 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ২য় খণ্ড জনসাধারণের

জন্য লেখা বই এবং এর বিভিন্ন অংশ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, ডঃ অমরনাথ লাহিড়ীর এবং আমার লেখা। আমি এ বইয়ের প্রায় অর্ধাংশের লেখক। অথচ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার History of Medieval Bengal-এ 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ২য় খণ্ডের তাঁর নিজের লেখা অংশগুলি ছাড়া আমার এবং অন্য লেখকদের লেখা অংশগুলিও অনুবাদ করেছেন। বাংলা বইটির তিনি ছিলেন সম্পাদক, আর History of Medieval Bengal-এর লেখক হিসাবে তিনি একমাত্র নিজের নাম দিয়েছেন (ভূমিকায় আমাদের নামের যৎসামান্য উল্লেখ করে)। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। যাই হোক, জনসাধারণের উপযোগী বাংলা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ History of Medieval Bengal-কে আলোচ্য পর্বের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলা যায় না—এইটিই বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিষয়।

বর্তমান বইটিতে মুসলমানী নাম লেখার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আরবী নামে 'গায়েন' অক্ষর থাকলে তা রোমান অক্ষরে লিপ্যন্তর করার সময় 'গায়েন'-এর জায়গায় gh লেখা হয়। তার থেকে আবার যাঁরা বাংলায় লিপ্যন্তর করেন, তাঁরা gh-কে 'ঘ' বানিয়ে দেন; 'মুঘল', 'তুঘলক', 'তুঘরল' (বা 'তুঘরিল') প্রভৃতি বানান এইভাবেই এসেছে। কিন্তু আরবী-ফার্সী ভাষায় 'ঘ' উচ্চারণ নেই। 'গায়েন'-এর উচ্চারণ পুরোপুরি 'গ' না হলেও 'গ'-এর কাছাকাছি। তাই আমি 'মুগল', 'তুগরল' 'তুগলক' প্রভৃতি লিখি। আমার এই বানান-পদ্ধতি অনেকেই গ্রহণ করেছেন। আমিও অন্যদের যুক্তিসঙ্গত বানান-পদ্ধতি গ্রহণ করার ব্যাপারে কার্পণ্য করি নি। তাই—আগে আমি 'মুইজুদ্দীন', 'ইউয়জ' ও 'য়ুজবক' লিখতাম, এখন তার জায়গায় যথাক্রমে 'মুইজ্জুদ্দীন', 'ইওজ' ও 'ইউজবক' লিখি। এ-বইতে যদি কোথাও 'মুইজুদ্দীন', 'ইউয়জ' ও 'য়ুজবক' থেকে গিয়ে থাকে, তবে তা অনবধানতাবশত, এবং এ জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

বর্তমান বইতে মীনহাজের 'তবকাৎ-ই-আকবরী' থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। কোন্‌খানে উদ্ধৃতির শেষ ও আমাদের আলোচনার আরম্ভ তা সর্বত্র পরিষ্কার হয় নি। তাই জানাচ্ছি, পৃঃ ৫, ছত্র ৯; পৃঃ ১৯, ছত্র ১৭; পৃঃ ৩০ ছত্র ১৩; পৃঃ ৩৮ ছত্র ২০; পৃঃ ৫৬ ছত্র ৩; পৃঃ ৬৩ ছত্র ৩ ও পৃঃ ৭০ ছত্র ৯-এ মীনহাজের উদ্ধৃতি শেষ এবং অতঃপর আমাদের আলোচনা সুরু হয়েছে।

এই সব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি ও আলোচনার ভেদরেখা স্পষ্ট নয়। অন্যত্র তা স্পষ্ট।

এই বইয়ের সপ্তম পরিচ্ছেদটি একটি নতুন জিনিস। এই পরিচ্ছেদে আমি হিন্দু ও মুসলমান সূত্র মিলিয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, যা ইতিপূবে কেউ করেন নি।

আর একটি কথা। এই বইয়ের খানিকটা ছাপা হয়ে যাবার পর জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' বইখানি আমার হস্তগত হয়। এ-বইয়ের অবশিষ্ট অংশে আমি ঐ বইটি যতটা প্রয়োজন ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া (১) নং পরিশিষ্টে যাকারিয়া সাহেবের ভিন্নমুখী মতগুলি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করে উদ্ধৃতির ফাঁকে ফাঁকে [ ] বন্ধনীর মধ্যে আমার বক্তব্য ও মত লিপিবদ্ধ করেছি। এর ফলে (১) নং পরিশিষ্টটি দীর্ঘ হয়েছে। এই পরিশিষ্টে যে সব পাদটীকা দেখতে পাওয়া যাবে, সেগুলি যাকারিয়া সাহেবের পাদটীকা—আমার নয়। যাকারিয়া সাহেব 'তবকাত-ই-নাসিরী'র মূল ফার্সী থেকে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, সেগুলি (ও অন্যান্য মূল ফার্সী শব্দ) পরিশিষ্ট (১)-এ ছাপা হয়নি। যাকারিয়া সাহেব কানাই বড়শী শিলালিপি সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের যে লেখাটির উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২২০ দ্রঃ), সেটি পাই নি। তবে দীনেশচন্দ্র সরকার যে কানাই বড়শী শিলালিপিকে অকৃত্রিম বলে গণ্য করতেন, তার প্রমাণ তাঁর 'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ' (পৃঃ ২০০)-থেকে মেলে। 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' বইয়েও (পৃঃ ১৩৬) দ্বাদশ শতকেই যে আসামে শকাব্দের প্রচলন হয়েছিল, তা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি লিখেছেন, "১১০৭ শকাব্দে প্রদত্ত বল্লভদেবের তাম্রশাসন এবং ১১২৭ শকাব্দের কানাই বড়শী শিলালেখ এই সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যেতে পারে।" দীনেশবাবু প্রাচীন ভারতীয় লিপি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি কানাই বড়শী শিলালেখের আলোকচিত্রও দেখেছিলেন। অতএব ঐ শিলালেখ যে ১১২৭ শকাব্দে লিপিকৃত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। যাকারিয়া সাহেব ভুলক্রমে যে-সব জায়গায় 'কালিকারঞ্জন কানুনগো'র নাম করেছেন (সর্বত্রই 'যদুনাথ সরকার'-এর নাম করা উচিত ছিল—পৃঃ ১৫৯ দ্রঃ), সেখানে সেখানে ডঃ কানুনগোর নাম আমরা নির্ঘণ্টে দিই নি।

১৭ পৃষ্ঠার ১ম ছত্রে মুদ্রিত মীনহাজ-উল্লিখিত "তানকানাহ (?)" ঘোড়া

আসলে যে পাহাড়ী টাঙ্গন ঘোড়া, সে বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি। 'টাঙ্গন' মীনহাজের হাতে পড়ে খানিকটা পরিবর্তন লাভ করেছিল, পরে পুথিতে 'গাফ্'-এর স্থানে 'কাফ্' লেখা হওয়াতে তা 'তানকানাহ' হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

এই বইটি লেখার সময়ে যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি, তিনি পাটনা-নিবাসী স্বনামধন্য পণ্ডিত জনাব সৈয়দ হাসান আসকারি। তাঁর বিভিন্ন লেখা কোথায় বেরিয়েছিল, তা বলে দিয়ে এবং মুখে মুখে অনেক সংবাদ দিয়ে তিনি আমার কতখানি সহায়তা করেছেন, তা বলা যায় না। কলকাতার বিশিষ্ট মুদ্রাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত পরিমল রায় তাঁর সংগ্রহের দু'টি মুদ্রা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। মুদ্রার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত বসন্ত চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত স্মরণ দাসের কাছেও মূল্যবান সাহায্য পেয়েছি। শ্রীযুক্ত স্মরণ দাসের মতে আলী মর্দানের মুদ্রায় উল্লিখিত "জুলুস" নাম 'আলাউদ্দীন' নয়, 'রুকনুদ্দীন'। জন ডয়েলের মতও তা'ই। ডয়েল -কৃত মুদ্রার একটি ক্যাটালগে দেখছি, আলী মর্দানের প্রাপ্ত মুদ্রার প্রথম ও শেষ বছর যথাক্রমে ৬০৭ ও ৬১০ হিঃ। সুতরাং তিনি অন্তত ১২১৩-১৪ খ্রীঃ অবধি রাজত্ব করেন (পৃঃ ৩৪ দ্রঃ)।

মুসলমান আমলের লিপি-বিশেষজ্ঞ জেড. এ. দেশাই (দু'এক স্থানে তাঁর নাম ভুলভাবে ছাপা হয়েছে) মহোদয় সিয়ানের শিলালিপি সম্বন্ধে Epigraphia Indica (1975, Arabic & Persian Supplement)-তে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন (পৃঃ ৪০-৪২ দ্রঃ), সেটির সন্ধান আমায় দেন (এবং প্রবন্ধটি জোগাড় করেও দেন) মুলুক গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (শিলালিপির ফটোও তাঁর কাছে পেয়েছি)।

সব শেষে সাধুবাদ জানাই প্রকাশক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষকে—যিনি আজ বাংলা ইতিহাস-গ্রন্থের প্রধান প্রকাশক হিসাবে খ্যাত। শুধু এ বই প্রকাশ করা নয়, এর ছাপাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতেও তিনি অপরিসীম যত্ন নিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত সমস্ত প্রকাশকের অনুকরণযোগ্য।

এই বইতে 'বাংলা দেশ' শব্দটি সর্বত্রই অবিভক্ত ভারতের বাংলা-ভাষী অঞ্চল অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

এই সুযোগে দু'একটি প্রমাদ সংশোধন করে নিচ্ছি। ১ পৃঃ ১৬ ছত্রে "উঘলাবাক"-এর স্থানে "উগলাবাক" হবে, ৭২ পৃঃ ২য় উপ-শিরোনামায়

"মুগীসুদ্দীন"-এর স্থানে "মুইজ্জুদ্দীন তুগরল শাহ" হবে, ৮২ পৃঃ ১৮ ছত্রে "মুগীসুদ্দীন নাম নিয়ে"-র স্থানে "স্বাধীন" হবে এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকাটি বাদ যাবে। ১৭৩ পৃঃ ১৬ ছত্রে "মধ্য…বিভাগ" বাদ যাবে।

শান্তিনিকেতন,
২৩শে মে, ১৯৮৮

সুখময় মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সঙ্কেতপঞ্জী

বা. ই. সু. আ.—বাংলার ইতিহাস [সুলতানী আমল], ডঃ আবদুল করিম প্রণীত

H B II—History of B ngal (Vol. II), edited by Jadunath Sarkar

I H Q—Indian Historical Quarterly

J A S B—Journal of the Asiatic Society of Bengal

J B R S—Journal of the Bihar Research Society

J N S I—Journal of the Numismatic Society of India

J R A S B—Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal

V B A, I—Visva Bhárati Annals, Vol. I

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী

মুহম্মদ ঘোরীর উত্তর ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছর পরেই সুদূর বাংলা দেশের পশ্চিম ও উত্তর অংশে মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়। যাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভায় এই দুঃসাধ্য কাজ সম্ভবপর হয়েছিল, তিনি হলেন ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী।

বখতিয়ার খলজীর এই বিজয়-অভিযানের কাহিনী মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে যেভাবে পাওয়া যায়, তা আমরা উদ্ধৃত করছি:

কথিত আছে যে এই মুহম্মদ বখতিয়ার ঘোরের গর্মশির প্রদেশের একজন খলজী ছিলেন। তিনি খুব চটপটে, উদ্যোগী, বীর, সাহসী, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। স্বজাতিদের পরিত্যাগ করে তিনি গজনীতে সুলতান মুইজ্জুদ্দীনের (মুহম্মদ ঘোরী) দরবারে আসেন। তাঁকে আর্জি নেবার দফতরে চাকরী দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁর খর্বাকৃতি দেখে অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং তিনি গজনী থেকে হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেন। তিনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হলে ঐ শহরের দেওয়ানীর প্রধান তাঁকে অমনোনীত করলেন। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি হিজবারুদ্দীন হোসেন আরনভের অধীনে কাজের জন্য বদাউনে গেলেন এবং একটি নির্দিষ্ট বেতনের পদ লাভ করলেন। কিছু সময় পরে তিনি অযোধ্যায় হুসামুদ্দীন উঘলাবাকের অধীনে কাজে নিযুক্ত হন। তাঁর ভাল ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, বহু জায়গায় তিনি অনেক কাজ দেখালেন এবং সাহস প্রদর্শন করলেন, যার ফলে তিনি ভিউলি ও ভাগত পেলেন জায়গীর হিসাবে। সাহসী এবং উদ্যোগী হওয়ার দরুন তিনি মনের ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে বিস্তর লুঠের মাল সংগ্রহ করলেন। তিনি এইভাবে অনেক ঘোড়া; অস্ত্র এবং লোক জোগাড় করলেন। তাঁর সাহস এবং লুণ্ঠন-অভিযানের খ্যাতি বাইরে ছড়িয়ে পড়ল, হিন্দুস্তানের একদল খলজী তাঁর দলে যোগদান করল। তাঁর খবর সুলতান কুৎবুদ্দীনকে জানানো হল, তিনি তাঁকে একটি পোষাক পাঠিয়ে দিলেন এবং প্রচুর সম্মানে ভূষিত করলেন। এইভাবে উৎসাহিত হয়ে তিনি বিহারে সৈন্য পরিচালনা

করে তা বিধ্বস্ত করলেন। এরকমভাবে তিনি এক বা দু'বছর ধরে নিকটবর্তী স্থানগুলি লুঠ করতে লাগলেন, অবশেষে বিহার আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলেন।

বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরা বলেন যে তিনি বিহার দুর্গের দ্বারে মাত্র দু'শো ঘোড়সওয়ার নিয়ে যান এবং শত্রুর অজান্তে যুদ্ধ সুরু করেন। বখতিয়ারের অধীনে ফারগানা রাজ্যের বুদ্ধিমান দুই ভাই কাজ করতেন। একজনের নাম নিজামুদ্দীন, অপর জনের নাম শামসুদ্দীন। এই গ্রন্থের লেখক ৬৪১ হিজরায় লখনৌতিতে শামসুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাহিনীটি শোনেন।

বখতিয়ার যখন বিহার দুর্গের দ্বারে পৌঁছোলেন এবং যুদ্ধ সুরু হল, তখন এই দুই বিজ্ঞ ভাই বীর যোদ্ধাদের দলে সংগ্রামরত ছিলেন। মুহম্মদ বখতিয়ার খুব বীরত্ব ও দর্পের সঙ্গে দুর্গদ্বার ভেদ করে দুর্গ অধিকার করলেন। বিজয়ীরা অনেক লুঠের মাল পেল। ঐ জায়গায় বেশির ভাগ বাসিন্দাই ছিল নেড়া-মাথা ব্রাহ্মণ [আসলে বৌদ্ধ ভিক্ষু]। তাদের বধ করা হল। সেখানে অনেক বই পাওয়া গেল। মুসলমানরা যখন এগুলি দেখল, তখন তারা এই বইগুলির মধ্যে কী লেখা আছে, তা ব্যাখ্যা করবার জন্যে ঘোষণা প্রচার করল। কিন্তু সবাই [যারা ঐ সব বই পড়তে পারত] আগেই নিহত হয়েছিল। এটা জানা গেল যে পুরো দুর্গ এবং নগর ছিল একটি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। [এটি বৌদ্ধ বিহার (নাম উদন্তপুর) ছিল। প্রথমে ঐ শহর এবং পরে গোটা প্রদেশটাই 'বিহার' নামে অভিহিত হয়।]

এই বিজয় লাভ করে বখতিয়ার লুঠের সামগ্রী বোঝাই করে ফিরে এলেন। তিনি কুৎবুদ্দীনের কাছে গেলে, কুৎবুদ্দীন তাঁকে প্রভূত মান এবং পুরস্কার দিলেন। তাঁর উপর সুলতান কুৎবুদ্দীন যে অনুগ্রহ দেখালেন, তাকে দরবারের একদল অভিজাত ব্যক্তি ঈর্ষার চোখে দেখলেন। তাঁদের আমোদ-প্রমোদের আসরে তাঁরা তার প্রতি নাসিকা সঙ্কুচিত করতে এবং তাঁর দিকে টিটকারি ও বিদ্রূপাত্মক উক্তি বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁদের দ্বেষ এমন পর্যায়ে পৌঁছোল যে বখতিয়ারকে সাদা প্রাসাদে একটি হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা হল। তিনি তাঁর যুদ্ধের কুঠার দিয়ে হাতীর শুঁড়ে এত জোরে আঘাত করলেন যে সে দৌড়ে পালাল, তিনি তার পিছনে ছুটে গেলেন। এই জয়ের পরে সুলতান কুৎবুদ্দীন তাঁর রাজকোষ থেকে তাঁকে অনেক বহুমূল্য উপহার দান করলেন এবং দরবারের

আমীরদের তাঁকে উপহার দিতে আদেশ করলেন ; উপহারের তালিকা করা যায় না। মুহম্মদ বখতিয়ার ঐ সভাতেই ঐসব উপহার ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলি বন্ধুদের ও জনসাধারণকে দান করেন। সুলতানের কাছ থেকে একটি পোষাক পেয়ে তিনি বিহারে ফিরে যান। লখনৌতি, বিহার, বঙ্গ ও কামরূদ রাজ্যের কাফেরদের মনে তাঁর সম্বন্ধে মহাভয়ের সঞ্চার হল।

বিশ্বাসভাজন প্রামাণিক ব্যক্তিরা বলেছেন যে রায় লখমনিয়ার কাছে মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বীরত্বপূর্ণ কার্য ও বিজয়গুলির কথা বলা হয়েছিল। তাঁর রাজধানী ছিল নোদীয়হ্-তে। তিনি খুব বড় রায় (রাজা) ছিলেন এবং আশী বছর ধরে সিংহাসনে আসীন ছিলেন।...রায়ের পিতার মৃত্যুর সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন ; তাঁর মার পেটের উপর রাজমুকুট রাখা হয়েছিল। সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর সামনে আনুগত্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর পরিবার হিন্দুস্থানের সব রাজা ও প্রধানদের কাছে সম্মান পেতেন এবং তাঁরা খলিফার সমান মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতেন। যখন লখমনিয়ার জন্মাবার সময় এগিয়ে এল এবং প্রসব হবার লক্ষণগুলি দেখা গেল তখন জ্যোতিষী এবং ব্রাহ্মণদের জড়ো করা হল, যাতে তাঁরা শুভ সময় নির্দেশ করতে পারেন। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে জানালেন যে, যদি শিশুটি ঐ মুহূর্তে জন্মায় তবে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে—সে রাজা হতে পারবে না, কিন্তু দু'ঘণ্টা পরে জন্মালে শিশুটি আশী বছর রাজত্ব করতে পারবে। যখন তাঁর মাতা জ্যোতিষীদের এই মত শুনলেন, তখন তিনি তাঁর পা দুটিকে বেঁধে দিতে ও তাঁকে ঝুলিয়ে রাখতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি জ্যোতিষীদের শুভক্ষণ দেখতে নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁরা একমত হলেন যে প্রসবের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁকে নীচে নামিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। লখমনিয়া সরাসরি ভূমিষ্ঠ হলেন কিন্তু তাঁর মা যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন তার ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। লখমনিয়াকে সিংহাসনে চড়ানো হল এবং তিনি আশী বছর রাজত্ব করলেন। বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা বলেন যে ছোট বা বড় কোন লোকই তাঁর কাছে অত্যাচারের যন্ত্রণা ভোগ করেননি। যারা তাঁর কাছে দান চাইত তাদের প্রত্যেককেই এক লক্ষ কড়ি দান করতেন। সেই সময়ের হাতিম দানবীর সুলতান কুৎবুদ্দীনেরও সেই নিয়ম ছিল।...ঈশ্বর যেন তাঁর (লখমনিয়ার) শাস্তি [অমুসলমান হিসাবে নরকে প্রাপ্য] লাঘব করেন।

সুলতান কুৎবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রত্যাবর্তন করার পরে তাঁর (বখতিয়ার খলজীর) খ্যাতির কথা রায় লখমনিয়ার কর্ণগোচর হল এবং তা রায়ের রাজ্যের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্যের জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক দল রায়ের কাছে এসে নিবেদন করলেন যে শাস্ত্রে লেখা আছে এই দেশ শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের অধীন হবে ; সে সময় আসন্ন ; তুর্কীরা আগেই বিহার দখল করেছে এবং পরের বছর তারা তাঁর দেশও আক্রমণ করবে, এজন্য সব লোক রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে এবং তুর্কীদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে। রায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, যে ব্যক্তি এই রাজ্য জয় করবে, তার শরীরে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে এমন কিছু খবর পাওয়া গেছে কিনা। তাঁরা জবাব দিলেন যে, বৈশিষ্ট্য এই যে সোজাভাবে দাঁড়ালে তার দুই হাত হাঁটুর নীচে লম্বিত হয় এবং আঙুলগুলি পায়ের নলি স্পর্শ করে।···বিশ্বাসী চরদের পাঠানো হল···মুহম্মদ বখতিয়ারের দেহে এই বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। যখন এটি সত্য বলে প্রমাণিত হল তখন বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ ও বণিক সক্কনৎ রাজ্যে এবং বঙ্গ ও কামরূদে চলে গেলেন। কিন্তু রায় লখমনিয়া তাঁর দেশ ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করলেন না।

পরের বছর মুহম্মদ বখতিয়ার একটি সৈন্যদল গঠন করে বিহার থেকে অগ্রসর হলেন। তিনি এমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন যে যখন তিনি অতর্কিত-ভাবে হঠাৎ 'নোদীয়হ্' পৌঁছলেন, তখন মাত্র ১৮ জন ঘোড়সওয়ার তাঁর সঙ্গে আসতে পেরেছিল, বাকি সৈন্যরা পিছনে আসছিল। মুহম্মদ বখতিয়ার স্বেচ্ছায় কোন লোকের বিরক্তি উৎপাদন করলেন না এবং শান্তিপূর্ণভাবে কোন বড়াই না করে চলতে লাগলেন, যাতে তিনি কে—এই বিষয়ে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করতে না পারে। জনসাধারণ মনে করল তিনি ব্যবসায়ী, বিক্রী করার জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। এই কৌশলে তিনি রায় লখমনিয়ার প্রাসাদের দরজার কাছে এসে তরবারি বার করে আক্রমণ সুরু করলেন। তখন রায় মধ্যাহ্নভোজনে বসেছিলেন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সোনার ও রূপোর পাত্রে খাদ্য ভরে তাঁর সামনে রাখা হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর প্রাসাদের দরজায় ও নগরে একটা চিৎকার উঠল। কী ব্যাপার ঘটেছে, তা তিনি বোঝবার আগেই মুহম্মদ বখতিয়ার তীব্রবেগে প্রাসাদে ঢুকে তলোয়ার দিয়ে কয়েকজনকে বধ করলেন। রায় খালি পায়ে প্রাসাদের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেলেন এবং

তাঁর সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন, পত্নীরা, অন্যান্য নারী, দাসদাসী, সবই বখতিয়ারের হাতে পড়ল। অসংখ্য হাতী অধিকার করা হল। মুসলমানরা এত লুণ্ঠনদ্রব্য লাভ করল, যা গণনা করা যায় না। তাঁর সৈন্যবাহিনী এসে পৌঁছোলে সমস্ত নগরটি জয় করা হল এবং তিনি সেখানে তাঁর বসতি স্থাপন করলেন। রায় লখমনিয়া সঙ্কনৎ ও বঙ্গ অভিমুখে গেলেন। সেখানে অল্পদিন পরেই তাঁর রাজত্ব শেষ হল, কিন্তু তাঁর বংশধররা এখনও বঙ্গরাজ্য শাসন করছেন। মুহম্মদ বখতিয়ার রায়ের [লখমনিয়া] রাজ্য অধিকার করে 'নোদীয়হ্' ধ্বংস করলেন এবং লখনৌতিতে তাঁর শাসনকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করলেন। তিনি চারপাশের স্থানগুলি তাঁর অধিকারে আনলেন।

এই বিবরণের প্রামাণিকতা কতখানি, তা এখন আমরা বিচার করব। তবে তার আগে দু'টি বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, এতে যে 'রায় লখমনিয়া'র উল্লেখ আছে—তিনি কে? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইনি সেন বংশের বিখ্যাত নৃপতি লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেন বখতিয়ারের বিজয়-অভিযানের আগেই পরলোকগমন করেছিলেন, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়চন্দ্র সেন প্রভৃতি গবেষকরা অনুমান করেছিলেন যে, 'লখমনিয়া' অর্থে 'লাক্ষ্মণেয়' (লক্ষ্মণসেনের পুত্র)-কে বোঝাচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন যে ১১২৭ শকাব্দের ১০ই ফাল্গুন অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তা প্রামাণিকভাবে জানা যায় শ্রীধরদাসের সদুক্তি-কর্ণামৃতের সঙ্কলনকালবাচক শ্লোক থেকে (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। বখতিয়ারের বিজয় তার পরবর্তী নয়। (এ সম্বন্ধেও পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়ত, রায় লখমনিয়া বা লক্ষ্মণসেনের অবস্থানের জায়গা হিসাবে যে 'নোদীয়হ্' শহরের উল্লেখ এই বিবরণে দেখা যায়, তা কোথায়? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এটি বিখ্যাত নদীয়া বা নবদ্বীপ শহরের সঙ্গে অভিন্ন। ফার্সী ভাষায় আমাদের 'অ'-র মত কোন ধ্বনি নেই, তার জায়গায় আছে হ্রস্ব 'আ'। সুতরাং লেখাতে যা নোদীয়হ্—উচ্চারণে তা 'নোদীয়াহ্' অর্থাৎ নদীয়া।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র এই বিবরণ কতখানি সত্য? এই বিষয়টি নিয়ে বহু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন, এঁদের মধ্যে রমেশ-চন্দ্র মজুমদার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal,

Vol. I, 1943 ও History of Ancient Bengal, 1971 দ্র:) এবং যদুনাথ সরকার (History of Bengal, Vol. II, 1948 দ্রঃ)—এই দু'জনের নাম সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই দুই দিকপাল ঐতিহাসিক সম্ভবত (এ ব্যাপারে) একে অন্যের লেখা পড়েননি, পড়লে এঁদের অনেক সংশয় অপনোদিত হত। যেমন যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, নদীয়া ঐ সময়ে বাংলার স্থায়ী রাজধানী ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়টি আগেই প্রমাণ করেছিলেন। History of Bengal, Vol. I-এ তিনি লিখেছিলেন, "Nadiyā is refered to as one of the capitals of the Sena Kings in the genealogical treatises (Kulajis) in Bengal. It is true that these accounts cannot be regarded as of great historical value unless corroborated by other evidence, but the Tabaqāt (-i-Nasiri) seems to confirm their statement. In the Pavanadūta of Dhoyi, Vijayapura on the Ganges is referred to as the capital of Lakshmaṇasena. Mr. M. Chakravarti identifies it with Nadiyā, which agrees well with the directions contained in the poem. ...as Vijayapura is mentioned immediately after the description of Triveṇī-sangama, · · ·its identification with Nadiyā appears to be preferable."

পক্ষান্তরে, পূর্বোক্ত দু'টি বইয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "The story of the unopposed entry of Muhammad and his eighteen followers into the city raises grave doubts about the truth of the details of the campaign. At a time when Nadiyā was apprehending an attack from the Turks, it is difficult to believe that the royal officers would remain ignorant of the movements of Muhammad even when he had crossed the frontiers of the Sena Kingdom, and would readily admit a band of foreigners without any question." কিন্তু যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন যে, এই বিবরণের মধ্যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছু নেই।

লক্ষ্মণসেনের বহিরাগত শত্রুকে বাধা দেবার সুদৃঢ় ব্যবস্থা থাকবার কথা তেলিয়াগড়ি গিরিপথে, যার একদিকে খরস্রোতা গঙ্গা ও অন্যান্য নদী, অপর-দিকে ঝাড়খণ্ডের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বখতিয়ার সম্ভবত তেলিয়াগড়ি গিরিপথ দিয়ে না এসে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল পার হয়ে খুব ক্ষিপ্রগতিতে নদীয়ায় এসে পড়েছিলেন, এইভাবে তিনি লক্ষ্মণসেনের রক্ষিবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়েছিলেন ; বখতিয়ার মাত্র ১৮ জন সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদীয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। মীনহাজ লিখেছেন যে লোকে তাঁদেব অশ্ববিক্রেতা মনে করেছিল ; এ সম্বন্ধে যদুনাথ বলেন, "The surprise of a city by foreign soldiers disguised as horse-dealers cannot be dismissed as an impossible figment of the imaginaton." আসলে, মাত্র ১৮ জন ঘোড়সওয়ার যারা ধীরে সুস্থে নদীয়া শহরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে, তারা যে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করবে, এ কথা কেউই ভাবতে পারেনি, তখন দুপুর-বেলা (এই সময়নির্বাচনও বখতিয়ারের ধূর্ততার পরিচায়ক), লোকের স্নান, খাওয়া ও বিশ্রামের সময়, তাই এদের নিয়ে কেউ তেমন মাথাই ঘামায়নি। বখতিয়ার অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে একটি surprise আঘাত হেনেছিলেন। আধুনিককালে এত বৈজ্ঞানিক রক্ষণব্যবস্থা ভেদ করেও এরকম surprise আক্রমণ হয়ে থাকে এবং তা সফলও হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও দু'টি কারণে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র বিবরণের প্রামাণিকতায় সন্দিহান—(১) এতে লক্ষ্মণসেনের জন্মের আজগুবী বর্ণনা এবং আশী বছর রাজত্ব করার ভ্রান্ত বিবৃতি পাওয়া যায়, (২) মীনহাজ-ই-সিরাজ 'বিশ্বাস-যোগ্য লোকদের উক্তি' ভিন্ন আর কোন সূত্র নির্দেশ করেননি। প্রথম আপত্তিটি সম্বন্ধে বলা চলে, লক্ষ্মণসেন সম্ভবত আশী বছর বয়স অবধি বেঁচেছিলেন, সেই কথাই বিকৃত হয়ে মিনহাজের বিবরণে 'আশী বছর রাজত্ব করা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্মণ-সেনের মৃত্যুর বছর চল্লিশেক বাদে মীনহাজ তাঁর জন্মের বিবরণ শোনেন। ৮০ + ৪০ = ১২০ বছর আগে যে বিখ্যাত রাজা জন্মেছিলেন, তাঁর জন্ম সম্বন্ধে ততদিনে আজগুবী বিবরণ চালু হওয়া স্বাভাবিক—তখনকার লোকের বিশ্বাসপ্রবণতার কথা মনে রাখলে এ কথা সহজেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয় আপত্তিটি সম্বন্ধে বলা যায় যে, মীনহাজ বখতিয়ার খল্জীর বিহার ও বাংলা অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন লক্ষ্মণাবতীতে বসে, যা আগে লক্ষ্মণসেনেরও অন্যতম রাজধানী ছিল। সে সময়ে বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের সমসাময়িক, এমনকি প্রত্যক্ষদর্শী

লোকও নিঃসন্দেহে অনেকে জীবিত ছিলেন; যতদূর মনে হয়, মীনহাজ তাঁদের অনেকের দেখা পেয়েছিলেন ও তাঁদের কাছে এ-সম্বন্ধে সংবাদ পেয়েছিলেন, তাই তিনি সূত্র হিসাবে 'বিশ্বাসী লোকদের উক্তি'-র উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ভাবতে পারেননি যে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠবে। বিহারের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁকে সংবাদ দিতে পারত, এরকম লোক হিসাবে মীনহাজ লখনৌতিতে পেয়েছিলেন মাত্র দু' জন বৃদ্ধ সৈনিককে, তাই তিনি বিশেষভাবে তাঁদের উল্লেখ করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে মীনহাজের বখতিয়ারের বিহার-অভিযানের তুলনায় নদীয়া-অভিযানের সংবাদ সংগ্রহের সূত্র দুর্বল ছিল। মোটের উপর, এইসব আপত্তিগুলি টেকসই নয়। বখতিয়ার ১৮ জন সঙ্গীকে নিয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদে হানা দেন এবং অতর্কিত আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে লক্ষ্মণসেন পলায়ন করেন, এই বিষয়টি মীনহাজের বিবরণে যেমনভাবে লেখা আছে, মোটামুটি তেমনভাবেই ঘটেছিল, এ কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়। বখতিয়ার যখন ১৮ জন সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদে ঢুকেছিলেন, তখনই তাঁর পিছনের সারির একদল সৈন্য শহরের মধ্যে ঢুকে হত্যাকাণ্ড সুরু করেছিল—তাই 'প্রাসাদের দরজায় ও নগরে' একই সঙ্গে চিৎকার উঠেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্যবাহিনী নদীয়া শহরে প্রবেশ করেছিল, তখনই সমগ্র নগরটি বিজিত হয়েছিল।

সম্প্রতি ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন (পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, ১৯৮২, পৃঃ ১৩১)। তিনি লিখেছেন, ('তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে) "লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ-রক্ষার ব্যবস্থার কথা নেই…রাজার দেহরক্ষী, প্রাসাদরক্ষী ও নগররক্ষী সেনাদের সঙ্গেও মুহম্মদসহ উনিশজন তুর্কী সেনার কোনও যুদ্ধ হল না।"

কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্ষিপ্রগতিতে surprise attack করলে রক্ষীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় এবং আক্রমণকারীরা কার্যোদ্ধার করে, এ ব্যাপার সর্বকালেই দেখা যায়*; মোগল আমলে শিবাজীর শায়েস্তা খাঁকে

* ৬৪১ হিজরায় তুগরল তুগান খান ও উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেবের যুদ্ধের সময়ে উড়িষ্যার মাত্র আড়াই শো সৈন্য তুগান খানের পঞ্চাশ হাজার মুসলমান সৈন্যকে অতর্কিত আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে। মীনহাজ-ই-সিরাজ স্বচক্ষে এ ব্যাপার দেখে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আক্রমণ করা, আধুনিক কালে হিটলারের ঝটিকা-বাহিনী কর্তৃক বন্দী মুসো-লিনীকে উদ্ধার করা, ইস্রায়েলের ঝটিকা-বাহিনীর সুদূর এণ্টেবে এয়ারপোর্ট থেকে ছিনতাই-করা বিমানের বন্দী ইস্রায়েলীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া—ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যদুনাথ সরকারও দেখিয়েছেন যে, এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। তাঁর উক্তি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

এর পর দীনেশবাবু লিখেছেন, "লক্ষ্মণসেনের শাসনব্যবস্থা যদি এতই ত্রুটিপূর্ণ হত, তবে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা পরে যখন বিক্রমপুর থেকে পূর্ব-বাংলা শাসন করছিলেন, তখন তুর্কীরা অবিলম্বে ঐ অঞ্চল অধিকার করতে পারল না কেন?" পারল না তার কারণ, পূর্ববঙ্গ নদীবহুল এলাকা; প্রথম যুগের তুর্কীদের নৌবহর ছিল না, তারা নৌযুদ্ধ জানত না: তা ছাড়া বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ফলে তাদের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তুর্কীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধও ছিল। উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় তুর্কী শাসনের প্রথম ক'বছর অতিবাহিত হবার পর গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহ (উপযুক্ত নৌবহর গঠন করেই) পূর্ববঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেন, সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর বিরোধী স্বজাতীয়রা পিছন দিক্ থেকে তাঁর অরক্ষিত রাজধানী আক্রমণ করে, তার ফলে ইউয়জ শাহ পূর্ববঙ্গ অভিযান বন্ধ রেখে ফিরে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত জীবন ও রাজ্য হারান। তাছাড়া বখতিয়ারের কাছে পরাস্ত হওয়ার পর লক্ষ্মণসেন তাঁর ত্রুটিপূর্ণ শাসনব্যবস্থার সংশোধনও করে থাকতেও পারেন।*

পূর্বোক্ত বিবরণে লক্ষ্মণসেনের মহত্ত্ব ও দানশীলতা সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, তা সত্য হওয়াই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনকে জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের

---

* দীনেশবাবু আরও লিখেছেন, "উদ্দন্তপুর বৌদ্ধবিহার ধ্বংস (আ ১১৯৩ খ্রী)…তার কত পরে লক্ষ্মণসেনের তৎকালীন বাসস্থান নোদীয়া (নওদীয়া বা নবদ্বীপ) অধিকৃত হয়, তাও ('তবকাৎ'-এ) লেখা নেই।" কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে পরিষ্কার লেখা আছে যে 'উদন্তপুর' বিহার ধ্বংসের পর বছর বখতিয়ার নদীয়া জয় করেছিলেন। উদন্তপুর বিহার ধ্বংসের যে তারিখ (আঃ ১১৯৩ খ্রীঃ) দীনেশবাবু নির্দেশ করেছেন, তা-ও ঠিক নয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। তার এক বছরের মধ্যেই সুদূর মগধের উদন্তপুর বিহার ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়। পরে আমরা দেখাব যে বিহার ধ্বংসের তারিখ ১২০৩ খ্রীঃ।

পরামর্শদান সম্বন্ধে এতে যা লেখা হয়েছে, তাকে অনেকেই আজগুবী বলেছেন এবং এর জন্য বিবরণটিকে অপ্রামাণিক বলতে চেয়েছেন ; আবার কেউ কেউ মনে করেছেন চক্রান্ত করে তাঁরা কয়েকটি শ্লোক জাল করে শাস্ত্রবাণী বলে চালিয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে অত ঘোরালো কিছুই নেই, ব্যাপারটা আজগুবীও নয়। ঐ সব জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেশ ছেড়ে পালাতে চাইছিলেন এবং এ ব্যাপারে রাজার সাহায্য ও অনুমোদন প্রার্থনা করছিলেন। তাই নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা কয়েকটি শ্লোক বানিয়েছিলেন, বখতিয়ার আজানুলম্বিতবাহু হওয়ার ফলেই তাঁদের এই জাতীয় কথা বানাবার সুযোগ হয়েছিল। সম্ভবত এঁদের আশ্বস্ত করার জন্যই লক্ষ্মণসেন "পর-চক্র-ভয়" দূর করার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন (J. A. S. B. 1942, No. I, p. 20 দ্রঃ)। লক্ষ্মণসেনের ভীরুতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সাহিত্যিকরা যে-সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন। প্রমাণ, বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি নদীয়া ছেড়ে চলে যাবার পরও রাজা নদীয়া ত্যাগ করা পছন্দ করেননি। অতর্কিত আক্রমণের মুখে খালি পায়ে নৌকায় চড়ে তিনি পালিয়ে গেলেন, এটাই কি তাঁর কাপুরুষতা ? কিন্তু তখন তিনি খেতে বসে ছিলেন, তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না ; সুতরাং বিনা যুদ্ধে আক্রমণকারীর হাতে প্রাণ দেওয়া অথবা পালানো, এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। লক্ষ্মণসেনের সমালোচকরা বোধহয় জানতেন না যে অনুরূপ অবস্থার মধ্যে আওরঙ্গজেব কী করেছিলেন ! ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব খাওয়াসার নামে এক জায়গায় ছিলেন ; হঠাৎ সেখানে মধ্যরাত্রে নদীতে বান আসে, লোকেরা চীৎকার করে ওঠে ; আওরঙ্গজেব ভাবলেন মারাঠারা তাঁর শিবির আক্রমণ করেছে ; তিনি তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে পায়ে এমন চোট পেলেন যে বাকি জীবনের মত খোঁড়া হয়ে গেলেন (J. N. Sarkar, Short History of Aurangzib, 1930, p. 364)। অতএব লক্ষ্মণসেনকে কাপুরুষ বলার কোন হেতু নেই।

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "লক্ষ্মণসেনের গুপ্তচর বাহিনী মোটেই দক্ষ ছিল না ; লক্ষ্মণসেন শত্রুর গতিবিধির সংবাদ রাখিতে পারেন নাই বা তাঁহার গুপ্তচর বাহিনী তাঁহার নিকট সময়মত খবর পাঠায় নাই।" (বা. ই. মু. সা., পৃঃ ৬৯)। এই মন্তব্যের সারবত্তা স্বীকার্য। তবে খুব দক্ষ গুপ্তচর-বাহিনীও সুচতুর শত্রুর

বুদ্ধিবলে সময় সময় নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তা হওয়া অসম্ভব নয়।

'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে যে, বখতিয়ারের অতর্কিত আক্রমণের ফলে লক্ষ্মণসেন পালিয়ে "সঙ্কনৎ ও বঙ্গ অভিমুখে গেলেন।" "বঙ্গ" বলতে পূর্ববঙ্গকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু "সঙ্কনৎ" কোন্ দেশ? কারও মতে এই সঙ্কনৎ হল রাঢের একটি অঞ্চল, যা "সংকটে" গ্রাম (রায়না থানা) থেকে "সাঁকটিগড" (আধুনিক নাম শক্তিগড) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ পূর্বোক্ত অঞ্চলটি নদীয়ার নিকটবর্তী এবং তা যে-কোন মুহূর্তেই মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারত; সুতরাং নদীয়ার পতনের পর লক্ষ্মণসেন এরকম একটি জায়গায় যাবেন বলে মনে হয় না। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন "সঙ্কনৎ" "সমতট"-এর অপভ্রংশ। আমাদের মনে হয় এই কথাই ঠিক।

এখন, আমরা 'মীনহাজ-ই-সিরাজ'-এর বিবরণে উল্লিখিত তিনটি প্রধান ঘটনার সময় নির্ধারণের চেষ্টা করব। এই তিনটি ঘটনা হ'ল—(১) বখতিয়ারের বিহার জয়, (২) তাঁর নদীয়া জয়, এবং (৩) লখনৌতি জয়। ইতিপূর্বে এই তিনটি ঘটনার সময় সম্বন্ধে মেজর র‍্যাভার্টি, হেনরি ব্লকম্যান, মনোমোহন চক্রবর্তী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রভৃতি গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছিলেন। এঁদের সবাইকার মতই যে ভ্রমাত্মক, তা ডঃ আহমদ হাসান দানী আলোচনা করে দেখিয়েছেন (IHQ, 1954, pp. 133-147)। আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি; এ সম্বন্ধে নতুন এবং চূড়ান্ত প্রমাণও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যা হোক, আমরা আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে যে বিহার দুর্গ অর্থাৎ ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করার অব্যবহিত পরে বখতিয়ার বদাউনে গিয়ে কুৎবুদ্দীন আইবকের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে নানা উপঢৌকন দিয়ে প্রতিদানে তাঁর কাছ থেকে খিলাৎ লাভ করেন; কুৎবুদ্দীনের কাছ থেকে ফিরে বখতিয়ার আবার বিহারের দিকে অভিযান করেন এবং এর পরের বছর তিনি 'নোদীয়হ্' আক্রমন করে জয় করেন। কুৎবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীর 'তাজ-উল-মাসির' থেকে জানা যায় যে ১২০৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কুৎবুদ্দীন কালিঞ্জর দুর্গ জয় করেন এবং

কালিঞ্জর থেকে তিনি সরাসরি বদাউনে চলে আসেন ; তাঁর বদাউনে আসার পরেই "ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার উদন্দ্-বিহার [অর্থাৎ উদন্তপুর বিহার] থেকে তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন" এবং তাঁকে কুড়িটি হাতী, নানা-রকমের রত্ন ও বহু অর্থ উপঢৌকন দিলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে বখতিয়ার বিহার জয় করেছিলেন, এ কথা আকবর ও জাহাঙ্গীরের সভাসদ মুল্লা তকিয়া তাঁর 'বয়াজ'-এও লিখেছেন। মুল্লা তকিয়ার উক্তিকে যদি প্রামাণিক বলে গণ্য না করা হয়, তা হলেও 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' ও 'তাজ-উল-মাসির'-এর উক্তির সমন্বয় সাধন করে আমরা স্থির করতে পারি যে বখতিয়ার ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহার জয় করেছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নদীয়া জয় করেন।

বখতিয়ার "গৌড়" অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন ৬০১ হিজরার ১৯শে রমজান অর্থাৎ ১০ ই মে, ১২০৫ খ্রী: তারিখে—এ কথা এখন প্রামাণিকভাবে জানা গিয়েছে বখতিয়ার খলজির একটি নবাবিষ্কৃত টঙ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে।* এতে তারিখ এবং গৌড়বিজয়ের কথাটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে (Journal of Numismatic Society of India, Vol. XXXV, 1973, pp. 197-210, Plate XV, No 1 দ্রষ্টব্য)। গৌড় জয়ের আগেই তিনি নদীয়া জয় করেন ; তার তারিখ ১২০৪ খ্রীঃ বলে আমরা উপরে সিদ্ধান্ত করেছি (ডঃ দানীরও এই সিদ্ধান্ত ছিল) ; এই সিদ্ধান্ত এখন প্রামাণিকভাবে সমর্থিত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঊনবিংশ শতকের একেবারে প্রথমে স্টুয়ার্ট ও তাঁর History of Bengal-এ লিখেছিলেন যে বখতিয়ারের নদীয়া-জয়ের তারিখ ১২০৩-০৪ খ্রীঃ। পরবর্তী ঐতিহাসিকরা স্টুয়ার্টের এই প্রায় সঠিক সময়-নির্দেশকে গ্রহণ না করে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিকর জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। গৌড়-জয় উপলক্ষে উৎকীর্ণ মুদ্রায় লেখা তারিখ ১৯শে রমজান ৬০১ হিঃ—সম্বন্ধেও কিছু বলার আছে। ঐ যুগের অনেক মুদ্রায় মুদ্রা জারী করার তারিখ লেখা আছে ; যেমন গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের কয়েকটি মুদ্রায় ১৯শে সফর ৬১৬ হিঃ, রবি উস-সানী ৬১৭, ৬১৯ ও ৬২০, ২০শে রবি উস-সানী এবং জমাদি উস-সানী ৬২১ প্রভৃতি

* এই মুদ্রা এপর্যন্ত তিনটি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দিল্লী, লণ্ডন ও ওয়াশিংটন ডি.সি.তে (স্মিথসোনিয়ান যাদুঘরে) রক্ষিত আছে (J N S I, 1976, Pt. I, pp. 81-87 দ্রঃ)।

তারিখ লেখা দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বখতিয়ার খলজীর এই মুদ্রার তারিখও জারী করার তারিখ হতে পারে। অর্থাৎ ৬০১ হিঃ-র ১৯শে রমজান তারিখের আগেই বখতিযার গৌড (লক্ষ্মণাবতী) জয় করেছিলেন এবং ঐ তারিখে মুদ্রাটি জারী করেছিলেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে সাধারণত বখতিয়ার সম্বন্ধে মীনহাজ-ই-সিরাজ-এর বিবরণের পুনবাবৃত্তি কবা হযেছে। কেবল ইসামির 'ফুতুহ্-উস্-সলাতীন'-এর বিববণে খানিকটা অভিনবত্ব আছে। নীচে আমরা ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

"হঠাৎ তিনি (বখতিযার) চিতোর থেকে ঘোড়া চালিযে গৌড দেশের দিকে অগ্রসব হলেন। তারপর বিদ্যুতের মত তিনি লখনৌতির (বাংলা) সীমানায পৌছোলেন দেশটি আক্রমণ করার জন্য। আমি শুনেছি যে মুহম্মদ বণিকের—যাবা পৃথিবীব এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়—ছদ্মবেশে ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন। লখমিযা (লখমনিযা) শুনলেন যে সিস্তানের একজন ব্যবসায়ী অনেক দামী জিনিস বিক্রী করতে এসেছে, তাতারী ঘোড়া, চীনা বেশম এবং সারা পৃথিবীর অনেক অনেক দুর্লভ জিনিস। যে মুহূর্তে ঐ অঞ্চলের রাজা লখমিয়া এ কথা শুনলেন, তিনি সব দেশের কিছু কিছু জিনিস কিনতে এলেন। তিনি জানতেন না যে এই ছলনাময় জগৎ ভিতরে ভিতরে আর এক খেলা খেলবার পরিকল্পনা করেছে।

"সংক্ষেপে, রায় যখন প্রাসাদেব বাইরে এলেন, তিনি (বখতিযারের) দলের কাছে পৌছোলেন—মুহম্মদ তাঁর কাছে অনেক দামী জিনিস রাখলেন। তিনি কিন্তু আগেই একটা পরিকল্পনা কবেছিলেন। সেই অনুসারে তিনি তাঁব সহকর্মীদের ইসারা করলেন, তারা চারদিক থেকে কাছে চলে এল, রাযের লোকদের লক্ষ্য করে। তুর্কীরা রায়ের লোকদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রায়ের সৈন্যরা থতমত খেয়ে গেল এবং পরাস্ত হল। যা হোক, কিছু লোক রায়ের পাশে দাঁড়াল; তাঁর চারধারে দাঁড়িয়ে তারা ভয়ঙ্কর তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। কিছু সময় তারা শত্রুর সঙ্গে লড়ল এবং তীব্রভাবে বাধা দিল। শেষে খলজী-বংশায় সাহসী যোদ্ধারা বাতাসের মত প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ করল। এই অল্প-সংখ্যক হিন্দু অশ্বারোহীদের তারা বধ করার পরে, রায় বখতিয়ারের হাতে বন্দী হলেন, মুহম্মদ ঐ রাজ্যের রাজা হলেন, তাঁর এক স্বতন্ত্র রাজধানী হল। আমি

শুনেছি যে সেই মুসলমান (বখতিয়ার) লখনৌতি থেকে চীন পর্যন্ত বিশ্বাসের ধর্ম (ইসলাম) প্রচার করেছিলেন। সৌভাগ্য এবং ইসলামের শক্তির সাহায্যে তিনি অনেক রাজমুকুট এবং সিংহাসন জয় করেছিলেন।"

এই কাহিনীর অধিকাংশই অমূলক। তবে বখতিয়ার এবং তাঁর সহযাত্রী অশ্বারোহীরা ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসেছিলেন, এই কথাটি ঐতিহাসিক সত্য বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'-তে লেখা আছে যে বখতিয়ার ও তাঁর ১৮ জন সহযাত্রীকে লোকে অশ্ববিক্রেতা ব্যবসায়ী বলে ভুল করেছিল, তাঁরা অশ্বারোহী সৈনিকের বেশে এলে লোকে এ ভুল করবে কেন? সুতরাং বখতিয়ার ও তাঁর লোকদের ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। ইসামীর বিবরণেও বখতিয়ারের ঘোড়া বিক্রীর কথা প্রচারিত হওয়ার উল্লেখ আছে।

অতঃপর আমরা "তবকাৎ-ই-নাসিরী" থেকে বখতিয়ার সংক্রান্ত বিবরণের বাকী অংশ উদ্ধৃত করছি :

(বখতিয়ার) খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা খোদাই করালেন। তাঁর এবং তাঁর কর্মচারীদের মহৎ প্রচেষ্টার ফলে সব জায়গায় মসজিদ, মাদ্রাসাহ্ ও খান্‌কাহ্ স্থাপিত হল। তিনি লুণ্ঠনলব্ধ সামগ্রীর একাংশ সুলতান কুৎবুদ্দীনের কাছে পাঠালেন।

কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি লখনৌতির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির খবর পেলেন এবং তিব্বত ও তুর্কীস্তান দখলের ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় দশ হাজার ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী গঠন করলেন। তিব্বত ও লখনৌতি রাজ্যের মাঝখানে যে পর্বতমালা রয়েছে, তাতে তিন জাতের মানুষ বাস করে। এক জাতকে বলা হয় কোচ, দ্বিতীয়কে মেচ এবং তৃতীয়কে থারু। তাদের সবাইকার চেহারা তুর্কীদের মত, কিন্তু তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—অনেকটা হিন্দুস্তান ও তিব্বতের ভাষার মাঝামাঝি। কোচ ও মেচ উপজাতিদের অন্যতম সর্দার আলী মেচ নামে অভিহিত একজন লোক মুহম্মদ বখতিয়ারের দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল ; এই লোকটি তাঁকে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চালনা করে নিয়ে যেতে রাজী হল। সে তাঁকে একটা জায়গায় নিয়ে এল, যেখানে বর্ধনকোট (বা মর্দান কোট) নামে একটি শহর ছিল। কথিত আছে যে প্রাচীনকালে গরশ আসপ্ শাহ চীন থেকে ফেরার

সময় কামরুদে (কামরূপে) আসেন এবং এই শহর তৈরী করান। শহরটির সামনে একটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে, যা অত্যন্ত বৃহৎ। একে বলা হয় বাঙ্গামাটি।* [বদাওনী তাঁর 'মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখে' এই নদীর নাম লিখেছেন 'ব্রহ্মণপুত্র' অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র]। এটি হিন্দুস্তানে প্রবেশ করার সময় ভাষায় 'সমুন্দর' নাম গ্রহণ করে। দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও গভীরতায় এটি গঙ্গার চেয়ে তিনগুণ বড়। মুহম্মদ বখতিয়ার এই নদীর তীরে এসে পৌছোলেন ; আলী মেচ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আলী মেচ নদীর ধারের উঁচু পথ দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের একটা স্থানে (সৈন্যবাহিনীকে) নিয়ে পৌছোনোর আগে অবধি দশ দিন ধরে তারা অগ্রসর হয়েছিল ; ঐ স্থানটিতে প্রাচীন কাল থেকে প্রায় কুড়িটি পাথরের খিলান সংবলিত একটি সেতু ছিল। সৈন্যবাহিনী সেতু অতিক্রম করলে, বখতিয়ার সেখানে একজন তুর্কী ও একজন খলজী—এই দু'জন আমীরের সঙ্গে অনেক সৈন্য দিয়ে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থানটি বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিযোগ করলেন। অতঃপর তিনি বাকী সৈন্যদের নিয়ে সেতুর উপর দিয়ে যাত্রা করলেন। কামরুদেব রায় মুসলমানদের আসার খবর পেয়ে—"তিব্বত আক্রমণ করা মোটেই সঙ্গত নয়। ফিরে যাওয়াই ভাল ও আরও পূর্ণ প্রস্তুতি অবলম্বন করা উচিত" এইসব কথা বলবার জন্যে কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলে পাঠালেন, "আমি কামরূদের রায়। অঙ্গীকার করছি যে পরের বছর সৈন্যবল একত্র করে মুসলমানদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে ঐ রাজ্য (তিব্বত) অধিকার করতে পারব"।† মুহম্মদ বখতিয়ার এই উপদেশে কান না দিয়ে তিব্বতের পর্বতমালার দিকে যাত্রা করলেন।

---

* নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন, 'বাঙ্গামাটি' আসলে 'রাঙ্গামাটি' হবে ; এটি নদীর নাম নয়, স্থানের নাম। বখতিয়ার বর্ধনকোট থেকে যাত্রা করে বৃহৎ নদীর তীরে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে (যা কামরূপের প্রবেশ-দ্বার) এসেছিলেন, এইটিই মীনহাজের উক্তির আসল অর্থ। নদীটির বিশালতার যে বর্ণনা মীনহাজ দিয়েছেন, তার থেকে বোঝা যায়, এটি ব্রহ্মপুত্র ছাড়া আর কিছু নয়। কামরূপে ব্রহ্মপুত্রের তীরে রাঙ্গামাটি নামে স্থান এখনও আছে।

† কালিকারঞ্জন কানুনগো কামরূপের রাজার এই বন্ধুত্বের প্রকাশকে আন্তরিক বলে মনে করেছিলেন (HB II, p. 10) ; কিন্তু আসলে কামরূপরাজ বখতিয়ারের প্রতি বন্ধুত্বের ভান করেছিলেন, তার পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

৬৪২ হিজরায় এক রাত্রে, এই গ্রন্থকার দেওকোট ও বাঙ্গাওয়ান নামক স্থানের মধ্যে এক জায়গায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং মুতামাদুদ্দৌলার বাড়িতে অতিথি হিসাবে থাকেন। এই লোকটি আগে মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর অধীনে অস্ত্রশালার অধ্যক্ষ ছিল এবং লখনৌতিতে বাস করত। এই লোকটির কাছে তিনি (গ্রন্থকার) শুনলেন যে বখতিয়ার এই সেতু অতিক্রম করার পর গিরিসঙ্কট ও গিরিপথের মাঝখান দিয়ে পনেরো দিন অগ্রসর হয়ে ষোড়শ দিনে সমতল মাটিতে পৌছোলেন। এই সমস্ত স্থানই জনবহুল ; শস্যক্ষেত্রও ছিল। (এইপথে চলে) প্রথম যে গ্রামটিতে পৌছোনো গেল,* সেখানে একটি দুর্গ ছিল ; মুসলমানরা এই দুর্গ আক্রমণ করলে, দুর্গের ভিতরের এবং চার-পাশের লোকরা প্রতিরোধ করবার জন্য এগিয়ে এল। যুদ্ধ সুরু হল। সকাল-বেলা থেকে যুদ্ধ সুরু হয়ে সন্ধ্যায় নামাজের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলল ; বহুসংখ্যক মুসলমান নিহত ও আহত হল। শত্রুদেব একমাত্র অস্ত্র ছিল বাঁশ দিয়ে তৈরী বর্শা, এবং বর্ম ছিল ঢাল ও শিরস্ত্রাণ—বা কাঁচা রেশমকে শক্ত করে একসঙ্গে বেঁধে সেলাই করে বানানো হয়েছিল ; তারা সবাই তুর্কী ও লম্বা ধনুক ব্যবহার করত। যে সব লোককে বন্দী করা হয়েছিল—রাত্রে তাদের সামনে নিয়ে এসে জানা গেল যে সেখান থেকে ৫ ফার্সাং দূরে কারামবাত্তন† নামে একটি শহর আছে। সেখানে পঞ্চাশ হাজার তুর্কী সৈন্য ধনুক নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। মুসলমান ঘোড়সওয়াররা এসে পৌছোবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদবাহকেরা তাদের আসার সংবাদ জানাবার জন্যে যাত্রা করেছিল, যাতে অশ্বারোহী সৈন্যেরা তার পরদিন সকালবেলায় এখানে পৌঁছোয়। যখন এই গ্রন্থকার (মীনহাজ-ই-সিরাজ) লখনৌতিতে ছিলেন, তখন তিনি ঐ স্থানটি সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন এবং জেনেছিলেন যে এটি একটি বড় শহর। এই শহরটির প্রাকার পাথর দিয়ে তৈরী। এর বাসিন্দারা ছিল ব্রাহ্মণ ও মুনী বৌদ্ধ এবং শহরটি এই লোকদের সর্দারের দখলে ছিল। তারা ছিল অগ্নি-উপাসক। ঐ শহরের বাজারে রোজ সকালে পনেরোশো ঘোড়া বিক্রী হত।

---

* সম্ভবত আধুনিক ভুটান রাজ্যের অন্তর্গত এলাকায় এই গ্রাম অবস্থিত ছিল।

† ভুটানের কারুগোম্পা শহর ? ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেন যে সিলহাকোপল থেকে রওনা হয়ে রঙ্গীয়া ও তাম্বলপুর হয়ে—পার্বত্য পথ দিয়ে ভুটানে প্রবেশ করে বখতিয়ার কারুগোম্পার কাছাকাছি পৌছেছিলেন।

যে সব "তানকানাহ্" (?) ঘোড়া লখনৌতি রাজ্যে আসে, তা ঐ দেশ থেকেই আনা হয়। ঘোড়া আসার পথ গিরি-গহ্বরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, এটি ঐ অঞ্চলের পক্ষে খুব বিখ্যাত ব্যাপার। কামরূদ ও তিব্বতের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি গিরিপথ আছে, যার মধ্য দিয়ে লখনৌতিতে ঘোড়াদের নিয়ে আসা হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে—মুহম্মদ বখতিয়ার যখন ঐ দেশের ভূপ্রকৃতি জানতে পারলেন এবং দেখলেন যে মুসলিম সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, এবং প্রথম দিনেব অভিযানে অনেকেই নিহত বা অশক্ত হয়েছে, তখন তিনি আমীরদেব সঙ্গে পরামর্শ করলেন ; তাঁরা স্থির করলেন যে পশ্চাদপসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত, পরে তাঁরা আরো বড প্রস্তুতির ব্যবস্থা করে এদেশে ফিরে আসতে পারবেন। তাঁদের (দেশে) ফেরার পথে সমগ্র রাস্তায় কোথাও একটিও ঘাসেব পাতা বা এক টুকরো কাঠ পড়ে ছিল না ; সবই আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছিল।* উপত্যকা এবং গিরিপথের বাসিন্দারা রাস্তা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল এবং পনেরো দিনের মধ্যে এক সের খাদ্যও, এমনকি একটা ঘাসের টুকরো অথবা কোন পশুখাদ্য দেখা যায় নি ; তারা (বখতিয়ারের সৈন্যেরা) তাদের ঘোড়া-গুলিকে বধ করে তাদের মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল।

যখন তাঁরা কামরূদ দেশের পাহাড় থেকে নেমে সেতুর কাছে পৌঁছোলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে এর দুটি খিলান ধ্বংস করা হয়েছে। যে দু'জন আমীরকে এটি পাহারা দেবার জন্যে রাখা হয়েছিল, তারা ঝগড়া করে এবং পরস্পরের প্রতি দ্বেষের দরুন সেতু ও রাস্তার পাহারা ছেড়ে চলে যায় ; সুতরাং কামরূদের হিন্দুরা সেখানে এসে সেতুটি ধ্বংস করে দিয়েছিল।† মুহম্মদ বখতিয়ার সসৈন্যে সেখানে পৌঁছে নদী পার হবার কোনও পথ পেলেন না। সেখানে একটা নৌকারও দেখা মিলল না, সুতরাং তিনি খুব বিপদে পড়লেন ও হতাশ হয়ে গেলেন।

* এরকম যে ঘটতে পারে, বখতিয়ার তা আন্দাজ করেন নি। মনে হয় জয়ের নেশায় মেতে তিনি ধৈর্য ও সহজ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

† এর থেকেই বোঝা যায় কামরূপরাজের আগেকার বন্ধুত্বপ্রকাশ আন্তরিক ছিল না ; বখতিয়ারের বিরাট বাহিনী দেখে তিনি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করেছিলেন এবং বখতিয়ার এগিয়ে যাওয়ার পর সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি 'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁর লোকদের দিয়ে সেতুটি ধ্বংস করিয়ে বখতিয়ারের ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেন।

তাঁরা অবস্থানের একটা জায়গার জন্যে এবং নদী পার হবার উদ্দেশ্যে নৌকা সংগ্রহ করার সংকল্প করলেন। তাঁদের বলা হল এই জায়গার কাছে একটা খুব উঁচু ও দৃঢ় এবং সুগঠন মন্দির আছে। এই মন্দিরের ভিতর অসংখ্য সোনা ও রূপার তৈরী মূর্তি এবং একটি খুব বড় সোনায় তৈরী বিগ্রহ, যার ওজন দুই হাজার মিসকালের বেশি হবে—তা ছিল। মুহম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী ঐ মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে—নদী পার হবার উদ্দেশ্যে ভেলা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ ও দড়ি সংগ্রহে ব্যাপৃত হলেন। মুসলমানদের দুর্গতি ও দুর্বলতার কথা কামরূদের রায়কে জানানো হল এবং তিনি রাজ্যের সমস্ত হিন্দুকে দলে দলে এখানে জড়ো হবার জন্য আদেশ দিলেন। তারা মন্দিরের চারদিকে মাটির উপর তাদের বাঁশে-তৈরী বর্শা পুঁতে, এগুলি এমন ঠাস-বুনানি করে বেঁধে দিল যে তার গঠন অনেকটা প্রাচীরের মত হল। ইসলামের সৈনিকরা এ দেখে মুহম্মদ বখতিয়ারকে জানাল, "যদি আমরা প্রতিরোধ না করি, তবে সবাই কাফেরদের ফাঁদে ধরা পড়ব—মুক্তির কোন উপায় অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে।" তখন তারা একসঙ্গে আক্রমণ চালাল। একটি জায়গার দিকে সমস্ত উদ্যমকে চালিত করে, তাদের জন্য একটা পথ খুলে—খোলা জায়গায় আসতে তারা সক্ষম হল। হিন্দুরা নদীর তীর অবধি তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে সেখানে থামল। প্রত্যেকেই নদী পার হবার উপায় আবিষ্কারের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালাতে লাগল। একজন সৈন্য তার ঘোড়াকে নদীতে নামাতে সমর্থ হল এবং দেখা গেল যে একটি তীর নিক্ষেপ করলে যেখানে পড়ে, ততখানি দূরের একটি স্থান পার হবার উপযুক্ত। "নদী পার হবার স্থান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে" বলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরাট চেঁচামেচি হল ; সবাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। (এদিকে) হিন্দুরা তাদের পিছন থেকে নদীর তীর দখল করেছিল। যখন মুসলমানরা নদীর মাঝখানে এসে পৌছোলো, তখন দেখল যে জল খুব গভীর এবং তারা সবাই মারা পড়ল। মুহম্মদ বখতিয়ার কম-বেশি একশো লোক নিয়ে অত্যন্ত চেষ্টার সঙ্গে নদী পার হলেন ; আর সবাই জলমগ্ন হল। মুহম্মদ বখতিয়ার এই সলিল-সমাধি থেকে রক্ষা পেয়েছেন, এ খবর কোচ ও মেচ জাতির লোকদের কাছে পৌছোল। পথপ্রদর্শক আলী মেচ বখতিয়ার খলজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার আত্মীয়দের রেখে দিয়েছিল এবং তারা অনেক সাহায্য ও সেবা করল। বখতিয়ার দেওকোটে পৌছোনোর পর অত্যন্ত

দুঃখের দরুন অসুস্থ হলেন। যে-সব খলজী হত হয়েছিল, তাদের স্ত্রী ও শিশু-সন্তানদের দিকে তাকাতে তিনি লজ্জা বোধ করতেন। কখনও যদি তিনি ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতেন, তা হলে সমস্ত নারী ও শিশু ঘরের ছাদ ও রাস্তা থেকে চীৎকার করে তাঁকে অভিশাপ ও গালাগাল দিত। এই অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে প্রায়ই এই কথা বেরোত : "সুলতান গাজী মুইজ্জুদ্দীন সামের (মুহম্মদ ঘোরী) কি কোন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়েছে যে আমার অদৃষ্ট আমায় পরিত্যাগ করল ?" প্রকৃতপক্ষে তা'ই হয়েছিল—প্রায় ঐ সময়ে সুলতান গাজী নিহত হন।* মুহম্মদ বখতিয়ারের অবস্থা মানসিক কষ্টের চাপে আরও খারাপ হতে লাগল, তিনি শয্যা আশ্রয় করলেন এবং মারা গেলেন। কয়েকজন বলেন যে বখতিয়ার খলজীর অধীনে আলী মর্দান নামে তাঁর স্বজাতীয় একজন সর্দার ছিলেন, তিনি খুব সাহসী নির্ভীক লোক ছিলেন, তাঁকে নারকোটি (বা নারান-কোই) অঞ্চলের শাসনভার দেওয়া হয়েছিল। (বখতিয়ারের অসুস্থতার) খবর পেয়ে তিনি—বখতিয়ার যেখানে অসুস্থ হয়ে শয্যাগত ছিলেন, সেই দেওকোটে এলেন ; সেই সময় তিন দিন যাবৎ কোন লোককে তাঁকে (বখতিয়ারকে) দেখার জন্য ঢুকতে দেওয়া হয় নি, কিন্তু আলী মর্দান কোন উপায়ে (ঢুকে), যে আবরণে বখতিয়ার আবৃত ছিলেন, তার একপাশ সরিয়ে তাঁকে ছোরা মেরে বধ করেন। ৬০২ হিজরায় এই ঘটনা ঘটে।

এই বিবরণ স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ। এর সমর্থক অনেক প্রমাণও আবিষ্কৃত হয়েছে। লক্ষ্মণাবতী থেকে রওনা হয়ে বখতিয়ার যে বর্ধনকোট শহরে পৌঁছে-ছিলেন, তার আধুনিক নাম বর্ধনকুঠি। স্থানটি লক্ষ্মণাবতীর পূর্বদিকে রংপুর জেলার মধ্যে, বগুড়া জেলার সীমানায় অবস্থিত। গৌহাটি থেকে কিছু দূরে কানাই-বড়শী গ্রামে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে লেখা আছে যে ১১২৭ শকাব্দের ১৩ই চৈত্র অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীঃ ৭ই মার্চ† তারিখে কামরূপে সমাগত "তুরুষ্করা" বিধ্বস্ত হয়,

> শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে
> কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মায়যু।

* মুহম্মদ ঘোরী ৬০২ হিজরার ১লা শাবান অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীঃ-র ১৩ই মার্চ তারিখে নিহত হন।

† কেউ কেউ তারিখটিকে ২৭শে মার্চ লিখেছেন। তা ভুল।

এই "তুরুষ্ক"রা নিঃসন্দেহে বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনী।

কানাই-বড়শীর কাছে সিলহাকোপুল (যার অর্থ 'পাথরের পুল') নামে একটি পাথরের সেতুর সন্ধান মিলেছে; বখতিয়ার নিঃসন্দেহে এই সেতু দিয়ে নদী পার হয়েছিলেন। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য I. H. Q., 1933, pp. 49-62-তে প্রকাশিত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; বা. ই. মু. আ., পৃঃ ৮১-৮৫-ও দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। কানাই-বড়শী ও সিলহাকোপুল বখতিয়ার অধিকৃত লখনৌতি রাজ্যের সীমান্ত থেকে অনেক দূরে, কামরূপ রাজ্যের অনেকখানি ভিতরে অবস্থিত ছিল। তা হলে কামরূপ রাজ্যের খানিকটা অঞ্চল জয় না করে বখতিয়ার সিলহাকোপুলে পৌঁছোলেন কেমন করে? আমাদের মনে হয়, বখতিয়ার এই অঞ্চল জয় করতেই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কামরূপরাজ বন্ধুত্বের ভান করায় তার প্রয়োজন হয় নি; বখতিয়ার বিনা বাধাতেই সিলহাকোপুল অবধি অগ্রসর হন এবং সেতু পার হন। সেখান থেকে তিনি ভুটান-সীমান্তে যান এবং ভুটানে প্রবেশ করেন।

বখতিয়ারের জীবন চরম সার্থকতা ও চরম ব্যর্থতার উদাহরণস্থল। বিহার ও বাংলা অভিযানে তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিরল সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন, তিব্বত অভিযানে তা দিতে পারেন নি; ফলে তাঁর এই অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় এবং তিনি নিতান্ত করুণ মৃত্যু বরণ করেন। বখতিয়ার খুব অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যুগপৎ তিব্বত ও তুর্কীস্তান জয়ের অভিযানে বেরিয়েছিলেন; এই দুটি স্থান যে একে অন্যের থেকে বহু দূরে অবস্থিত, তা তিনি জানতেন না। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, তিব্বতে যেতে গেলে যে মাইলের পর মাইল দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে হয়, তা বখতিয়ার ভুটানে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত জানতেন না! সেখানে পৌঁছে তিনি "ঐ দেশের ভূপ্রকৃতি" জানতে পারেন। কেন বখতিয়ার কাছের অঞ্চলগুলি জয় করার চেষ্টা না করে তিব্বত-জয়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন তা ঐতিহাসিকরা বুঝতে পারেন নি।

আমাদের মনে হয়, বখতিয়ার তিব্বতের অপরিমিত ধনদৌলৎ সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা অনেক কাহিনী শুনেছিলেন (এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনেছি)—তাই তিব্বত জয় করে ঐ অপরিমিত ধনদৌলৎ লুঠ

করার বাসনা তাঁর মনে জেগেছিল। বখতিয়ারকে আলী মর্দান হত্যা করেছিলেন, এটা মীনহাজ "কয়েকজন"-এর মত বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই এই কারণে যে বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মুহম্মদ শিরান খলজী নারান-কোইতে গিয়ে আলী মর্দান "যে অপরাধ করেছিলেন, তার শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ধরে" বন্দী কবেন। এটা অদৃষ্টের পরিহাস যে, যে বখতিয়ার খলজী জীবনে অসংখ্য নিষ্ঠুর কাজের অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং নিরীহ ও নিরস্ত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হল নিষ্ঠুর আততায়ীর ছুরিকাঘাতেই। মৃত্যুর আগে তিনি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তা-ও তাঁর অল্প শাস্তি নয়।

বখতিয়ার খলজীর রাজ্যের সীমা ও তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন (বা. ই. মু. আ., পৃঃ ৬৯-৭০)। তাঁর আলোচনার যে অংশ সম্বন্ধে আমরা একমত, সেটুকু প্রথমে উদ্ধৃত করে পরে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। ডঃ করিম লিখেছেন, "তিনি (বখতিয়ার খলজী) তাঁহার অধিকৃত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময়ে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে 'ইকতা' এবং ইকতার শাসনকর্তাকে 'মুকতা' বলা হইত। বখতিয়ার খলজীর সৈন্যধ্যক্ষদের মধ্যে মাত্র তিনজনের নাম পাওয়া যায়; ...প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, লখনৌতি রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী...উত্তরে দিনাজপুর জিলার দেবকোট হইয়া রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজীর পূর্ব অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

বখতিয়ারের 'লখনৌতি' রাজ্যের দক্ষিণ সীমা সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিমের সঙ্গে আমরা একমত নই বলে তাঁর আলোচনার এই অংশ বাদ দিয়েছি। আমাদের বিবেচনায় প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বখতিয়ারের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল নদীয়া বা নবদ্বীপ। আধুনিক গবেষকদের অনেকেই মনে করেন যে নদীয়া জয় ও লুঠপাট করার পরে বখতিয়ার ঐ স্থান ছেড়ে দিয়ে চলে যান এবং হিন্দুরা আবার তা দখল করে। এ বিষয়ে কালিকারঞ্জন কানুনগো সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "He stopped only for a few days at Nadiya to collect booty by sacking the city thoroughly

and swept forward to strike at Gaur, the historic capital of Bengal (H B II, p. 8) ; কিন্তু বখতিয়ার নদীয়া শহর ও তার চারপাশের অঞ্চলগুলি জয় করার পরে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী জয় করে সেখানেই সদর দপ্তর স্থাপন করেন, তাঁর নদীয়া শহর ছেড়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কোন লোকও বিনাযুদ্ধে অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দেয় না, বখতিয়ারের পক্ষে তা করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। লক্ষ্মণসেনের পক্ষে নদীয়া পুনরধিকার করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর সৈন্যবাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হয়েছিল। মীনহাজ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লিখেছেন (পূর্বোক্ত গবেষকরা সম্ভবত এই অংশটি পড়েন নি) যে বখতিয়ার নদীয়া দখলের পর লক্ষ্মণসেনের সৈন্যবাহিনী, অনুবর্তী গোষ্ঠী, হাতীগুলি একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে যথেচ্ছভাবে লুঠপাট করতে থাকে, মুহম্মদ শিরান খলজী একাই অন্তত আঠারটি হাতী মাহুত সমেত ধরে তিন দিন আটকে রাখেন বলা হয়েছে।

আসলে, বখতিয়ার যে নদীয়া ছেড়ে দেন নি, দখলে রেখেছিলেন,—তার প্রমাণ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তেই আছে। ঐ বইয়ে লেখা আছে যে তিব্বত অভিযানে যাবার সময়ে বখতিয়ার মুহম্মদ শিরান ও তাঁর ভাইকে একদল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে লখনোর (বীরভূম জেলা) ও জাজনগর অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। বখতিয়ার যদি নদীয়া থেকে ডেরা-ডাণ্ডা তুলে, পাততাড়ি গুটিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে যেতেন, তা হলে লখনোর ও জাজনগর জেতার ইচ্ছা তাঁর হবে কেন ? পশ্চিমবঙ্গের হেলায় জেতা নদীয়া ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্গত লখনোর জয় করার বাসনা তাঁর মনে জাগবে কেন ? আর নদীয়া হিন্দুদের হাতে যদি তিনি ছেড়ে দিয়ে আসেন, তা হলে নদীয়ারও ওদিকে যে জাজনগর বা উড়িষ্যা রাজ্য, তা তিনি জয় করবেন কেমন করে ? লখনোর (লখনৌতি থেকে দশ দিনের পথ বলে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে) ও জাজনগর-সীমান্ত উত্তরবঙ্গ থেকে বহু দূরে অবস্থিত, এ কারণেও উত্তরবঙ্গ থেকে এই দুই অঞ্চল জয়ের জন্য সৈন্য পাঠানো অবাস্তব ; কিন্তু নদীয়া দখলে থাকলে সেখান থেকে লখনোর ও জাজনগর-জয়ে সৈন্য পাঠানো খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক। নদীয়া লখনোর ও জাজনগর-সীমান্তের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত ছিল। বীরভূম জেলার লখনোর (আধুনিক নাম রাজনগর) নদীয়া থেকে উত্তর-পশ্চিমে অল্প দূরে এবং জাজনগর-সীমান্ত

নদীয়ার দক্ষিণে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল ; আধুনিক হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত কিছু অঞ্চল যদি এই সময়ে জাজনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকে, তা হলে জাজনগর-সীমান্ত নদীয়া থেকে সামান্য দূরেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং বখতিয়ার নদীয়া ছেড়ে দেন নি এবং যতদূর মনে হয়, মুহম্মদ শিরানের ঘাঁটি ছিল নদীয়াতেই।

আসলে একটি বিষয় থেকে পূর্বোক্ত গবেষকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহের (আনুমানিক ১২৫১ থেকে ১২৫৭ পর্যন্ত তিনি লখনৌতি-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন) মুদ্রায় লেখা আছে যে সেগুলি "নদীয়া" ও "উমর্দন"-এর ভূমি-রাজস্ব থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। এর থেকে পূর্বোক্ত গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে মুগীসুদ্দীন নদীয়া পুনরধিকার করেছিলেন (এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল), অতএব বখতিয়ার নিশ্চয়ই নদীয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। যেন বখতিয়ার ও মুগীসুদ্দীনের মাঝখানে দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে নদীয়া হাত-বদল হতে পারে না! তুগরল তুগান খানের শাসনকালে (আঃ ১২৩৭-১২৪৫ খ্রীঃ) উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেব সমগ্র রাঢ় অঞ্চল দখল করেছিলেন ; এমনকি রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতেও তিনি হানা দিয়েছিলেন। তার পর কিছু কাল রাঢ় উড়িষ্যারাজের অধীনই থাকে (H. B. II, pp. 50-51)। মুগীসুদ্দীন য়ুজবক শাহ উড়িষ্যা বা জাজনগরের রাজার সঙ্গে বারবার যুদ্ধ করে হৃত অনেক অঞ্চল পুনরধিকার করেন ; নিঃসন্দেহে নদীয়া ছিল জাজনগর রাজের জয় করা এবং মুগীসুদ্দীনের পুনরধিকার করা একটি অঞ্চল ; এই জায়গাটি ইতিপূর্বে মুসলমানরা প্রথম জয় করেছিল বলে এর সঙ্গে তাদের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। তাই মুগীসুদ্দীন নদীয়া পুনরধিকার করে সগর্বে মুদ্রা প্রকাশ করে তাতে লিখে দেন যে এগুলি নদীয়ার ভূমি-রাজস্ব থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। এর দ্বারা কোনমতেই প্রমাণ হয় না যে বখতিয়ার নদীয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এখন কয়েকটি গৌণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথম, ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীই কি এঁর নাম? 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র অনুবাদক মেজর র‍্যাভার্টির মতে এঁর নাম ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ; অর্থাৎ ইনি বখতিয়ার খলজীর পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ। এই মত এক সময়ে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এই মতের বিরোধী। র‍্যাভার্টি 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র বারটি পুথি

দেখেছিলেন, তার মধ্যে চারটিতে নাকি 'বিন' পেয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর উপর আস্থা রাখা কঠিন, কারণ 'বিন' সম্বন্ধে তাঁব একটা বাতিক ছিল। আলী মর্দানকে তিনি বলেছেন "আলী বিন মর্দান" এবং মুহম্মদ শিরানকে বলেছেন 'মুহম্মদ বিন শিরান'। শুধু তাই নয়, 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে মুহম্মদ মাহ্‌মূদ নামে ইখতিয়ারুদ্দীনের একজন কাকার নাম পাওয়া যায়; র‍্যাভার্টি এঁকে বলেছেন 'মুহম্মদ বিন মাহ্‌মূদ'। তাঁর মতের হাস্যকরতা প্রমাণ করা কিছু কঠিন নয। ইখতিয়ারুদ্দীনের পিতার নাম যদি বখতিয়ার হয় এবং পিতামহের নাম যদি মাহ্‌মূদ হয়—তা হলে তিনি এবং তাঁর কাকা উভয়েরই মূল নাম দাঁড়ায় শুধু মাত্র 'মুহম্মদ' ('ইখতিয়ারুদ্দীন' উপাধি)। তা অসম্ভব। তা ছাড়া এঁর নাম সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র তুলনায়, সমসাময়িক গ্রন্থ 'তাজ-উল-মাসির'-এর সাক্ষ্য অনেক প্রামাণিক; 'তাজ-উল-মাসির'-এ এঁকে পরিষ্কারভাবে "ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার" বলা হয়েছে। স্বল্পপরবর্তী লেখক ইসামী তাঁব 'ফুতুহ্‌-উস্‌-সলাতীন' বইয়েও এঁর নাম 'বখতিয়াব' বলেছেন এবং 'বখতিয়ার'-এর প্রথমাংশ 'বখৎ' নিয়ে শব্দের খেলা দেখিয়েছেন। মুসলমান আমলের পরবর্তী কালের সব ইতিহাসগ্রন্থে (তাদেব লেখকরাও 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' ব্যবহার করেছেন) এঁর নাম 'বখতিয়ার' রূপেই নির্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং এঁর নয়, এঁর পিতার নাম 'বখতিয়ার' ছিল—এই মত মূল্যহীন। তখনকার কালে কারও নামের সঙ্গে পিতার নামের লেবেল এঁটে সবসময় উল্লেখ করার রেওয়াজ ছিল না।

এঁব পদমর্যাদা কী ছিল, তা-ও সর্ববাদিসম্মতভাবে নিরূপণ করা যায় নি। কেউ কেউ মনে করেন, ইনি ছিলেন একজন স্বাধীন 'অ্যাডভেঞ্চারার' এবং দিল্লীর শাসনকর্তা কুৎবুদ্দীন তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন না। কিন্তু এ ধারণা ভুল, কারণ কুৎবুদ্দীনের অধীনস্থ অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামুদ্দীন তাঁকে ভিউলী ও ভাগত পরগনার জায়গীর দিয়েছিলেন এবং মুসলিম রাজ্যের পূর্ব সীমানায় সীমান্তরক্ষীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। অবশ্য যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বখতিয়ার অভিযান করেছিলেন, তা তিনিই গঠন করেছিলেন।

'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে যে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের পরে বখতিয়ার খুৎবাপাঠ করেন এবং মুদ্রা প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম বলেন, "খোতবা কাহার নামে পাঠ করেন এবং মুদ্রা কাহার নামে উৎকীর্ণ করেন, মিনহাজ তাহা উল্লেখ করেন নাই।" তা উল্লেখ না করলেও মীনহাজ-

এ কথা উল্লেখ করেছেন যে বখতিয়ার মুহম্মদ ঘোরীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং ঘোরীর ভাগ্যকে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করতেন। সুতরাং তিনি যে খুৎবা ও মুদ্রায় মুহম্মদ ঘোরীর নামই ব্যবহার করবেন, তাতে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যা হোক, এখন বখতিয়ার কর্তৃক উৎকীর্ণ গৌড়বিজয়ের স্মারক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে ; তাতে মুহম্মদ ঘোরীর নামই নৃপতি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং তিনি খুৎবাও মুহম্মদ ঘোরীর নামে পাঠ করেছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই।

বখতিয়ার মুহম্মদ ঘোরী এবং তাঁর অধীনস্থ দিল্লীর শাসনকর্তা কুৎবুদ্দীন আইবকের আনুগত্য স্বীকার করলেও, তিনি যে কার্যত সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, তাতে সন্দেহের কারণ নেই।

বখতিয়ার নদীয়া নগরীকে ধ্বংস করার পরে লক্ষ্মণাবতীতে সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন—এই কথা 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোটে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

ডঃ আবদুল করিম মনে করেন যে, তিব্বত অভিযানে যাবার আগে বখতিয়ার দেবকোটে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন নি, তিনি লক্ষ্মণাবতী থেকেই তিব্বত অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। ফেরার পথে দেবকোটে প্রথমে পৌঁছে সেখানে তিনি থেকে গিয়েছিলেন।

আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, বখতিয়ার তিব্বত অভিযানের আগেই তাঁর রাজধানী দেবকোটে স্থানান্তরিত করেছিলেন। কারণ মীনহাজ লিখেছেন যে দেবকোটে ফেরার পরে বখতিয়ার রাস্তায় বেরোলে নিহত সৈন্যদের বিধবা স্ত্রী ও শিশুপুত্রেরা তাঁকে অভিশাপ ও গালাগাল দিত। বখতিয়ার যদি দেবকোটে রাজধানী না সরিয়ে থাকবেন, তা হলে সৈন্যদের স্ত্রী ও পুত্রেরা দেবকোটে এল কী করে? তারা কি বখতিয়ারকে গালাগাল দেবার জন্যেই রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে দেবকোটে এসেছিল? তারা শুধু রাস্তা থেকে নয়, ঘরের ছাদ থেকেও গালাগাল দিত। এর থেকে বোঝা যায় যে তাদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল দেবকোটে এবং আগে থেকেই সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এর থেকে অবশ্য এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, বখতিয়ার দেবকোট থেকেই তিব্বত অভিযানে যান। কামরূপে যাবার সহজ পথ লক্ষ্মণাবতী থেকেই

বেরিয়েছিল। সুতরাং যতদূর মনে হয় তিব্বত অভিযানে যাবার সময়ে বখতিয়ার দেবকোট থেকে তাঁর পূর্বতন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে আসেন এবং এখান থেকেই তিব্বত অভিযানে বার হন।

বখতিযারের অধীনস্থ যে তিনজন সেনাপতি 'মুকতা' নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলী মর্দানের ইক্তা ছিল র‍্যাভার্টি ব্যবহৃত পুথি অনুসারে নারান-কোইতে; এ জায়গাটির অবস্থান নির্ণয় করা যায় নি। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে 'নারান-কোই'-এর বদলে 'বড়শৌল' নাম পাওয়া যায়; এখানেই আলী মর্দানের ইক্তা ছিল বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন। নারান কোই-এর অবস্থান নির্ণয় করা যায় নি বলে প্রায়-সমসাময়িক গ্রন্থের সাক্ষ্য পরিত্যাগ করে ষোড়শ শতাব্দীর বই 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

যা হোক, এলিয়ট ও ডাউসন 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র যে পুথি ব্যবহার করেছিলেন, তাতে 'নারান-কোই'-এর বদলে 'নারকোটি' আছে। এটিই সঠিক পাঠ। পঞ্চদশ শতকের প্রথমে ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা আশরফ সিমনানীর চিঠিতে হজরৎ শেখ শাহাবুদ্দীনের এবং শেখ আহমদ দামিশকীর কয়েকজন সঙ্গীর সমাধিস্থান হিসাবে 'নারকোটি'র নাম উল্লেখ করা হয়েছে (Bengal, Past and Present, 1948, pp. 35-36 দ্রষ্টব্য)। হুসামুদ্দীন ইওজ খলজীর ইক্তা ছিল 'গঙ্গতরী'তে। 'গঙ্গতরী' কি 'গঙ্গাতীর'-এর অপভ্রংশ? মুহম্মদ শিরান খলজীর ইক্তা ছিল সম্ভবত নদীয়ায়।

কালিকারঞ্জন কানুনগো (এবং তাঁকে অনুসরণ করে ডঃ আবদুল করিম) লিখেছেন যে, যে বছরে (১২০৬ খ্রীঃ) বখতিয়ার পরলোকগমন করেন, সেই বছরেই মুহম্মদ ঘোরী এবং লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু হয। এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মুহম্মদ ঘোরী ঐ বছরেই আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের ঐ বছরে মারা যাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীধরদাস কর্তৃক সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতের সঙ্কলনকালবাচক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি থেকে শুধুমাত্র এইটুকু বলা যায় যে, লক্ষ্মণসেন অন্তত ২০শে ফাল্গুন, ১১২৭ শকাব্দ বা ফেব্রুয়ারী, ১২০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন :

শাকে (চ) সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেহব্দে।

সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেতু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥

"রসৈকবিংশ" শব্দের অর্থ করা হয়েছে—রস (৬)+২১=২৭; লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৭শ বর্ষ ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দে পড়লে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর হয় ১১০১ শকাব্দ বা ১১৭৯-৮০ খ্রীঃ। এই বছরেই যে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন থেকে দেখা যায় যে রাজত্বের ২৫শ বর্ষে লক্ষ্মণসেন "পর-চক্র-ভয়" (বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়) দূর করার জন্য শান্তিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন (J. A. S. B., 1942, No. 1, p. 20)। ১১৭৯-৮০ খ্রীঃ তাঁর রাজত্বের ১ম বর্ষ হলে ২৫শ বর্ষ হয় ১২০৩-০৪ খ্রীঃ। ঐ বছরেই বখতিয়ার বিহার জয় করেছিলেন এবং নদীয়া আক্রমণের উদ্যোগ করেছিলেন বলে লক্ষ্মণসেনের কাছে সংবাদ গিয়েছিল। সুতরাং ঐ বছরেই তাঁর "পর-চক্র-ভয়" দূর করার যজ্ঞ করা স্বাভাবিক। অতএব ১২৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর রাজত্ব সুরু হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৭শ বর্ষের ৬ই কার্তিক তারিখে উৎকীর্ণ আর একটি তাম্রশাসন ঢাকা জেলার ভাওয়ালে পাওয়া গিয়েছে (দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, পৃঃ ১২৯ দ্রষ্টব্য)। এটিও ১১২৭ শকাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এর তারিখ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। সুতরাং ১২০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন সুস্থ এবং দানরত অবস্থায় জীবিত ছিলেন। তিনি কবে মারা গিয়েছিলেন, তা বলা সম্ভব নয়।

বখতিয়ার খলজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। অবশ্য অবিজ্ঞোচিত তিব্বত অভিযানের ফলে তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রায় সবটাই ধ্বংস হয়েছিল। তার ফলে এবং বখতিয়ারের উত্তরাধিকারীদের ঝগড়া-বিবাদের দরুন এ দেশে মুসলিম অধিকারের বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। বহুসংখ্যক মুসলমানকে তিনি এ দেশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা না হলে তিনি তিব্বত-অভিযানের সময়ে দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পারতেন না। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসাহ্, খানকাহ্ প্রভৃতি স্থাপন করে মুসলিম সমাজের কল্যাণ বিধান করে-ছিলেন; এজন্যও তিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। বখতিয়ারের সামরিক অভিযান (বিহার, বাংলা ও তিব্বত) মাত্র চার বছরের মধ্যে সুরু ও শেষ হয়।

এই পর্বের ঘটনাবলীর কালক্রম আমরা এইভাবে তৈরী করতে পারি :

১২০৩ খ্রীঃ গোড়ার দিক—উদন্তপুর বিহার জয়

১২০৩ খ্রীঃ মার্চ মাস—বদাউনে কুৎবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১২০৪ খ্রীঃ— নদীয়া জয়

১২০৫ খ্রীঃ ১০ই মে বা তার কিছু আগে—গৌড় বা লক্ষণাবতী জয়

১২০৫ খ্রীঃ শেষ দিক—দেবকোটে রাজধানী সরানো

১২০৬ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী—তিব্বত অভিযানে বার হওয়া*

১২০৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী —তিব্বত অভিযানে ব্যর্থতা

১২০৬ খ্রীঃ ৭ই মার্চ—কামরূপে বিপর্যয় বরণ

১২০৬ খ্রীঃ শেষ দিক—দেবকোটে পরলোকগমন

এই কালক্রম থেকে দেখা যায় ১২০৩-১২০৬ খ্রীঃ—এই চার বছর বখতিয়ার ঝড়ের মত কাটিয়েছেন। এই চার বছরে তাঁর প্রধান কাজ দুটি—প্রথম, একের পর এক অভিযান এবং দ্বিতীয়, বারবার রাজধানী পালটানো। মাদ্রাসাহ্, খানকাহ্ প্রভৃতি যে-সব প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছিলেন বলা হয়েছে, সেগুলি বোধহয় তাঁর নির্দেশে তাঁর সহকারীরা করেছিলেন। আসলে, বখতিয়ার ছিলেন একজন চির-অস্থির দুঃসাহসিক অভিযানকারী।

* 'তবকাৎ-ই নাসিবী'র সময নিদেশ অনুসাবে কামরূপে বিপযয ববণেব ১৬+১৬+১০+১০ +১০=৬২ দিন আগে বখতিযাব তিব্বত অভিযানে বার হন। অতএব ৭ই মাচ কামরূপে বিপর্যয় ববণেব তাবিখ হলে, তিব্বত অভিযানে বাব হবাব তাবিখ হবে ৪ঠা জানুযাবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বখতিয়ারের অনুবর্তী শাসকবৃন্দ

মালিক ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খলজী

বখতিয়ার খলজীর পরে লখনৌতি রাজ্যের শাসক হন মালিক ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খলজী। এঁর সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :

মুহম্মদ শিরান এবং আহমদ শিরান দুই ভ্রাতা খলজী আমীর ছিলেন। তাঁরা মুহম্মদ বখতিয়ারের অধীনে কর্মরত ছিলেন এবং যখন এই নেতা কামরূদ ও তিব্বত অভিযানে বার হন, তখন তিনি শিরান ও তাঁর ভাইকে নিজের বাহিনীর একদল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে লখনোর ও জাজনগরে পাঠান। ঐ সব দুর্ঘটনার (বখতিয়ারের পরাজয় ও মৃত্যুর) খবর এসে পৌঁছোলে, তাঁরা তাঁদের অবস্থানের জায়গা থেকে ফিরে এসে—শোক পালন করতে দেওকোটে এলেন। ঐ স্থান থেকে তিনি আলী মর্দান অধিকৃত নারকোটিতে (পাঠান্তর—নারান-কোই) গেলেন এবং তিনি যে অপরাধ করেছিলেন, তার শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ধরে, বাবা কোতোয়াল সাফাহানা নামক ঐ জায়গার কোতোয়ালের জিম্মা করে কারাগারে রাখলেন। তিনি তারপর দেওকোটে ফিরে এসে সমস্ত আমীরদের একত্র করলেন। এই মুহম্মদ শিরান খুবই সাহসী ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

মুহম্মদ বখতিয়ার যখন নোদীয়হ নগর লুণ্ঠন করে রায় লখমনিয়াকে পলায়নে বাধ্য করেন, তখন রায়ের সৈন্যগণ ও হাতীর পাল ছত্রভঙ্গ হয়েছিল এবং মুসলমানরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে লুণ্ঠন করেছিল। এই পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে মুহম্মদ শিরান শিবির থেকে তিন দিন অনুপস্থিত ছিলেন এবং এজন্য আমীররা তাঁর সম্বন্ধে আশঙ্কা ব্যক্ত করতে সুরু করেছিলেন। তৃতীয় দিনের পর খবর এল যে মুহম্মদ শিরান আঠার বা ততোধিক হাতীকে কোন একটা জঙ্গলে মাহুত সমেত ধরেছেন এবং স্বয়ংই একা একা সেগুলিকে আগলাচ্ছেন। (তাঁর সাহায্যে) ঘোড়সওয়ার পাঠানো হল এবং হাতীগুলি আনা হল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুহম্মদ শিরান অত্যন্ত সাহসী এবং শান্ত লোক ছিলেন। তিনি বন্দী আলী মর্দানকে নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন তিনিই সমস্ত খলজী আমীরের প্রধান ছিলেন বলে সবাই তাঁর কাছে আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং প্রত্যেক আমীর তাঁর নিজের জায়গীর শাসন করতে লাগলেন।

"আলী মর্দান কোন কৌশলে কোতোয়ালের সাহায্য লাভ করে কারাগার থেকে পালিয়ে দিল্লী-দরবারে চলে যান। তাঁর আবেদন শুনে সুলতান কুৎবুদ্দীন কাএমাজ রুমীকে অযোধ্যা থেকে লখনৌতিতে পাঠিয়ে দিলেন এবং রাজ-আদেশ জারী করে খলজী আমীরদের স্থান নির্দিষ্ট করলেন। হুসামুদ্দীন ইওজ খলজী, যিনি মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর কাছে থেকে গঙ্গতরী অঞ্চল পেয়েছিলেন— কাএমাজ রুমীকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেওকোটে গেলেন। এখানে কাএমাজ তাঁকে (হুসামুদ্দীনকে) দেওকোট জায়গীর দেওয়ার পর— অযোধ্যার দিকে যাত্রা করলেন। মুহম্মদ শিরান এবং অন্যান্য খলজী আমীররা একত্র হয়ে দেওকোট আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন, তাই কাএমাজ যাত্রার মাঝপথ থেকে ফিরে এসে খলজী আমীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং মুহম্মদ শিরান ও অন্যান্য খলজীরা পরাস্ত হলেন। তারপর খলজী প্রধানদের মধ্যে মাসেদা-সন্তোষের কাছাকাছি জায়গায় বিদ্রোহ আরম্ভ হল এবং মুহম্মদ শিরান নিহত হলেন।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় মুহম্মদ শিরান নির্ভীক ও দক্ষ লোক ছিলেন —তা না হলে আলী মর্দানকে বন্দী করতে পারতেন না। বখতিয়ারের জীবদ্দশায়ও তিনি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর একা একা মাহুত সমেত ১৮টি হাতী আটকে রাখার কাহিনী একটু সন্দেহজনক। অবশ্য এমন হতে পারে যে মাত্র দু'একজন মাহুতই জীবিত ছিল, তারা নিরস্ত্র ও শিরান সশস্ত্র ছিলেন বলে তারা শিরানকে ভয় পেয়েছিল। শিরানের জনপ্রিয়তাও খুব বেশি ছিল, খলজী আমীরেরা বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং বখতিয়ারের শূন্য আসনে তাঁকেই বসিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর বুদ্ধির অভাব ছিল বলে মনে হয় : আলী মর্দানের মত দুর্দান্ত শত্রুকে বন্দী করার পর, বধ না করে কারাগারে রেখে দেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। শিরান বোধ হয় ভেবেছিলেন আলী মর্দানকে বিচারের পর শাস্তি দেওয়া হবে। তা যদি ভেবে থাকেন, তা হলে তিনি সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একটু বেশি ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মুহম্মদ শিরান বোধহয় দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন হয়েছিলেন; অন্তত তিনি যে দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে দূত ও উপঢৌকন পাঠান নি, তা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। উপযুক্ত শক্তি ছাড়াই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার তাঁর পক্ষে অসঙ্গত হয়েছিল।

এই ভুলের ফলেই আলী মর্দানের নালিশে কুৎবুদ্দীন শিরানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করলেন এবং কুৎবুদ্দীনের "রাজ-আদেশের" ফলে হুসামুদ্দীন ইওজ খলজী ও অন্য অনেক খলজী সর্দার শিরানের বিপক্ষে চলে গেলেন। কাএমাজ রুমীর কাছে চূড়ান্ত পরাজয়ের পরে শিরান কী করেছিলেন, তাই নিয়ে ডঃ আবদুল করিম জল্পনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মোহাম্মদ শীরন খলজীর মত স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক যোদ্ধা যে মাসেদা সন্তোষে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন এমন মনে হয় না।" (বা. ই. মু. আ., পৃঃ ৮৯)। কিন্তু শিরান মোটেই হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলেন না, তিনি সেই সময়ে তাঁর একদা সহযোগী খলজী সর্দারদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলেন। এইসব খলজী সর্দার শিরানের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাএমাজ রুমীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তাই এখন তারা শিরানের সঙ্গেই বিবাদ সুরু করেছিল। সেই বিবাদের ফলেই শিরান নিহত হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিরান নির্ভীক অথচ নির্বোধ লোক ছিলেন। তাঁর রাজত্ব দুই-এক বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি বলে মনে হয়। বখতিয়ার খলজীর শেষ রাজধানী দেবকোটেই তিনি রাজধানী রেখে দিয়েছিলেন।

মালিক আলী মর্দান খলজী বা সুলতান আলাউদ্দীন

মুহম্মদ শিরান খলজীর ক্ষমতাচ্যুতির পরে কিছুকাল লখনৌতি রাজ্য দিল্লীর অধীন থাকে এবং হুসামুদ্দীন ইওজ খলজী দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে দেবকোটে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু তারপর আলী মর্দান বাংলায় ফিরে আসেন এবং এদেশের শাসনকর্তা হন—প্রথমে দিল্লীর অধীনে, পরে স্বাধীন সুলতান হিসাবে। এ সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে এই বিবরণ পাওয়া যায় :

আলী মর্দান অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও ভয়হীন লোক ছিলেন। নারকোটির কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি সুলতান কুৎবুদ্দীনের দরবারে আসেন, তারপর তাঁর সঙ্গে গজনীতে যান এবং সেখানে তুর্কীদের হাতে এক গিরিপথে গ্রেপ্তার হন। কথিত আছে যে একদিন তিনি যখন সুলতান তাজুদ্দীন ইয়ালদুজের সঙ্গে শিকার করার জায়গায় যাচ্ছিলেন,তখন তিনি খলজী আমীরদের অন্যতম সালারি জাফির নামে অভিহিত একজন লোককে বলেন, "যদি আমি একটি তীর দিয়ে সুলতান তাজুদ্দীন ইয়ালদুজকে বধ করি এবং আপনাকে রাজা করে দিই,

তা হলে আপনি কী বলবেন ?"

জাফির খলজী বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে জাফির তাঁকে দুটি ঘোড়া দিয়ে বিদায় করলেন। হিন্দুস্তানে পৌঁছে তিনি সুলতান কুৎবুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করার পর সম্মান-পরিচ্ছদ ও অনুগ্রহের অধিকারী হলেন। লখনৌতি প্রদেশ তাঁকে শাসন করতে দেওয়া হল এবং তিনি সেখানে চলে গেলেন। কোশী নদী পার হবার পর হুসামুদ্দীন ইওজ খলজী দেওকোট থেকে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এর পর তিনি (আলী মর্দান) দেওকোটে প্রবেশ করে রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং পুরো রাজ্য তার শাসনাধীনে আনেন। সুলতান কুৎবুদ্দীনের মৃত্যু হলে আলী মর্দান রাজকীয় মর্যাদা গ্রহণ করলেন এবং 'সুলতান আলাউদ্দীন' এই উপাধিতে তাঁর নামে খুৎবা পাঠের আদেশ দিলেন। তিনি নানা দিকে তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠালেন এবং বহু খলজী আমীর নিহত হলেন। চারপাশের রায় (হিন্দু রাজা)-রা খুব ভয় পেলেন এবং তাঁর কাছে অনেক উপঢৌকন ও কর পাঠাতে লাগলেন। আলী মর্দান হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে জায়গীর দিতে লাগলেন। তিনি দরবারে অত্যন্ত অর্থহীন ও দম্ভপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন ; প্রকাশ্য দরবারে তিনি খোরাসান, গজনী ও ঘোর প্রভৃতি দেশে রাজত্বের কথা বলতেন। এমনকি তিনি গজনী, খোরাসান এবং ইরাকে জায়গীর দেওয়ার কথা বলতেন।

কথিত আছে যে ঐ দেশে দারিদ্র্য-জর্জরিত একজন বণিক ছিলেন। তিনি তাঁর সব সম্পত্তি হারান। তিনি আলী মর্দানের কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কোন্ দেশের বাসিন্দা"। ঐ বণিক জবাবে তাঁকে বললেন, 'সাফাহান' (ইস্পাহান)। রাজা তখন আদেশ দিলেন যে ঐ বণিককে সাফাহান জায়গীর হিসাবে দেওয়া হল, এই কথা উল্লেখ করে একটা ফরমান প্রস্তুত করা হোক। তাঁর ভয়ঙ্কর কঠোরতা এবং কর্কশ প্রকৃতির জন্য কেউ এই কথা বলতে সাহস করল না যে সাফাহান তাঁর অধিকারভুক্ত নয়। তখন যদি কেউ তাঁকে বলত যে ঐ স্থান তাঁর অধিকারের মধ্যে নয়, তবে তিনি উত্তর দিতেন 'আমি ঐ স্থান অধিকার করব'।...ঐ স্থানের মানী ও বিজ্ঞ লোকরা ঐ গরীব বণিকের হয়ে আবেদন জানালেন, "সাফাহানের জায়গীরদারের যাওয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং ঐ শহর দখলে

করতে এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে।" তদনুসারে ঐ বণিককে প্রভূত অর্থ দান করার আদেশ দেওয়া হল। ঔদ্ধত্য, কপটতা ও বৃথা অহঙ্কার আলী মর্দানকে এতটা উত্তেজিত করে রেখেছিল। এ সব ছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্মম ও হত্যাকারী লোক। গরীব জনসাধারণ এবং অনুবর্তীরা তাঁর অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

"বিদ্রোহ করা ছাড়া তাদের মুক্তির আর কোন পন্থা ছিল না। খলজী আমীররা তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে তাঁকে বধ করলেন। অতঃপর তাঁরা হুসামুদ্দীন ইওজ খলজীকে সিংহাসনে বসালেন। তাঁর (আলী মর্দানের) রাজত্বকাল ছিল দু' বছরের কিছু বেশি বা কম।"

উপরের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে আলী মর্দান বা আলাউদ্দীন ছিলেন বিবেকবর্জিত, নিষ্ঠুর, স্বেচ্ছাচারী ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক, শেষ দিকে তাঁর মাথারও গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এমন কেউই বোধ হয় নেই যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি বোধ করবেন। তবে মেজাজ ভাল থাকলে তিনি দরাজ হাতে দানধ্যান করতেন, এমন কথাও এই বিবরণে পাই। সম্ভবত এরই জন্যে তিনি কয়েক বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন।

আলী মর্দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকাও আছে। বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন সুলতান হিসাবে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন (ইতিপূর্বে বখতিয়ার খলজী মুহম্মদ ঘোরীর নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন, নিজের নামে নয়)। সুলতান আলাউদ্দীন বা আলী মর্দানের এমন কিছু মুদ্রা কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে অশ্বারোহীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে (J N S I, 1973, p. 198 দ্রঃ)।

এই মুদ্রাটির আবিষ্কার আর এক কারণেও উল্লেখযোগ্য; ইতিপূর্বে অনেকেরই ধারণা ছিল যে "অশ্বারোহী মার্কা মুদ্রা বাংলা দেশে কোন সময় প্রচলিত বা জনপ্রিয় ছিল না; উত্তর ভারতেই অশ্বারোহী মার্কা মুদ্রা প্রচলিত ছিল।" (বা. ই. সু. আ. পৃঃ ১০৩) আলী মর্দানের মুদ্রা এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। ইলতুৎমিশেরও অশ্বারোহী-মার্কা মুদ্রা পাওয়া গেছে; তাদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, তাদের তারিখ ৬১৪ হিঃ, অর্থাৎ আলী মর্দানের মৃত্যুর পরবর্তী। সম্ভবত আলী মর্দানের মুদ্রার অনুকরণেই ইলতুৎমিশ এই ধরণের মুদ্রা উৎকীর্ণ করান। এটাও লক্ষণীয় যে ইলতুৎমিশের অশ্বারোহী

মার্কা মুদ্রাগুলির বেশির ভাগই পূর্ব ভারতে পাওয়া গেছে। মুহম্মদ ঘোরীর "গৌড়বিজয়ে" মুদ্রাও অশ্বারোহী মার্কা (J N S I, 1973, p. 197 দ্রঃ), তা'ও বাংলার টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়।

আলী মর্দান অন্যান্য দিক দিয়ে নিম্নশ্রেণীর লোক হলেও তাঁর মধ্যে একটা ভাল দিক দেখতে পাওয়া যায়। যিনি বারবার তাঁর উপকার করেছিলেন, সেই কুৎবুদ্দীন আইবকের প্রতি আনুগত্য থেকে তিনি স্খলিত হন নি। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কুৎবুদ্দীনের মৃত্যুর পরে।

১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন কুৎবুদ্দীন অল্প সময়ের জন্য গজনী অধিকার করেন, তখন আলী মর্দান তাঁর সঙ্গে ছিলেন; অর্থাৎ তখনও তিনি লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার পান নি; এর কিছু পরে ১২০৯ খ্রীঃর মত সময়ে গজনী থেকে ফিরে এসে তিনি ঐ ভার পান; ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে কুৎবুদ্দীনের মৃত্যু হলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; মীনহাজের উক্তি অনুযায়ী তিনি আরও দু' বছর অর্থাৎ ১২১২ খ্রীঃ অবধি জীবিত ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু পরবর্তী শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজী বার বছর এবং ১২২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, এ কথা মীনহাজই লিখেছেন। সুতরাং আলী মর্দান ঠিক কত দিন রাজত্ব করেছিলেন এবং কবে নিহত হয়েছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে তিনি ১২১২ ও ১২১৫ খ্রীঃ-র মাঝামাঝি কোন সময়ে নিহত হন, তাঁর রাজত্বেরও অবসান ঘটে।

গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজী

আলী মর্দানের পরবর্তী শাসক হিসামুদ্দীন ইওজ খলজী সিংহাসনে আরোহণ করে নতুন নাম নিলেন গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহ। এখানে একটা জিনিস লক্ষ করবার আছে। ইতিপূর্বে বারবার ইওজ দিল্লীর প্রতি বশ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। দিল্লীর প্রতি বশ্যতার পরিচয় দিয়েই তিনি মুহম্মদ শিরান খলজীর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং শিরানের বিরুদ্ধে প্রেরিত কাএমাজ রুমীকে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন; এর পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন, দিল্লীর অধীনে দেবকোটে লখনৌতি-রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর যখন আলী মর্দান দিল্লীর অনুমোদন পেয়ে বাংলায় ফিরে এলেন, তখন দিল্লীর প্রতি বশ্যতার কারণেই ইওজ এগিয়ে গিয়ে আলী মর্দানকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং বিনা

বাক্যে তাঁকে লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দিলেন; অথচ আলী মর্দানকে তিনি ভাল করেই চিনতেন, এরকম দুর্দান্ত লোক রাজ্যের শাসনভার পেলে কী করবে, তা তিনি না বুঝতেন এমন নয়; এইভাবে দিল্লীর বশংবদ ইওজের সমর্থনে আলী মর্দান কয়েক বছর লখনৌতি-রাজ্য শাসন করে সেখানে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করলেন। অবশেষে খলজী আমীররা সমবেত হয়ে যখন আলী মর্দানকে বধ করে ইওজকে সিংহাসনে বসতে আহ্বান জানালেন, তখন ইওজ বিনা দ্বিধায় স্বাধীন সুলতান হিসাবে সিংহাসনে বসলেন, দিল্লীর প্রতি বশ্যতার কথা এখন আর তাঁর মনে রইল না; শুধু তাই নয়, এখন থেকে তিনি দিল্লীব বিরুদ্ধাচরণও করতে লাগলেন। এব থেকে বোঝা যায়, আর পাঁচজনের মত ইওজও ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও সুযোগ-সন্ধানী লোক, বারবার ভোল পালটাতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তাঁর অনেক সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এই দিক্‌টার কথা ভুলে গেলে চলবে না।

এঁর সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে এই বিবরণ পাওয়া যায়:

হুসামুদ্দীন ইওজ সৎ লোক ছিলেন। তিনি ঘোর-দেশীয় গর্মশিরের খলজী। কথিত আছে, তিনি একবার ঘোব সীমান্তের ওয়ালিস্তান নামক জায়গা থেকে—যাকে উচ্চ ভূখণ্ডের দেশ বলা হয়,—সেই পোশ্‌তাহ্‌-ই-আফরোস যাবার পথে, ভারবাহী গাধা চালিয়ে একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। ছিন্ন পোষাক পরিহিত দু' জন দরবেশ তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কোন খাদ্য আছে কি?" ইওজ খলজী জবাব দিলেন, "আছে।" তাঁর কাছে পথ-চলার সময়ে খাওয়ার জন্য রুটি ছিল, সেগুলি তিনি গাধার পিছনে বাঁধা থলি থেকে নিয়ে দরবেশদের সামনে মেলে ধরলেন। তাঁদের ভোজন চলার সময়ে গাধার পিঠে বাঁধা জল হাতে নিয়ে তাঁদের দেবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। দরবেশদের যখন এত তাড়াতাড়ি খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হল, তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন, "এই ভাল লোকটি আমাদের সেবা করেছে, তাই সেবার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।" তাঁরা ইওজ খলজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "সর্দার! তুমি হিন্দুস্তানের দিকে যাও। সে দেশে যতদূর ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে, ততদূরের দেশ আমরা তোমাকে দিচ্ছি।"

দরবেশদের এই নির্দেশে তিনি সেখান থেকে ফিরে গেলেন এবং গাধার উপর স্ত্রীকে বসিয়ে তিনি হিন্দুস্তানের পথ ধরলেন। তিনি মুহম্মদ বখতিয়ারের

সঙ্গে যোগ দিলেন।

তাঁর সৌভাগ্য এতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল যে (সিংহাসনে আরোহণের পর) সমগ্র লখনৌতি রাজ্যে তাঁর নাম খুৎবায় পাঠ করা হয় এবং মুদ্রায় তাঁর নাম অঙ্কিত করা হয়। তাঁকে 'সুলতান গিয়াসুদ্দীন' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি লখনৌতি নগরকে তাঁর শাসন-পরিচালনার কেন্দ্র করলেন (দেবকোট থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে) এবং বসনকোট দুর্গ তৈরী করলেন। চার দিক্ থেকে জনসাধারণ তাঁর কাছে আসতে লাগল, কারণ তিনি ছিলেন ভাল স্বভাবের লোক, সচ্চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের অধিকারী। তিনি মুক্তহস্ত, ন্যায়নিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সৈন্যেরা ও জনসাধারণ, স্বস্তি ও আরামের সঙ্গে বাস করত। তাঁর অধীনস্থ সব আমীর তার উপহার দানে খুবই কৃতার্থ হয়েছিলেন এবং প্রভূত ধন লাভ করেছিলেন। তিনি দেশের মধ্যে তাঁর সদাশয়তার অনেক স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন। তিনি বহু মসজিদ ও খান্‌কাহ্‌-ও নির্মাণ করিয়েছেন। বিশিষ্ট আলিম এবং শেখ ও সৈয়দদের জন্য তিনি বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিতেন। অন্যান্য শ্রেণীর লোকদেরও তিনি ধন-সম্পত্তি দান করতেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে জামালুদ্দীন গজনবীর পুত্র—যিনি জলালুদ্দীন নামে অভিহিত হতেন—তিনি ছিলেন ফিরোজকোহ্‌র ইমামজাদা। তিনি ৬০৮ সনে (হিজরায়) অনুচরবর্গ সমেত হিন্দুস্তানে আসেন কয়েক বছর পরে তিনি প্রভূত ধন সমেত ফিরোজকোহ্‌তে ফেরেন। কীভাবে তিনি ঐ সম্পদ লাভ করলেন তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, হিন্দুস্তানে পৌঁছে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন এবং সেখান থেকে তিনি লখনৌতি যাত্রা করেন। সেখানে গিয়াসুদ্দীনের দরবারে একটি ধর্মীয় উপদেশের উল্লেখ করা হয়। সেই সচ্চরিত্র রাজা তাঁর কোষাগার থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় পূর্ণ একটি বড় পাত্র তাঁকে দান করেন, যার মূল্য দশ হাজার রৌপ্য তঙ্কার (টাকার) মত। তিনি তাঁর অধীনস্থ মালিক, আমীর ও দরবারের সম্ভ্রান্ত লোকদের কিছু দান করতে আদেশ দেন; তদনুসারে প্রত্যেকে তাঁকে কিছু দান করেন যার পরিমাণ তিন হাজার টাকার মত, তাঁর বিদায়ের সময়ে, আগে তিনি যা পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে আরও পাঁচ হাজার টাকা যোগ করা হল; এর ফলে ইমামজাদা লখনৌতির রাজা গিয়াসুদ্দীন খলজীর দয়ায় আঠারো হাজার তঙ্কা পেলেন।

এই বইয়ের লেখক যখন ৬৪১ হিজরায় লখনৌতিতে পৌঁছোন, তখন লখনৌতি রাজ্যের চারদিকে এই রাজার সৎকার্য দেখেন। গঙ্গার দুই দিকে লখনৌতি রাজ্যের দু'টি অংশ আছে; পশ্চিম দিকের অংশটিকে 'রাল' ('রাঢ়') বলা হয়, লখনোর নগর এই দিকে অবস্থিত, পূর্ব দিকটিকে 'বরিন্দ' ('বরেন্দ্র') বলা হয়, দেওকোট নগর ঐ দিকে অবস্থিত। লখনৌতি থেকে লখনোরের ফটক পর্যন্ত এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে দেওকোট নগর পর্যন্ত উঁচু রাস্তা বানানো হয়েছিল এবং এগুলি দৈর্ঘ্যে দশ দিনের যাত্রাপথের মত করা হয়েছিল। এর কারণ এই যে, বর্ষার সময়ে সমগ্র দেশ প্লাবিত হত এবং যদি উঁচু রাস্তা না থাকত, তবে মানুষদের বিভিন্ন অঞ্চলে ও স্থানে নৌকায় করে যেতে হত। তাঁর রাজত্বকালে এই রাস্তাগুলির দরুন সব লোকের চলাচলের উপায় হয়।

এও বলা হয় যে মালিক নাসিরুদ্দীন মাহমূদের মৃত্যুর পর যখন সুলতান সৈয়দ শামসুদ্দীন (ইলতুৎমিশ) ইখতিয়ারুদ্দীনের বিদ্রোহ দমন করতে লখনৌতিতে আসেন, তখন তিনি গিয়াসুদ্দীনের সৎকার্যসমূহ দেখেছিলেন। পরে যখনই তিনি গিয়াসুদ্দীনের নাম উচ্চারণ করতেন তখনই তাঁকে তিনি 'সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহ' বলতেন এবং এই কথা বলেছিলেন যে এত কল্যাণসাধক ব্যক্তিকে 'সুলতান' উপাধিতে বিভূষিত করতে কোন ব্যক্তির দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন কল্যাণকামী, দাতা, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সৎ লোক। লখনৌতির পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্য, যথা জাজনগর, বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) প্রদেশ, কামরূদ ও ত্রিহুত তাঁর কাছে উপঢৌকন পাঠাত।* লখনোর জেলা সম্পূর্ণভাবে তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। (এখান থেকে) প্রভূত পরিমাণে হাতী, রাজস্ব ও ধনসম্পদ তাঁর হস্তগত হয় এবং এখানে তিনি তাঁর আমীরদের অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

সুলতান শামসুদ্দীন (ইলতুৎমিশ) কয়েকবার দিল্লী থেকে লখনৌতিতে সৈন্যবাহিনী পাঠান এবং বিহার জয় করে সেখানে তাঁর আমীরদের নিযুক্ত

* এ কথার যাথার্থ্যে সংশয়ের অবকাশ আছে—কারণ জাজনগর প্রভৃতি দেশ মুসলমানদের অধীন ছিল না, পক্ষান্তরে এই সব দেশের সঙ্গে ইওজ শাহের শত্রুতার সম্পর্ক ছিল তিনি জাজনগর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং বঙ্গ ও কামরূপ জয় করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীমের (১২১১-১২৩৮ খ্রীঃ) এক শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে অনঙ্গভীমের মন্ত্রী ও সেনাপতি বিষ্ণু "যবনাবনীন্দ্র"র সঙ্গে যুদ্ধে অবর্ণনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই "যবনাবনীন্দ্র" নিঃসন্দেহে গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহ, যিনি লখনোর জয় করেন।

রাখেন। ৬২২ হিজরায় তিনি লখনৌতি আক্রমণ করলেন। তখন গিয়াসুদ্দীন তাঁব নৌকাগুলি উঠিয়ে নিলেন (এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গিয়াসুদ্দীন এক নৌবহর গঠন করেছিলেন) এবং তাঁদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল। তিনি ইলতুৎমিশকে আটত্রিশটি হাতী এবং ৮০ লাখ তঙ্কা মূল্যের ধনবত্ন প্রদান করেন। তিনি সুলতানের নামে খুৎবা পাঠের প্রচলন করেন।* বিদায়ের সময়ে সুলতান মালিক আলাউদ্দীন জানীকে বিহার দেন। গিযাসুদ্দীন ইওজ লখনৌতি থেকে বিহাবে এসে তা অধিকার কবলেন এবং অন্যায় কাজ† করতে লাগলেন।

"৬২৪ হিজরায সুলতান শামসুদ্দীনেব পুত্র মালিক শহীদ নাসিরুদ্দীন এক হিন্দুস্তানী সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ কবে মালিক জানীকে সঙ্গে নিয়ে, অযোধ্যা থেকে লখনৌতির দিকে অগ্রসর হলেন। সেই সময়ে গিযাসুদ্দীন ইওজ হোসেন খলজী বঙ্গ (নৌবহর গঠন করার ফলেই তাঁর পূর্ববঙ্গ অভিযানে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল) ও কামরূদ অভিযানে গিয়েছিলেন এবং লখনৌতি রক্ষক-বর্জিত অবস্থায় রেখেছিলেন (এর থেকে মনে হয় গিয়াসুদ্দীন ইওজের বুদ্ধির অভাব ছিল—পিছনে ইলতুৎমিশের মত প্রবল শত্রু থাকা সত্ত্বেও রাজধানী লখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাওয়া তাঁর উচিত হয নি)। মালিক নাসিরুদ্দীন লখনৌতি অধিকার করলেন। এই বিপদের ফলে গিয়াসুদ্দীন ফিরে এসে মালিক নাসিরুদ্দীন মহ্‌মূদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, কিন্তু তাঁকে ও তাঁর সমস্ত আমীরকে বন্দী করা হল। বার বছর রাজত্বের পর তিনি নিহত হলেন।

উপরের বিবরণ থেকে গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের স্বভাব এবং রাজত্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের বক্তব্য ( ) বন্ধনীর মধ্যে বা পাদটীকায় ব্যক্ত করেছি। অন্যত্র মীনহাজ লিখেছেন, "গিয়াসুদ্দীন তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন, খলজী আমীর, সমস্ত অর্থভাণ্ডার ও হাতীর পাল সমেত তাঁর (নাসিরুদ্দীনের) হাতে ধরা পড়েন। গিয়াসুদ্দীনকে

* এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ—৬২২ হিজরায় উৎকীর্ণ কিছু মুদ্রা, পাওযা গেছে, যাতে শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ ও গিযাসুদ্দীন ইওজ—দু'জনেবই নাম আছে (J N S I, 1973, pp. 42-52 দ্রঃ)।

† তা হলে গিয়াসুদ্দীন ইওজও অন্যায় কাজ করতে জানতেন।

তিনি বধ করলেন এবং তাঁর ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন।”

গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে।* মুদ্রাগুলিতে টাকশালের নাম মেলে না, কিন্তু তাদের মধ্যে ‘৬১৬, ৬১৭, ৬১৯, ৬২০, ৬২১’ প্রভৃতি হিজরার বছর এবং ‘১৯শে সফর ৬১৬, রবি-উস-সানী ৬১৭, ৬১৯, ৬২০, ২০শে রবি-উস-সানী ও জমাদি-উস-সানী ৬২১’ প্রভৃতি তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুদ্রাগুলিতে দেখি, গিয়াসুদ্দীন নিজের অনেক উপাধি উৎকীর্ণ করেছেন। উপাধিগুলি তাঁর রাজকীয় মর্যাদার পরিচায়ক। এদের মধ্যে দু’টি উপাধি গুরুত্বপূর্ণ—‘নাসির আমীর উল-মোমেনীন’ ও ‘কসীম আমীর-উল-মোমেনীন।’ এই দুই উপাধি দ্বারা গিয়াসুদ্দীন নিজেকে আব্বাসী খলিফার সাহায্যকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এর থেকে এডওয়ার্ড টমাস প্রভৃতি গবেষকরা মনে করেছিলেন যে ইওজ শাহ্ আব্বাসী খলিফা আল-নাসিরের কাছ থেকে সনদ পেয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ আহমদ হাসান দানী এবং তাঁর অনুবর্তী গবেষক ডঃ আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে ইওজ শাহ্ এরকম কোন সনদ পান নি (বা. ই. সু. আ. পৃঃ ১০০-১০২ দ্রঃ)। ডঃ করিম লিখেছেন, “এই বিষয়ে ডঃ আই, এইচ, কোরেশীর মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, মুসলিম সাম্রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করিবার পর অনেক এলাকার স্বাধীন মুসলমান শাসক নিজেদের শাসন আইনানুগ করার উদ্দেশ্যে আব্বাসী খলিফার অনুমতি ছাড়াই তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিতেন।” গিযাসুদ্দীন ইওজ খলজী তা’ই করেছিলেন, ইলতুৎমিশও প্রথম দিকে তা’ই করেন, পরে তিনি খলিফার সনদও আনিয়েছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের মুদ্রা সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য ডঃ আবদুল করিমের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি,

“কোন কোন মুদ্রায় তিনি ওলী আহাদ বা যুবরাজ আলা-উল-হক-ওয়াদ-দীন (সংক্ষেপে আলা-উদ-দীন) এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন।” (বা. ই. সু. আ., পৃঃ ১০০)।

গিয়াসুদ্দীনের কোন কোন মুদ্রায় জনৈক “মুইজ-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন

---

* ইওজ শাহের ৬২২ হিঃর মুদ্রায় ইওজ ও ইলতুৎমিশ উভয়েরই নাম আছে। এ সম্বন্ধে আগে মন্তব্য করা হয়েছে।

আবুল মুজাফফর"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়; টমাস ভুলভাবে এইসব মুদ্রার পাঠোদ্ধার করেছিলেন এবং এর থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে আব্বাসী খলিফা ইওজ শাহকে প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করে সুলতান নিযুক্ত করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম বলেন, "উপরোক্ত অর্থ করিলে মুদ্রার সম্পূর্ণ বাক্যটির কোন অর্থ হয় না। ·হোয়ের্নল এবং রাইটের পাঠ মানিয়া লইলে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হয়। অর্থ নিম্নরূপ:

'গিয়াস-উদ-দুনিয়া ওয়াদ দীন যিনি করীম আমীর-উল মোমেনীন, সুলতান-উস-সলাতীন এবং নাসির আমীর-উল-মোমেনীন ছিলেন, তিনি মুঈজ-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মুজফ্‌ফরকে নিযুক্ত করেন।'

∴…অন্য কোন সূত্রে মুইজ-উদ-দীনের নামও পাওয়া যায় না (পাওয়া গেছে, সে সম্বন্ধে আমরা নীচে আলোচনা করছি)। হয়ত যুবরাজ আলা-উল-হকের অকাল মৃত্যু হয় এবং সেই জন্য পরবর্তী মুদ্রায় ইওজ খলজী অন্য একজন যুবরাজ মুইজ-উদ-দীনের নাম অঙ্কিত করিয়াছেন।" (বা. ই. মু. আ. পৃ: ১০৫)

উপরের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ মুদ্রাটিতে "আলায়দ" শব্দ আছে ধরে নিয়ে তার বাংলা করা হয়েছে "নিযুক্ত করেন" কিন্তু ডঃ জেড এইচ দেশাই দেখিয়েছেন, "আলায়দ" ভ্রান্ত পাঠ, প্রকৃত পাঠ হবে আলী শের* ; যা হোক, মুইজুদ্দীন যে গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের পুত্র ছিলেন—তার প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রামে (বোলপুর থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত) মখদুম শাহের দরগা† নামে পরিচিত একটি দরগায় এক খণ্ডিত শিলালিপি** পাওয়া গেছে। ডঃ জেড এইচ দেশাই এর পাঠোদ্ধার করেছেন (Epigraphica Indica, Arabic & Persian Supplement, 1975, pp. 7-8)। ডঃ দেশাই এর যে ইংরেজী অনুবাদ করেছেন—তা উদ্ধৃত করছি,

* Epigraphica Indica, Arabic & Persian Supplement, 1975, p. II.

† অনেকের ধারণা এই মখদুম শাহ হচ্ছেন শেখ জলালুদ্দান তব্রিজী। এই মতের স্বপক্ষে সামান্যতমও প্রমাণ নেই।

** আসলে, এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছে পাল রাজাদের (নয়পাল বা তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালের) আমলের এক শিলালিপির (ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এই শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং নানা জায়গায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন) উল্টো পিঠে।

"(1) In the name of Allāh. the Beneficent, the Merciful (In houses which Allāh has permitted to be exalted and that) His name may be remembered in them ; there glorify Him therein in the mornings and evenings,

(2) men whom neither merchandise nor selling diverts from the remeembrance (of Allāh and the keeping up of prayer and) the giving of poor-rate , they fear a day in which shall turn about,

(3) 'the heatrs and the eyes' (Saying quoted) from the Messenger of Allāh, may Allāh's (peace and salutations be upon him in) the sahlh 'Men are in their in prayer-houses (mosques)and Allāh is (looking) after their needs'

(4) this Khānqāh was (built and) donated by the humble creature (al-Faqir), the sinful, the one who hopes (for the mercy of his Nourisher, ·) son of Muhammad al-Marāghī., (i.e by origin, of Marāgha), for the benchers (Ahl-i Suffa i. e. ascetics, sufis) who all the while abide in the presence

(5) of the Exalted Allāh and occupy themselves in the remembrance of the Exalted Allāh in the (time of the government ? of the Shelter ?) of Islām and the Muslims, Chief among the monarchs and the Sultāns one who is specially fovoured

(6) by the lordship of the Time in the Worlds, 'Ali Shīr son of 'Iwad, Burhānu Amiru'l-Mu'minin (lit. Proof of the Commander of the Faithful), on the seventh day of (the month of) Jumādā II, year (A. H.) eighten and six hundred (7 Jumādā II 618 – 29 July 1221).

এই শিলালিপিটি বিশেষ মূল্যবান। প্রথমত, বাংলার মুসলমান আমলের এটিই প্রথম শিলালিপি—১২২১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের মাত্র

১৭ বছর পরে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এত আগে বীরভূমের আভ্যন্তর প্রদেশে অজয় নদের অনতিদূরে মুসলিম রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল,* এটাও একটা নতুন খবর ; কিন্তু এরকম হওয়া খুব স্বাভাবিক, কারণ সিয়ান নদীয়া ও লখনোরের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত। তৃতীয়ত, শিলালিপিটিতে একটি খানকাহ্ বা সূফী দরবেশদের ধর্মশালা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে ; খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত শিলালিপি ভারত-উপমহাদেশে খুব কমই পাওয়া গেছে ; মীনহাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে বখতিয়ারের খানকাহ্ স্থাপনের উল্লেখ আছে, ইওজ শাহের রাজত্বকালেও যে সেই প্রথা চলেছিল, তারও উল্লেখ পাই। এর পাথুরে প্রমাণ এই শিলালিপি থেকে পাওয়া গেল। চতুর্থত, ইওজ শাহের পূর্বোক্ত মুদ্রায় (৬২১ হিজরার) যে মুইজুদ্দীনের উল্লেখ আছে, তিনি এবং এই শিলালিপিতে উল্লিখিত আলী শের অভিন্ন লোক। এ সম্বন্ধে ডঃ জেড এইচ দেশাই লিখেছেন, "· the coin stated to have been minted in A. H. 621 and published by Hoernele, is assigned to him. But the legend on the reverse has (1) Ghiyāthu, d-Dunya wa'd-Dīn (2) Abu'l-Fath 'Iwad bin Husain (3) Qāsimu Amiri'l-Mu'minin Sultān (4) u's-Salātin Mu'izzu'd-Dunyā wa'd-Dīn (5) Abul-Muzaffar 'Ali Shīr 'Iwad (6) Burhānu (?) Amiri'l-Muminīn." ডঃ দেশাইও বলেন" 'Ali Shīr mentioned in our record (শিলালিপি) as the son of 'Iwad is identical with him (মুইজুদ্দীন) and the 'Iwad of the record is none other than Ghiyāth'ud-Dīn 'Iwad."

ডঃ দেশাই-এর মতে এই মুইজুদ্দীন আলী শের ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন ; তাঁর যুক্তি এই যে, শিলালিপিটিতে আলী শেরের সে সব উপাধি দেখা যায়, সেগুলি "are used in inscriptions, coins and historical works only for monarchs and rulers." এ মত মানা যায় না। ১২২১ খ্রীঃর কয়েক দশক পরে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের ছেলেরা পিতার অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবেই পূর্ণ রাজকীয় উপাধি নিয়ে মুদ্রা জারী করেছিলেন।

* বহু বছর আগে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বীরভূম-বিবরণ' ৩য় খণ্ডে কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে (তখনও সিয়ানের আলোচ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত ও পঠিত হয় নি) লিখেছিলেন যে গিয়াসুদ্দীন সিয়ানের স্থানীয় হিন্দু রাজার কাছ থেকে সিয়াম অঞ্চল জয় করেছিলেন।

এক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার হয়েছিল বলে ডঃ দেশাই এ কথাও বিশ্বাস করতে রাজী আছেন যে গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের রাজত্ব ৬১৭ হিজরায় শেষ হয়েছিল, কারণ পরবর্তী কালে লেখা এক সূত্রে এই তারিখ উল্লিখিত হয়েছে (Epigraphica Indica, op. cit., p. 10) 'কিন্তু তবকাৎ ই-নাসিরী'র সব পুথিতেই লেখা আছে যে ৬২৪ হিজরায় ইওজ শাহ নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের হাতে পরাস্ত ও নিহত হয়েছিলেন ; এর পর নাসিরুদ্দীন দেড় বছর লখনৌতি-রাজ্য শাসন করেছিলেন এবং ৬২৬ হিজরার জমাদী অল-আউয়ল মাসে ইলতুৎমিশের কাছে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছেছিল ; ৬১৭ হিজরায় ইওজ নাসিরুদ্দীনের হাতে নিহত হয়েছিলেন বললে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সঙ্গেই বিরোধ বাধে। ডঃ দেশাই মনে করেন "the statements of the later authorities which must have been based on good copies of the earlier authorities including the Tabaqāt-i-Nāsirī cannot be brushed aside easily or summarily." কিন্তু ঐ রকম কোন "good copy" না দেখা পর্যন্ত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র বর্তমান পুথিগুলির সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করতে পারি না। মোটের উপর এক্ষেত্রে এই "Later authority"র সাক্ষ্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের ৬১৭ হিজরার পরবর্তী তারিখের অনেক মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

সুতরাং মুইজুদ্দীন বা আলী শের ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে সিয়ান ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলি শাসন করতেন বলে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম। আমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একটা বড় প্রমাণ আছে। ৬২১ হিজরায় উৎকীর্ণ গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের যে মুদ্রাটিতে ডঃ দেশাই আলী শেরের নাম লেখা আছে বলে দেখিয়েছেন, তাতে ইওজ শাহ ও আলী শের—দু' জনেরই নাম রাজকীয় উপাধি সমেত উল্লিখিত হয়েছে। অথচ কেবল গিয়াসুদ্দীনকেই "সুলতান" বলা হয়েছে। অতএব পিতার জীবদ্দশাতেই যে আলী শের রাজকীয় উপাধি ব্যবহারের অধিকার পেয়েছিলেন, তা প্রমাণিত হচ্ছে। ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসাবে আলী শেরকে আমরা পাচ্ছি ; সম্ভবত তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল লখনোরে।

মীনহাজ-ই-সিরাজের লেখা থেকে বোঝা যায়, মুহম্মদ শিরান বখতিয়ার কর্তৃক লখনোর জয়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু জয় করতে তিনি পারেন

নি—বখতিয়ারের মৃত্যুর জন্য। ইওজ শাহ প্রথম লখনোর অধিকার করেন; অধিকারের পরই সম্ভবত নিজের পুত্র আলী শেরের উপর তিনি লখনোরের শাসনভার দেন এবং তাঁকে পূর্ণ রাজকীয় মর্যাদার অনুরূপ উপাধি ব্যবহারেরও অনুমতি দেন।

গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহ যে একজন যোগ্য রাজা ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য তাঁর চরিত্রে দোষও ছিল। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে গোড়ার দিকে তিনি নির্লজ্জ সুবিধাবাদের পরিচয় দিয়েছেন এবং শেষ দিকে তিনি উপযুক্ত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর নাম এই কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে তিনিই বাংলার প্রথম জনহিতৈষী মুসলমান সুলতান। ইতিপূর্বে বখতিয়ার খলজী তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্য কিছু কিছু হিতকর কাজ করেছিলেন, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক জনহিতকর কাজ বোধ হয় ইওজ শাহই প্রথম করলেন। দেবকোট থেকে লখনোর অবধি রাস্তা তৈরী করা তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লী থেকে প্রেরিত শাসকবৃন্দ

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ

(ইলত্‌ৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র)

মীনহজ-ই-সিরাজ লিখেছেন, "সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজী বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) রাজ্য আক্রমণের জন্য সসৈন্যে লখনৌতি থেকে যাত্রা করেছিলেন এবং তাঁর রাজধানী অরক্ষিত রেখে গিয়েছিলেন। মালিক নাসিরুদ্দীন সেখানে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছে বসনকোট দুর্গ ও লখনৌতি নগরের অধিকার নিলেন। গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজী এই সংবাদ পেয়ে লখনৌতির দিকে রওনা হন এবং মালিক নাসিরুদ্দীন সসৈন্যে তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে পরাজিত করেন। গিয়াসুদ্দীন তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজন, খলজী আমীর, সমস্ত অর্থ ভাণ্ডার ও হাতীর পাল সমেত তাঁর হাতে ধরা পড়েন। গিয়াসুদ্দীনকে তিনি বধ করলেন এবং তাঁর ধনভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত হল। এই সমগ্র ধনরত্ন তিনি দিল্লী ও অন্যান্য শহরের সৈয়দ, আলিম, ফকির, দরবেশ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের উপহার ও ভেট পাঠান।

"যখন সুলতান শামসুদ্দীন শাসনকারী খলিফার কাছ থেকে খিলাৎ পেলেন, তখন তিনি শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তিকে একটি লাল চাঁদোয়া ও মূল্যবান বস্ত্র সমেত লখনৌতিতে পাঠালেন এবং মালিক নাসিরুদ্দীন এইভাবে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেন। হিন্দুস্তানের মালিক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শামসী রাজত্বের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁরই দিকে তাকালেন, কিন্তু ভাগ্যের আদেশ ও জনসাধারণের ইচ্ছার মধ্যে ঐকমত্য হল না। দেড় বছর অসুস্থ হয়ে থাকার পর তিনি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দিল্লীতে গেলে সবাই অত্যন্ত দুঃখ বোধ করেছিল।"

এই বিবরণের মধ্যে কোন গোলযোগ নেই, তবে খলিফার খিলাৎ পাঠানোর তারিখ নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। মীনহাজ অন্যত্র লিখেছেন, ৬২৬ হিজরার রবি-উল-আউয়ল মাসে খলিফার লোকেরা খিলাৎ নিয়ে দিল্লীতে আসে। তারু

পরেই ইলতুৎমিশ লখনৌতিতে পুত্রের কাছে একটি লাল চাঁদোয়া পাঠিয়েছিলেন। এদিকে ৬২৬ হিজরার জমাদী-উল-আউয়ল মাসে ইলতুৎমিশ পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন বলে মীনহাজ লিখেছেন। মাত্র দু' মাস এত ঘটনা ঘটবার এবং খিলাৎ নিয়ে দিল্লী থেকে বাংলায় লোক যাবার ও নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে বাংলা থেকে দিল্লীতে লোক আসার পক্ষে যথেষ্ট সময় নয়। তাই মনে হয় যে, ইলতুৎমিশ নাসিরুদ্দীনের উদ্দেশে যে লাল চাঁদোয়া পাঠিয়েছিলেন সেটি লখনৌতিতে পৌঁছোবার আগেই নাসিরুদ্দীন পরলোকগমন করেছিলেন।

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয় এবং ইলতুৎমিশ তাঁর কবরে একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করান। এটি সুলতান গারির (Garhi) মকবরা নামে পরিচিত এবং এখনও বর্তমান।

আলাউদ্দীন দৌলৎ শাহ এবং ইখতিয়ারুদ্দীন বলকা খলজী

এর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে 'তবকাৎ ই-নাসিরী'তে শুধু এইটুকু মাত্র বিবরণ মেলে,

"(নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পরে) বলকা মালিক খলজী লখনৌতি রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সুলতান শামসুদ্দীন (ইলতুৎমিশ) লখনৌতির দিকে হিন্দুস্তানের সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করলেন এবং বিদ্রোহীকে বন্দী করে, ৬২৭ হিজরায়, তিনি লখনৌতির শাসনভার মালিক আলাউদ্দীন জানীকে অর্পণ করলেন এবং ঐ বছরের রজব মাসে দিল্লীতে ফিরে এলেন।"

র‍্যাভার্টি জানিয়েছেন যে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র প্রাচীনতম পুথিতে ও বেশির ভাগ পুথিতে "৬২৭ হিজরা"র জায়গায় "৬২৮ হিজরা" মেলে। (তাঁর অনুবাদ, p. 617, n. 5)। এইটিই সঠিক পাঠ বলে মনে হয়।

একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে, "তার এক পিঠে "আলা-উদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল গাজী দৌলত শাহ বিন মৌদুদ" নামক একজন সুলতানের এবং অপর পিঠে আব্বাসী খলিফা মুস্তন্‌সির বিল্লাহ্‌ ও শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের নাম উৎকীর্ণ আছে। মুদ্রাটির তারিখ অনেকে পড়েছেন ৬২৭ হিজরা। যাঁরা ৬২৭ হিজরাকে গ্রহণ করেছেন, এমন অনেকে মনে করেন যে বলকা খলজীই

(ইখতিয়ারুদ্দীন বলকা খলজী নামেও উল্লিখিত) দৌলৎ শাহ্ বিন মৌদুদ নাম নিয়ে মুদ্রা জারী করেন। কিন্তু বলকা খলজী ইলতুৎমিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, সুতরাং তিনি মুদ্রায় ইলতুৎমিশের নাম উৎকীর্ণ করবেন কেন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, দৌলৎ শাহের পিতার নাম মৌদুদ আর বলকা খলজী কোন কোন সূত্রের মতে গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের পুত্র। র‍্যাভার্টি ব্যবহৃত কোন কোন পুথিতে ইলতুৎমিশের আমীরদের তালিকায় "মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ-ই-বলকা, লখনৌতির মালিক হুসামুদ্দীন ইওজ খলজীর পুত্র"র নাম আছে (তবকাৎ-ই নাসিরীর ইংরেজী অনুবাদ, p. 617, n. 5)। তৃতীয়ত, 'তবকাৎ-ই নাসিরীর' কোন কোন পুথিতে বলকা খলজীর পুরো নাম পাই "ইখতিয়ারুদ্দীন ইরান শাহ বলকা খলজী।"* (Hodivala, Studies in Indo-Muslim History, p, 215) তিনি এই নাম বদলে "আলাউদ্দীন দৌলৎ শাহ" নাম নেবেন বলে মনে হয় না।

দৌলৎ শাহ বিন মৌদুদের পরিচয় সম্বন্ধে (তাঁর মুদ্রাটি ৬২৭ হিজরীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল ধরে নিয়ে) ডঃ আবদুল করিম মনে করেন, "নাসির-উদ-দীন মাহমুদের আকস্মিক মৃত্যুর পরে লখনৌতিতে ইলতুতমিশের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, নূতন গবর্ণর নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য দওলৎ শাহ নামক একজন সেনানায়ক দিল্লীর সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আব্বাসী খলিফা, দিল্লীর সুলতান এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন।" (বা. ই. সু. আ. পৃঃ ১১৪) এই মত সত্য হলে বলতে হবে, এর পর বলকা খলজী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দৌলৎ শাহকে অপসারিত (ও সম্ভবত বধ) করে স্বাধীন সুলতান হন।

যাহোক, এই মত সত্য হোক বা না হোক, এটা নিশ্চিত যে বলকার বিদ্রোহের খবর ইলতুৎমিশের কাছে পৌছলে ইলতুৎমিশ লখনৌতিতে এসে বলকাকে দমন ও বন্দী করে আলাউদ্দীন জানীকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

* কোন কোন পরবর্তী সূত্রের মতে বলকা খলজীর রাজকীয় নাম "নাসিরুদ্দীন ইওজ শাহ" (র‍্যাভার্টি এ খবর দিয়েছেন)। এ নামও "আলাউদ্দীন দৌলৎ শাহ" থেকে পৃথক।

আলাউদ্দীন জানী

আলাউদ্দীন জানী সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন,

"মালিক আলা-উদ-দীন জানী সুলতান ইলতুতমিশের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন ; ইলতুতমিশ যখন প্রথমবার লখনৌতি আক্রমণ করেন, তিনি মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে সঙ্গে নিয়া আসেন এবং বিহারের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইলতুতমিশ দিল্লী ফিরিয়া গেলে ইওজ খলজী আলা-উদ-দীন জানীকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দেন। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদও লখনৌতি জয় করার সময়ে আলা-উদ-দীন জানীকে সঙ্গে করিয়া লখনৌতি নিয়া আসেন। আবার ইলতুৎমিশ ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খলজীকে দমন করিয়া আলা-উদ-দীন জানীকেই লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত করেন।"

উপরের বিবরণে আলাউদ্দীন জানীর লখনৌতির শাসনকর্তা হবার আগেকার ইতিহাসটি পাওয়া যাচ্ছে। ইলতুৎমিশের মালিক (সেনাপতি) ও অমাত্যদের তালিকায় আলাউদ্দীন জানীর নাম পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে শাহজাদা-ই-তুর্কীস্তান (তুর্কীস্তানের রাজপুত্র) বলা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আমরা "আলাউদ্দীন দৌলৎ শাহ বিন মৌদুদ"-এর যে মুদ্রাটির উল্লেখ করেছি, তার তারিখ ৬২৭ হিঃ না হয়ে ৬২৯ হিঃও হতে পারে বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। এই মতই সত্য হওয়া বেশি সম্ভব বলে আমরা মনে করি। তা যদি হয়, তা হলে আলাউদ্দীন জানীই এই মুদ্রাটি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন বলতে হবে। ডঃ আবদুল করিমও এই সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন। তিনি লিখেছেন, "আলা-উদ-দীন জানী ছিলেন তুর্কীস্তানের শাহজাদা, সুতরাং মুদ্রা প্রচলন করার শখ থাকা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া মুদ্রায় দওলত শাহ বিন মওদুদের প্রথম নাম আলা-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন, অর্থাৎ আলা-উদ-দীন যাহার সঙ্গে আলা-উদ-দীন জানীর নামের সম্পূর্ণ মিল আছে।"

এই সব বিষয় থেকে আমাদের মনে হয়, আলাউদ্দীন জানী ৬২৯ হিজরায় আলোচ্য মুদ্রাটি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন ; বিশ্বস্ত কর্মচারীর মত তিনি মুদ্রাটিতে তাঁর প্রভু ইলতুৎমিশের নামও লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।

৬২৮ হিজরায় আলাউদ্দীন জানী লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কত দিন তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তা যেমন জানা যায় না, তেমনি তাঁর শাসন-

কালের কোন ঘটনার কথাও আমরা জানি না। ৬৩৩ হিজরায় ইলতুৎমিশ পরলোকগমন করেন। তার অনেক আগেই সৈফুদ্দীন আইবক লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কবে এবং কী পরিস্থিতির মধ্যে লখনৌতিতে আলাউদ্দীন জানীর শাসন শেষ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। মীনহাজ ই-সিরাজ শুধুমাত্র লিখেছেন যে তিনি এই পদ থেকে "অপসারিত" হযেছিলেন। ৬৩৩-৩৪ হিজরায় তিনি দিল্লীর সুলতানের অধীনে লাহোরের শাসনকর্তাব পদে নিযুক্ত ছিলেন। এর থেকে মনে হয, তিনি দু' এক বছর লখনৌতির শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর অপসারিত হন।

সৈফুদ্দীন আইবক

আলাউদ্দীন জানী থেকে স্বরু করে একেবারে ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকী পর্যন্ত লখনৌতির শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে মীনহাজ-ই-সিবাজের বিবরণ ছাড়া ছাড়া। এঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, অন্যদের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন, কারও কাবও নাম উল্লেখই করেন নি। সৈফুদ্দীন আইবক সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে বিস্তৃত বিবরণ মেলে। নীচে তা উদ্ধৃত হল :

মালিক সৈফুদ্দীন আইবক ইউগানতৎ একজন খিতায়ী তুর্কী ছিলেন। বাইরে ও ভিতরে তিনি নানাবিধ পুরুষোচিত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন। মহান্ সুলতান (ইলতুৎমিশ) তাঁকে ইখতিয়ারদ্দীন চেস্ত কবাহ-এর উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে ক্রয় করেন এবং তাঁকে (সুলতানের) নৈকট্য দানের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য দান করে প্রথমে আমিব-ই-মজলিশ-এর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বেশ কিছু কাল ধরে প্রশংসনীযভাবে সে কার্য সম্পাদন করলে তাঁর পদোন্নতি করে, তাঁকে সরস্বতী রাজ্যের জায়গীর প্রদান করা হয়। তাঁকে এ সম্মান প্রদান করার সময় প্রত্যেক আমীর, মালিক ও অমাত্যদের প্রতি তাঁকে একটি করে অশ্ব প্রদান করার আদেশ দান করা হয়। এতে তাঁর শক্তি ও তাঁকে স্মরণীয় করার (দৃষ্টান্ত) প্রকাশিত হয়।

৬২৫ (হিজরী) সনে এ গ্রন্থকার যখন উচ্ ও মুলতানের দরবারে উপস্থিত হয় মালিক সৈফুদ্দীন আইবক (ইউগানতৎ) তখন সরস্বতী (রাজ্যের) শাসনকর্তা ছিলেন এবং সুলতানের কাছে তাঁর যথেষ্ট নৈকট্য ও প্রভাব ছিল।

কিছু কাল ধরে তিনি প্রশংসনীয় কার্য করলে তাঁকে বিহারের জায়গীর প্রদান করা হয়। আলাউদ্দীন জানীকে লখনৌতির জায়গীর থেকে অপসারিত করা হলে ঐ জায়গীর মালিক সৈফুদ্দীন আইবক ইউগানতৎকে প্রদান করা হয়। তিনি ঐ রাজ্যে 'অসীম বীরত্বে'র পরিচয় প্রদান করেন এবং বঙ্গ রাজ্য (পূর্ববঙ্গ) থেকে অনেক হস্তী অধিকার করে মহান সুলতানের খেদমতে প্রেরণ করেন। সুলতানের পক্ষ থেকে তাঁকে ইউগানতৎ উপাধি দেওয়া হয় এবং ঐ নামে তিনি গৌরব লাভ করেন।

বেশ কিছুকাল ধরে লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। (৬)৩১ (হিজরী) সনে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

তুগরল তুগান খান ও আওর খান

মীনহাজ-ই-সিরাজ স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে ৬৩১ হিজরায় সৈফুদ্দীন আইবকের মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় তুগরাল তুগান খান লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন ইলতুৎমিশ জীবিত। কিন্তু মীনহাজই আবার লিখেছেন যে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পরে "লখনৌতির জায়গীরদার" আইবক আওর খানের সঙ্গে তুগান খানের বিরোধ বাধে এবং বসনকোটের অধিকার নিয়ে দু'পক্ষে যুদ্ধ হয়; এ যুদ্ধে আওর খান নিহত হন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই মীনহাজের এই উক্তির বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আসলে উক্তিটির অর্থ পরিষ্কার। এর থেকে বোঝা যায় যে, ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর যাঁরা দিল্লীর শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন, তাঁরা তুগরল তুগান খানকে পদচ্যুত করে আইবক আওর খানকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। আওর খান লখনৌতিতে চলে আসেন। প্রথম দিকে তুগান খান তাঁকে বাধা দেন নি। হয়তো তিনি রাজধানী লখনৌতি ছেড়ে দিয়ে বসনকোটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অতঃপর আওর খান বসনকোট অধিকার করার চেষ্টা করেন; তুগান খান তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করেন।

এর অল্পকাল পরেই সুলতানা রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তুগান খান তাঁকে ভেট পাঠিয়ে লখনৌতির শাসনকর্তা হিসাবে নিজের অধিকার পাকা করে নেন।

তুগরল তুগান সম্বন্ধে মীনহাজ-ই-সিরাজ যা লিখেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত হল:

মালিক তুগান খান সুন্দর দেহাবয়ব ও পূত চরিত্র বিশিষ্ট তুর্কী ছিলেন। তিনি করখিতাহ্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। মনুষ্যত্ব ও সাহসিকতার নানাবিধ গুণাবলী দ্বারা তিনি ভূষিত এবং প্রশংসনীয় স্বভাব ও চিত্তাকর্ষক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। বদান্যতা, মনুষ্যত্ব, দয়া, বীরত্ব ও মানুষের মন জয় করার গুণে সে যুগে তিনি কারো কাছে দ্বিতীয় ছিলেন না।

প্রথমে সুলতান (ইলতুৎমিশ) যখন তাঁকে ক্রয় করেন তখন তাঁকে সাকী-ই খাস (ব্যক্তিগত মদ্য-পরিচাবক) পদে নিযুক্ত করেন। এ কাজে বেশ কিছু-কাল নিযুক্ত থাকার পর তাঁকে সর-ই দোয়াতদার (সুলতানের দোয়াত রক্ষাকারী দলের প্রধান)-এর কার্যে নিযুক্ত করা হয়। হঠাৎ (সুলতানের) ব্যক্তিগত রত্নখচিত দোযাত হারিয়ে যায়। (এতে) সুলতান তাঁকে প্রচুর তিরস্কার করেন। পরে তাঁকে একটি সম্মান-পরিচ্ছদ প্রদান করেন এবং চাশনীগীর রূপে নিয়োজিত করেন। এর বেশ কিছু কাল পরে তাঁকে আমীর-ই-আখোর (রাজকীয় অশ্বশালার প্রধান)-এর পদ দেওয়া হয়। অতঃপর (৬) ৩০ (হিজরী) সনে তিনি বদাউনের জায়গীরদার নিযুক্ত হন।

যে সময়ে (মালিক সৈফুদ্দীন) ইউগানতৎকে লখনৌতি রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয় সে সময়ে বিহার রাজ্যের (জায়গীর) তুগান খানকে প্রদান করা হয়। (৬৩১ হিজরী সনে) মালিক ইউগানতৎ আল্লাহর রহমতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে লখনৌতি রাজ্যের জায়গীরদাররূপে তুগান খান নিযুক্ত হন এবং সে রাজ্যে তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

মহান সুলতান (ইলতুৎমিশ) তাব্ সারাহ্-র মৃত্যুর পর লখনৌতির জায়গীরদার আইবক নাম ও আওর খান উপাধিধারী একজন অসমসাহসী তুর্কী ও তাঁর মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং লখনৌতির বসনকোট* শহর অধিকার নিয়ে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সে যুদ্ধের সময়ে তুগরল তুগান খান তাঁকে (আওর খানকে) এক মারাত্মক স্থানে তীর নিক্ষেপ করলে তিনি মৃত্যুমুখে

---

* এখানে "লখনৌতি" অর্থে লখনৌতি-রাজ্য অর্থাৎ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে সন্দেহ নেই। "লখনৌতি-অঞ্চল" বলতে অনেক সময়ে উত্তর বঙ্গকেও বোঝাত। পরবর্তী পাদটীকা থেকে দেখা যাবে, তুগান খান আওর খানকে উত্তর বঙ্গ ছেড়ে দিয়ে রাঢ় অঞ্চলে আশ্রয় নেন, সুতরাং বসনকোট নিঃসন্দেহে রাঢেই অবস্থিত ছিল।

পতিত হন এবং তুগরল তুগান খানের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি লখনৌতি রাজ্যের উভয় অংশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে রাল (রাঢ) নামে পরিচিত প্রথমটি ছিল লখনোর-এর অঞ্চলে অবস্থিত। দেবকোট অঞ্চলে অবস্থিত দ্বিতীয়টির নাম ছিল বরিন্দ (বরেন্দ্র) এবং এ অঞ্চল (এর আগে) বেশ কিছুকাল তাঁর অধিকারে ছিল না।*

সুলতান রাজিয়া রাজ্যের অধিকারিণী হলে তুগান খান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (আনুগত্যের দূত রূপে) মহান দরবারে প্রেরণ করেন এবং একটি রাজছত্র ও একটি লাল ঝাণ্ডা (তাঁকে প্রদান করা হয় এবং তাতে) তিনি বৈশিষ্ট্য লাভ করেন এবং প্রভুত সম্মানের অধিকারী হন। তিনি লখনৌতি থেকে তিরহুত রাজ্যে এক অভিযানে অগ্রসর হন এবং প্রচুর মূল্যবান দ্রব্যাদি অধিকার করেন।

সুলতান মুইজ্জুদ্দীন বাহরাম শাহ রাজসিংহাসনের অধিকারী হবার পর তুগান খান একইভাবে সম্মানিত হন এবং তিনিও মহান সুলতানের খেদমতে অনেক মূল্যবান (উপহারাদি) বরাবরই প্রেরণ করতে থাকেন। মুইজ্জী রাজত্বের অবসানে ও আলায়ী (আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ র) রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁর (তুগান খানের) গোপন মন্ত্রণাদাতা বাহাউদ্দীন হিলার সুরিয়ানী তাঁকে অযোধ্যা, করাহ্, মাণিকপুর ও অন্যান্য রাজ্য অধিকার করতে প্ররোচিত করেন। ৬৪০ (হিজরী) সনে এ গ্রন্থকার যখন রাজধানী দিল্লী থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিসহ লখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হয়ে অযোধ্যা পৌঁছোয়, সে সময়ে তুগান খান করাহ্ ও মাণিকপুর রাজ্যে এসে উপস্থিত হন। গ্রন্থকার অযোধ্যা থেকে (অগ্রসর হয়ে) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। এবং তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুকাল সময় সেই অঞ্চলে সে অতিবাহিত করে। অতঃপর তিনি লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রন্থকার তাঁর সঙ্গে একত্র হয়।

৬৪১ (হিজরী) সনে জাজনগরের রায়** লখনৌতি রাজ্যে আঘাত হানতে

---

* এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তুগান খান আওর খানকে লখনৌতি অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে, রাঢ় অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

** এই "জাজনগরের রায়" অর্থাৎ উড়িষ্যারাজ নিঃসন্দেহে রাজা নরসিংহদেব (১ম), যিনি ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুরু করেন। ৬৪১ সনের শওয়াল মাসে তুগান খান জাজনগর অভিমুখে অগ্রসর হন এবং এ গ্রন্থকার এই ধর্মযুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হয়। ৬৪১ (হিজরী) সনের জিলকদ মাসের ৬ তারিখ শনিবার দিন জাজনগরের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত কাতাসীনে* উপস্থিত হবার পর সৈন্যদল অশ্বে আরোহণ করে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বীর মুসলিম সেনানীরা দুটি পরিখা অতিক্রম করে এবং হিন্দুগণ পলায়নপর হয়। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে যতদূর দেখা গেল (শত্রুদের) হস্তীগুলির ঘাস ছাড়া মুসলিম সৈন্যদের হস্তে আর কিছুই পড়ে নি। অধিকন্তু তুগান খানের আদেশ ছিল যে হস্তীগুলির উপর কেউ যেন কোন আঘাত না হানে। এ (সব) কারণে যুদ্ধের সুতীব্র অগ্নি প্রশমিত হল।

মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলার পর মুসলিম বাহিনীর পদাতিক সৈন্যগণ প্রত্যেকেই আহারের জন্য (শিবিরে ?) প্রত্যাবর্তন করে। হিন্দুগণ অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে পাঁচটি হস্তী অধিকার করে এবং আনুমানিক ২০০ পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎ দিকে এসে উপস্থিত হয়। মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় এবং বহু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য শাহাদৎ বরণ করে। তুগান খান উদ্দেশ্য সাধন না করেই ঐ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে লখনৌতি ফিরে আসেন। সাহায্যের জন্য শরফ-উল-মুলক আশ 'আরীকে সুলতান আলায়ীর দরবারে প্রেরণ করেন।

শরফ-উল-মুলকের সঙ্গে কাজী জলালুদ্দীন কাশানী—(তাঁর উপর আল্লাহর রহমত হোক)—কে বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ, একটি লালবর্ণ রাজছত্র, বহুবিধ সম্মান ও শ্রদ্ধার (বাণীসহ) রাজধানী থেকে প্রেরণ করা হয়। জাজনগরের বিধর্মীদের দমন করার উদ্দেশ্যে মহামহিম সুলতানের আদেশে হিন্দুস্তানের সৈন্য-বাহিনীকে আয়োদার (অযোধ্যার) জায়গীরদার কমরুদ্দীন তমোর খান কিরান-এর অধীনে লখনৌতি অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।

বিগত বৎসরে (মুসলিম বাহিনী কর্তৃক) কাতাসীন লুণ্ঠনের—যে সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে একই বৎসর (৬৪২

* ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই কাতাসিন বা কটাসিন হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার কাথা-সাঙ্গা। কিন্তু তুগরল তুগান খান কি সুদূর ও দুর্গম বাঁকুড়া অঞ্চলে যেতে পেরেছিলেন ? 'কাতাসিন'-এর অবস্থিতি অনিশ্চিত রয়ে গেল।

হিজরী সনে) জাজনগরের রায় লখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন। ৬৪২ (হিজরী) সনের শওয়াল মাসের ১৩ তারিখ মঙ্গলবার দিন বহু সংখ্যক হস্তী, পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ জাজনগরের বিধর্মিগণ লখনৌতি বরাবর পৌঁছোয়। মালিক তুগান খান সম্মুখীন হবার জন্য (লখনৌতি) নগর থেকে বের হয়ে আসেন। বিধর্মীদের দল জাজনগরের সীমান্ত অতিক্রম করে লখনোর অধিকার করে, লখনোরের জায়গীরদার ফখর-উল-মুল্‌ক্ করিম উদ-দীন লাগারীকে বহু সংখ্যক মুসলমানসহ হত্যা করে। এর পরে তারা লখনৌতি নগরের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে উচ্চাঞ্চল থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন সংবাদবাহকগণ এসে পৌঁছোল এবং মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ দিল যে তারা (অতি) নিকটে পৌঁছেছে। বিধর্মী সৈন্যদলে ত্রাসের সঞ্চার হলে তারা প্রত্যাবর্তন করল।

উঁচু অঞ্চলের সৈন্যদল লখনৌতির পাহাড়ে (রাজমহল ?) উপস্থিত হলে মালিক তুগান খান ও মালিক তমোর খানের মধ্যে বিরোধ* দেখা দিল এবং (তার ফলে) সংঘর্ষ বাধল। লখনৌতি নগরের সম্মুখে দুই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রাতঃকাল থেকে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। একদল লোক তাদের নিকট (আপোষমূলক) কথাবার্তা বললে দুই দল (সৈনিক) একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং প্রত্যেক দল তাদের শিবিরে ফিরে গেল। যেহেতু তুগান খানের আস্তানা নগর-দ্বারে ছিল, তিনি সে সময়ে তাঁর শিবিরে ফিরে এলেন। সে সময়ে তাঁর সমুদয় সৈন্য নগরের ভিতর তাদের নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে গেল এবং তিনি একা হয়ে পড়লেন। তমোর খান আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেও আগের মতই (অস্ত্রশস্ত্রে) সজ্জিত হয়েই রইলেন ; সুযোগ বুঝে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আপন শিবিরে তুগান খান একাকী আছেন জেনে তমোর খান তাঁর সমুদয় বাহিনী নিয়ে অশ্বারোহণে তুগান খানের দিকে ধাবিত হলেন। প্রয়োজনের খাতিরে তুগান খান অশ্বে আরোহণ করে পালিয়ে গেলেন এবং নগরে এসে উপস্থিত হলেন। ৬৩২ (হিজরী) সনের জিলকদ মাসের ৫ তারিখ মঙ্গলবার দিন এ ঘটনা ঘটে।

---

* তমোর খান ইতিপূর্বে তুগান খানের অধস্তন কর্মচারী ছিলেন। তুগান যখন "আমীর-ই-আখোর" ছিলেন, তমোর ছিলেন তাঁর "নায়েব" অর্থাৎ সহকারী। তখন থেকেই তাঁদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়।

নগরে পৌঁছে তুগান খান রাজ্যের ভৃত্য মীনহাজ-ই-সিরাজকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত করেন ও আপোষ মীমাংসা ও নিরাপত্তার (প্রস্তাব দিয়ে) নগরের বাইরে প্রেরণ করেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও নিরাপত্তা বিধান স্থিরীকৃত হয় এই শর্তে যে, লখনৌতি তমোর খানকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তুগান খান স্বীয় ধন-সম্পদ, হস্তীসমূহ, অনুচরবর্গ ও আপনজন সহ শাহী দরবারে (দিল্লী-দরবারে) চলে যাবেন। এ শর্তে লখনৌতি মালিক তমোর খানকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং মালিক তুগান খান মালিক করাকশ, মালিক তাজুদ্দীন সন্‌জর্ মাহ্-পেশানী ও রাজধানীর অন্যান্য আমীর সহ শাহী দরবারে এসে পৌঁছোলেন। এই গ্রন্থকার তার পরিবার পরিজন সহ তাঁর (তুগান খানের) সঙ্গে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ৬৪৩ (হিজরী) সনের সফর মাসের ১৪ তারিখ সোমবার দিন শাহী দরবারে এসে পৌঁছোয়।

মালিক তুগান খান রাজধানীতে পৌঁছোলে বিস্তর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করা হয় এবং একই বৎসরের রবি-উল-আউয়াল মাসে তাঁকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয়; তিনি (সুলতানের) বিস্তর স্নেহাশিস লাভ করেন। রাজসিংহাসন মহান সুলতান নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন-এর জ্যোতিতে গৌরব লাভ করলে তিনি (তুগান খান) ৬৪৪ (হিজরী) সনে অযোধ্যায় গমন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এক শুক্রবার রাত্রে আল্লাহর রহমতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। অদৃষ্টের পরিহাসে (বিধানে) এমন ঘটেছিল যে, মালিক তুগান খান ও তমোর খানের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ বশত তাঁরা একে অন্যের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তাঁদের দু'জনের মৃত্যু একই রাত্রিতে ঘটেছিল—একজনের রাতের প্রথমভাগে এবং দ্বিতীয়জনের রাতের শেষভাগে।

এ বিষয়ে সৈয়দ-উল আকাবর ওয়াল আসাগর শরফুদ্দীন বলখী একটি কবিতা রচনা করেন :

কবিতা

শওয়াল মাসের শেষ শুক্রবার দিনে,
আরবী তারিখ মতে অক্ষরগুলি, 'খা', 'মিম' ও 'দাল'।
পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তমোর খান ও তুগান খান,
এ (জন) রাতের প্রথম ভাগে আর ঐ [জন] রাতের শেষ ভাগে।

তমোর খান লখনৌতিতে প্রাণত্যাগ করেন এবং তুগান খান অযোধ্যায়। এবং তা এমনভাবে ঘটেছিল যে, তাঁরা একে অন্যের পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সংবাদ পাননি।

তুগরল তুগান খানের চরিত্র বেশ জটিল। তিনি দিল্লীর প্রতি আনুগত্যের ভান করতেন এবং দিল্লীতে উপঢৌকন পাঠাতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার স্বাধীন হবার এবং দিল্লীর অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলি জয় করবার স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নের বশবর্তী হয়েই তিনি করাহ্ ও মাণিকপুরে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু গতিক সুবিধার নয় বুঝে প্রত্যাবর্তন করেন। আবার উড়িষ্যারাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নির্লজ্জের মত দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তুগান খান সামরিক দিক্ থেকেও চূড়ান্ত ব্যর্থতা বরণ করেছেন। উড়িষ্যারাজ ও তমোর খানের কাছে তাঁর পরাজয় যেমন তাঁর রণনৈপুণ্যের অভাবের পরিচয় দেয়, তেমনি বুদ্ধির অভাবের নিদর্শনও বহন করে। উড়িষ্যারাজ মাত্র আড়াইশো সৈন্য নিয়ে তুগান খানের বিপুল সংখ্যক বাহিনীকে পরাজিত করলেন—এ বিষয়টিকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছেন। কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ নেই—কারণ এই ঘটনার বর্ণনা যিনি দিয়েছেন, সেই মীনহাজ স্বচক্ষেই এটি দেখেছেন, উড়িষ্যার সৈন্যদের আক্রমণের সময়ে তুগান খানের সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে খাওয়া-দাওয়া করতে ব্যস্ত ছিল, তাই আড়াইশো সৈন্যের আক্রমণে তাদের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

যাই হোক, তুগান খানের চরিত্রের ত্রুটি কিন্তু তমোর খান এবং দিল্লীর রাজশক্তির অপরাধ এতটুকুও লাঘব করে না। তমোর খান তাঁর স্বধর্মী এবং সতীর্থের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং দিল্লী-কর্তৃপক্ষ যেভাবে তার প্রতিকারে অক্ষম হয়েছেন—তা ক্ষমার অযোগ্য।

তুগরল তুগান খানের ৬৪০ হিজরার মহরম মাসে (জুলাই, ১২৪২ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি বিহার শরীফের বড় দরগায় পাওয়া গিয়েছে। তাতে তুগান খান "নিজেকে আল-সুলতানী বা গবর্নর রূপে ঘোষণা করিলেও 'গিয়াস-উল-ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন' (ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী) এবং 'মুগীস-উস মুলুকে ওয়াল-সলাতীন' (রাজা ও সুলতানদের সাহায্যকারী) উপাধি হইতে মনে হয় তিনি বেশ উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতেন।" (বা. ই. সু. আ., পৃঃ ১১৭)।

যাই হোক্, তুগান খানের রাজনৈতিক জীবন চূড়ান্ত ব্যর্থতার এক দৃষ্টান্ত। উড়িষ্যার রাজার হাতে তাঁর পরাজয় বাংলায় মুসলিম রাজত্বের বিস্তারের পক্ষেও সাময়িক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। সমসাময়িক উড়িষ্যারাজ এবং তুগান খানের বিজেতা প্রথম নরসিংহদেবের কেন্দুয়া পাটনা তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল গঙ্গা বা পদ্মা নদী এবং সমগ্র রাঢ়ই তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল (HB II, p. 51)। পূর্ববর্তী শাসকরা বাংলার যে সব অঞ্চলে মুসলিম রাজত্বের বিস্তার করেন, তার অনেকখানিই তুগান খানের গাফিলতির ফলে মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। পরে মুগীসুদ্দীন ইউজবক শাহ তা পুনরুদ্ধার করেন।

তমোর খান

বিশ্বাসঘাতকতা করে লখনৌতির শাসনকর্তা হবার পরে তমোর খান আরও দু'বছর জীবিত ও ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে মীনহাজ-ই সিরাজ লিখেছেন :

"তিনি দুই বৎসরকাল লখনৌতি অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করার মধ্যে অতিবাহিত করেন ও আল্লাহ্‌র রহমতে ইহলোক ত্যাগ করেন। একই রাত্রিতে তুগান খান(ও) পরলোকগমন করেন। যেহেতু (মালিক সৈফুদ্দীন আইবক) ইউগানতেতের কন্যা তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন, তিনি সুন্দরভাবে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করেন এবং তাঁর দেহ লখনৌতি থেকে অযোধ্যায় এনে সেখানে সমাহিত করেন।"

এর থেকে বোঝা যায়, তমোর খানের লখনৌতি শাসনের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।

এখানে আর একটা সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, তমোর খান লখনৌতি রাজ্যের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা সৈফুদ্দীন আইবকের জামাতা। সম্ভবত এই কারণে তমোর খান লখনৌতি-রাজ্যের উপরে তাঁর বিশেষ দাবী আছে মনে করতেন।

জলালুদ্দীন মাসুদ জানী

তমোর খানের মৃত্যুর পরে কে বাংলার শাসনকর্তা হন, সে সম্বন্ধে মীনহাজ কিছু লেখেন নি। তবে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের (ইলতুৎমিশের কনিষ্ঠ

পুত্র) অধীনস্থ শাসনকর্তা জলালুদ্দীন মাস্থদ জানীর উৎকীর্ণ ৬৪৭ হিঃর এক শিলালিপি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে মিলেছে। স্থতরাং তমোর খানের মৃত্যুর পরেই তিনি এ রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন বলে মনে হয়, কতদিন এ দেশ শাসন করেন তা বলা কঠিন—তবে চার বছরের বেশি নয়।

এই জলালুদ্দীন মাস্থদ জানী আলাউদ্দীন জানীর পুত্র। তাঁর শিলালিপিতে উল্লিখিত "মালিক-উস-শর্ক" (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) এবং "শাহ" তাঁর উচ্চাভিলাষ এবং প্রায-স্বাধীন মর্যাদার পবিচায়ক। পরে মাস্থদ জানী অযোধ্যার শাসনকর্তা হন এবং নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের প্রধান মন্ত্রী উলুগ খান বা বলবনেব বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র ও তাঁর সামযিক উচ্ছেদে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কবেন।

ইখতিয়াবদ্দীন ইউজবক তুগবল খান বা মুগীস্থদ্দীন ইউজবক শাহ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলার মুসলিম শাসনকতাদেব মধ্যে ইউজবক তুগরল খান বা মুগীস্থদ্দীন ইউজবক শাহের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি "বিদ্রোহী ছিলেন সত্য, কিন্তু সাহসে, বীরত্বে, সমর কুশলতায তাঁহার তুলনা হয় না।" (বা. ই. স্থ. আ., পৃ. ১২৪)

মীনহাজ ই-সিরাজ তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন :

মালিক ইখতিযারুদ্দীন ইউজবক (তুগরল খান) আদিতে কিফচাক (বা কিবচাক)-এর অধিবাসী স্থলতান শামস্থদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন। গোয়ালিয়র অবরোধের সময তিনি (স্থলতানের) নায়েব চাশনীগীর ছিলেন। রাজ্যের সিংহাসন স্থলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজ শাহের অধিকারে এলে (তাঁর রাজত্বকালে তিনি নায়েক ই-খাস্ পদে নিযুক্ত হন ও) (পরে) আমীর ই-মজলিস-এর পদ তাঁকে প্রদান করা হয এবং (স্থলতানের নিকট) অতিশয় সান্নিধ্য লাভের কারণে তিনি বৈশিষ্ট্য লাভ করেন।

তরাইনের সমভূমিতে স্থলতানের (তুর্কী) ক্রীতদাসগণ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অমাত্যদের একদল যথা, তাজ-উল-মুল্‌ক্ (মুহম্মদ), বাহা-উল্ মুল্‌ক্, করিমুদ্দীন জাহিদ ও নিজামুদ্দীন সফরকানীকে হত্যা করা হয় তখন সেই বিদ্রোহী দলের একজন নেতা ছিলেন এই মালিক ইউজবক।

রাজসিংহাসন সুলতানা রাজিয়ার অধিকারে গেলে তাঁকে আমীর-ই-আখোর পদে নিযুক্ত করা হয়। সুলতান মুইজ্জুদ্দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে মালিক ও অমাত্যদের এক দল যখন দিল্লী অবরোধ করেন, মালিক করাকশ খানের সঙ্গে মালিক ইউজবকও ৬৩৯ (হিজরী) সনের শাবান মাসের শেষ তারিখ মঙ্গলবার দিন সুলতানের খেদমতে (দিল্লী) নগরে উপস্থিত হন এবং প্রশংসনীয় কার্য দ্বারা কয়েকবার সুলতানের খেদমত করেন। মিহ্‌তর-ই-মুবারক শাহ ফররোখী সুলতান মুইজ্জুদ্দীনের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে তুর্কী মালিক ও আমীরগণ রাজধানী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তিনি সুলতানকে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যে, (সুলতান) ৬৩৯ (হিজরী) সনের পবিত্র রমজান মাসের ৯ তারিখ বুধবার দিন মালিক করাকশের সঙ্গে মালিক ইউজবককে বন্দী ও কারারুদ্ধ করেন।

নগর মুক্ত হলে ৬৩৯ (হিজরী) সনের জিলকদ মাসের ৮ তারিখ মঙ্গলবার দিন মালিক ইউজবক কারামুক্ত হন। সুলতান আলাউদ্দীন (মাসুদ শাহ্‌) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে তিনি তবরহিন্দাহ্‌-র জায়গীর প্রাপ্ত হন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য তিনি লাহোরের জায়গীরদার নিযুক্ত হন। (তিনি সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং) সেখানে মালিক নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ বিনদার-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে এবং এর পরে তিনি রাজধানীর (সুলতানের) সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ করেন। কারণ, তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা নিহিত ছিল। অতঃপর উলুগ খান-ই-মোয়াজ্জম (বলবন) তাঁকে হঠাৎ রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং তিনি সমাদর লাভ করেন। উলুগ খান-ই মোয়াজ্জম মহামহিম সুলতানের দরবারে বিবেচনার জন্য আবেদন করলে ইউজবককে রাজকীয় সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হয় এবং তাঁর বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করা হয়। এর কিছুকাল পরে তাঁকে কনৌজের জায়গীর প্রদান করা হয় এবং তিনি আবার বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। মালিক কুৎবুদ্দীন হোসেন তার সারাহ-কে একদল সৈন্যসহ (তাঁর বিরুদ্ধে) প্রেরণ করা হলে তিনি তাঁকে সুলতানের বাধ্য করেন এবং সুলতানের খেদমতে ফিরিয়ে আনেন।

কিছুকাল পরে অযোধ্যার (শাসনভার) তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। (সেখান থেকে) রাজধানীতে পুনরায় ফিরে এলে লখনৌতি রাজ্যের শাসনভার

তাঁকে প্রদান করা হয়। সেখানে যাওয়ার পর তিনি সে রাজ্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। জাজনগরের রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংঘাত ঘটে। জাজনগরের সেনাপতি ছিলেন এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন (জাজনগরের) রায়ের জামাতা। তাঁর নাম সাবনতর*—এ রায় (সাবনতর) তুগরল তুগানের সময়ে লখনৌতি নদীর (গঙ্গা) তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে লখনৌতির দ্বার পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিলেন।

অতীতের মানদণ্ডে বিচার করে (বলা যায় যে) মালিক তুগরল ইউজবকের সময়ে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন এবং যুদ্ধ করে পরাজিত হন। জাজনগরের রায়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মত মালিক ইউজবকের সংঘাত ঘটে এবং ইউজবক বিজয় লাভ করেন। তৃতীয়বারের যুদ্ধে ইউজবকের পরাজয় ঘটে। একটি শ্বেত হস্তী—যেটির চেয়ে মূল্যবান আর কোন (হস্তী) সে অঞ্চলে ছিল না, সেটি মত্ত হয়ে পড়ে—তুগরলের হস্তচ্যুত হয়ে জাজনগরের বিধর্মীদের হস্তে পতিত হয়।

পরবৎসর মালিক ইউজবক (দিল্লী থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে) লখনৌতি থেকে উমরদন (বা আরমূদন) রাজ্য পর্যন্ত সৈন্যসহ অগ্রসর হয়ে অতর্কিতে রায়কে আক্রমণ করেন এবং রায়ের রাজধানী উমরদন (বা আরমূদন) নামক স্থানে উপস্থিত হন। রায় সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং রায়ের সমুদয় সম্পত্তি, পরিবারবর্গ (আত্মীয়স্বজন) ও হস্তী মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করে (আবার) তিনি সুলতানের সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ করেন। লাল, সাদা ও কাল এ তিনটি রাজছত্র তিনি ধারণ করেন।

(এর পরে) লখনৌতি থেকে সসৈন্যে আয়োদাহ্ (অযোধ্যা) অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আয়োদাহ্ নগরে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে তাঁর নামে খুৎবা প্রচলন করেন এবং সুলতান মুগীসুদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। দু'সপ্তাহ পরে আয়োদাহ্ (অঞ্চলে) অবস্থিত সুলতানের সৈন্যদলের মধ্য থেকে তুর্কী আমীরদের একজন হঠাৎ আয়োদাহ্-তে আগমন করে প্রচার করে দিলেন যে বাদশাহী সৈন্য এসে পৌঁছে গেছে। মালিক (ইউজবক) বিহ্বল হয়ে নৌকায় চড়ে বসেন এবং লখনৌতিতে প্রত্যাগমন করেন। মালিক ইউজবকের এ

* 'সাবনতর'=সামন্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উড়িষ্যার রাজার জামাতা তাঁর সামন্তও ছিলেন, এই তথ্যই এখানে পাওয়া যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

বিরোধিতা, স্বীয় সুলতানের প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ধর্মযাজক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত হিন্দুস্তানের মুসলমান ও হিন্দু সমুদয় অধিবাসী কর্তৃক অসমর্থিত হয়। ফলে তিনি এ সমস্ত অশুভ কার্যের ফল ভোগ করেন এবং তিনি মূল ও ভিত্তিচ্যুত হন। আয়োদাহ্ থেকে লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কামরূদ অভিযানের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বেগমতী (বা বাঁকমতী) নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণ করেন। কামরূদের রায়ের প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না বলে তিনি একদিকে পালিয়ে যান। মালিক ইউজবক কর্তৃক কামরূদ নগর অধিকৃত হয় এবং এত অসংখ্য দ্রব্য ও অর্থ তাঁর হস্তগত হয় যে, তার সংখ্যা বা পরিমাণ ভাষায় ও বর্ণনায় ব্যক্ত করা যায় না।

এ গ্রন্থকারের লখনৌতি অবস্থানকালে বিশ্বাসস্থাপনের যোগ্য ভ্রমণকারিগণের নিকট থেকে গ্রন্থকার অবগত হয় যে, আজমের বাদশাহ গবশ-ই-আসপ (বা গোশতাসিব)-এর রাজত্বের সময় থেকে—যখন তিনি চীনে অভিযান করেন এবং এই (কামরূদের) পথে হিন্দুস্তানে আগমন করেন—এ সময় পর্যন্ত যে বারশত সিলমোহর করা ধনের পাত্র ছিল—এবং যেগুলির মধ্যে একটিও ঐ সমস্ত রায়ের কারো অধিকারে আসেনি—সেই সমস্ত (ধনভাণ্ডার) মুসলিম-বাহিনীর হস্তগত হয়। কামরূদে খুৎবা প্রচলন করা ও জুম্মার নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং মুসলমানের চালচলন সেখানে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পাগলামির বশে যখন তিনি সব কিছুই বাতাসে উড়িয়ে দিলেন তখন এসব কিছুর মূল্য ছিল কি? কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, মাত্রাধিক কাজ করার প্রচেষ্টা কোনদিনই অনুসন্ধানকারীর ভাগ্যকে প্রসন্ন করেনি।

কবিতা

সে সম্পদই উত্তম যার পতন ও উত্থান আছে
(কারণ) সম্পদ অতি শীঘ্রই আবার গজিয়ে উঠবে।

এ রকম বর্ণনা আছে যে কামরূদ অধিকৃত হবার পর (কামরূদের) রায় কয়েকবার তাঁর বিশ্বস্ত দূতগণের মাধ্যমে এ মর্মে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, "এ রাজ্য আপনার অধিকারে এসেছে এবং এর আগে কোন মুসলমান এ বিজয় লাভে সমর্থ হননি। আপনি এখন প্রত্যাবর্তন করুন এবং আমাকে সিংহাসনে (পুনঃ)

প্রতিষ্ঠিত করুন। আমি প্রতি বছর আপনাকে এত বস্তা স্বর্ণমুদ্রা ও এত সংখ্যক হস্তী (কর হিসাবে) প্রেরণ করব এবং মুসলমানী খুৎবা ও মুদ্রা যা প্রচলিত হয়েছে তা বজায় রাখব।"

কোন মতেই মালিক ইউজবক এ প্রস্তাবে সম্মত হন নি। রায় তাঁর সমুদয় অনুচর প্রজাকে ইউজবকের নিকট যেতে ও তাঁর আদেশ মেনে চলতে নির্দেশ দেন এবং (সেই সঙ্গে) যে কোন মূল্যে সমুদয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে আদেশ দেন, যাতে মুসলিম বাহিনীর কোন খাদ্যদ্রব্য না থাকে। তারা তা'ই করে এবং যত খাদ্যদ্রব্য ছিল, অতি উচ্চ মূল্যে তা তারা ক্রয় করে। রাজ্যের কৃষির অবস্থা ও বসতির উপর নির্ভর করে ইউজবক কোন শস্য ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখেন নি। বসন্তকালের ফসল কাটার সময় এলে, রায় তাঁর সমুদয় প্রজাসহ বিদ্রোহী হয়ে জলের সমস্ত বাঁধ কেটে দেন এবং ইউজবক ও তাঁর সমুদয় মুসলিম বাহিনীকে অসহায় অবস্থায় ফেলেন। খাদ্যের অভাবে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। তারা সকলে মিলে একে অন্যের সঙ্গে (এ মর্মে) পরামর্শ করে, 'যে কোন উপায়ে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। নতুবা উপবাসে আমরা প্রাণ হারাব'।

লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করার উদ্দেশে তারা কামরূদ থেকে যাত্রা করে। সমতলভূমির পথ জলের নীচে এবং হিন্দুদের অধিকারে ছিল। পাহাড়ী* অঞ্চল দিয়ে ঐ রাজ্য থেকে তাদের বাইরে আনয়ন করার জন্য পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করা হয়। কয়েকটি স্থান অতিক্রম করার পর তারা কঠিন পাহাড়ী ও সংকীর্ণ পথের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ (উভয়) দিক হিন্দুগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। দুই পক্ষের সারিবদ্ধ সৈন্যের সম্মুখে এক সংকীর্ণ স্থানে দুই হস্তীর দল একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (দুই) সৈন্যদল একে অন্যের উপর আক্রমণ করে। হিন্দুগণ চারদিক থেকে এসে উপস্থিত হয় এবং মুসলিম ও হিন্দু সৈন্য মিশ্রিত হয়ে পড়ে। (এমন সময়) হঠাৎ একটি তীর এসে হস্তিপৃষ্ঠে সমাসীন মালিক ইউজবকের বক্ষদেশে আঘাত করলে তিনি (মাটিতে) পড়ে যান এবং বন্দী হন। তাঁর সন্তানগণ, পরিবার-পরিজন, অনুচরবর্গ ও সমুদয় সৈন্যবাহিনীকে বন্দী করা হয়।

---

* এই পাহাড়ী অঞ্চলের অধিকাংশই এখন ভুটানের অন্তর্গত।

তাঁকে রায়ের সম্মুখে আনয়ন করা হলে তিনি তাঁর পুত্রকে তাঁর কাছে আনার জন্য অনুরোধ করেন। তারা যখন তাঁর পুত্রকে কাছে আনল তখন তিনি তাঁর মুখ পুত্রের মুখের উপর রাখলেনএবং তাঁর আত্মাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করলেন।

এই বিবরণ খুবই সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট। ইউজবক শাহ বীর ছিলেন, তা এই বিবরণ থেকেই জানা যায়। কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন, দিল্লীর রাজশক্তি তাঁর বিদ্রোহ বারবার মার্জনা করা সত্ত্বেও তিনি আবার বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি নির্বোধও ছিলেন, তাই কামরূপের রাজার ফাঁদে ধরা পড়েছিলেন।

ইউজবক শাহ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। যেমন তিনি কবে বাংলার শাসনভার প্রাপ্ত হন, কখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কত দিন লখনৌতি রাজ্য শাসন করেন? তমোব খান ৬৪৪ হিঃর শওয়াল মাসে মারা যান, ৬৪৭ হিঃর মহরম মাসে জলালুদ্দীন মাসুদ জানীর শাসক হিসাবে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, ৬৫৩ হিঃতে ইউজবক শাহেব স্বাধীন সুলতান হিসাবে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় এবং ৬৫৬ হিঃব জিল্কদ মাসে জলালুদ্দীন মাসুদ জানী দ্বিতীয়বার লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন; সুতরাং ইউজবকের শাসন ৬৪৭ হিঃর আগে সুরু হয় নি এবং ৬৫৬ হিঃর পরে চলে নি। ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো (এবং তাঁকে অনুসরণ করে ডঃ আবদুল করিম) স্থির করেছেন যে তমোর খানের মৃত্যুর পর ৬৪৪-৬৪৮ হিঃ—এই চার বছর জলালুদ্দীন মাসুদ জানী রাজত্ব করেন (যদিও তাঁর রাজত্বকালের কোন ঘটনার কথা জানা যায় না) এবং ইউজবক ৬৪৮-৬৫০ হিঃ দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে এবং ৬৫০-৬৫২ হিঃ স্বাধীন সুলতান হিসাবে রাজত্ব করেন (যদিও তাঁর শাসনকাল ঘটনাবহুল)। পক্ষান্তরে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র অনুবাদক যাকারিয়া সাহের বলেন, "ইউজবক চারবার জাজনগরের রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এদেশে শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে কোন যুদ্ধাভিযানে যাওয়া সেকালে সম্ভবপর ছিল না। সেক্ষেত্রে এ যুদ্ধে তিনি চার বছর ব্যয় করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। এর পরে তিনি অযোধ্যাতে অভিযান চালান। তাতে এক বছর সময় লাগার কথা। এর পরে তিনি কামরূপে অভিযান চালান। তাতেও এক বছর সময় লেগেছিল বলে ধরা যেতে পারে। এতে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র যুদ্ধেই তাঁর প্রায় ছয় বছর সময় লেগেছিল।...(তাঁর শাসনকাল) ৭ বছরের কম হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।"

এই মত যুক্তিযুক্ত। স্বাধীন সুলতান হিসাবে ইউজবকের ৬৫৩ হিঃর মুদ্রার কথাই আগে জানা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ৬৫২ ও ৬৫৫ হিঃর মুদ্রাও পাওয়া গেছে (Numismatic Digest, June 1981, Pt. I, p. 40-44 এবং Indian Museum Catalogue, p. 146, no. 6)। অতএব ইউজবক অন্ততঃ ৬৪৮ থেকে ৬৫২ হিঃ পর্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে এবং অন্ততঃ ৬৫২ থেকে ৬৫৫ হিঃ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতান হিসাবে রাজত্ব করেন বলে স্থির করা যায়।

ইউজবক শাহের মৃত্যু যে ৬৫৫ হিজরাতেই ঘটেছিল, তার প্রমাণ আছে। আমরা আগেই বলেছি যে ৬৫৫ হিজরায় উৎকীর্ণ ইউজবকের স্বাধীন সুলতান হিসাবে জারী করা মুদ্রা পাওয়া গেছে। এদিকে ৬৫৫ হিজরাতেই আবার লখনৌতি-টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের মুদ্রা মিলছে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ- ৬৩-৬৪)। সুতরাং ইউজবক ৬৫৫ হিজরাতেই পরলোকগমন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবার দিল্লীর অধীনে আসে। কিন্তু কে দিল্লীর পক্ষ থেকে প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তা বলা যায় না।

জাজনগরের রায় বা উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ইউজবক দু'বার জয়ী এবং একবার পরাজিত হবার পর "উমর্দন" রাজ্য জয় করেন। তাঁর "উমর্দনের রাজস্ব থেকে প্রস্তুত" মুদ্রা পাওয়া গেছে, সম্প্রতি ঐ জায়গার টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রাও মিলেছে (Numismatic Digest, June 1981, Pt. I, pp. 40-44 দ্রঃ)। প্রশ্ন এই যে, এই "উমর্দন" (এ ছাড়া 'উর্মর্দন', 'উর্জমর্দন', 'অজমর্দন', 'অর্মর্দন'—নানা-ভাবে পড়া হয়েছে) কোথায় অবস্থিত ছিল। দু'টি বিষয় নিশ্চিত বলে মনে হয়।

(১) স্থানটি উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ মীনহাজ লিখেছেন যে "জাজনগরের রায়ে"-র সঙ্গে তৃতীয় যুদ্ধে হারার পরে ইউজবক দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা করে, পরবৎসর "রায়"কে আক্রমণ করে "উমর্দন" জয় করেন।

(২) ইতিপূর্বে তুগরল তুগান খানের কাছ থেকে উড়িষ্যারাজ রাঢ়ের যে অংশ জয় করেন, "উমর্দন" তারই অন্তর্ভুক্ত ছিল ; একে যে "রাজধানী" বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, রাঢ়ের অধিকৃত অঞ্চলগুলি নিয়ে উড়িষ্যারাজ একটি প্রদেশ গঠন করেছিলেন এবং "উমর্দন" তার সদর দপ্তর ছিল।

ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে এই উমর্দন চুঁচুড়ার কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত "মাদারন"-এর সঙ্গে অভিন্ন। এই অঞ্চলে "মাদারন" বলে কোন স্থান আছে বলে আমার জানা নেই। ডঃ আবদুল করিমের (ও আরও অনেকের) মতে বিখ্যাত "মান্দারণ"-ই (একে "মাদারন"ও বলা হয়) হচ্ছে এই 'উমর্দন'। কিন্তু মান্দারণ চুঁচুড়া থেকে বহু দূরে—হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে, রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরের সন্নিকটে অবহিত। এই অঞ্চল প্রাচীনকালে দুরধিগম্য ছিল, এখানে যেতে বহু খরস্রোতা নদী পার হতে হত, বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকেও কলকাতা থেকে মান্দারণ যাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। ইউজবকের "জাজনগরের রায়ের" বিরুদ্ধে অভিযান করার সময়ে লখনৌতি রাজ্য গঙ্গা বা পদ্মা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল না। সুতরাং তিনি উক্ত রায়ের সঙ্গে তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে চতুর্থ যুদ্ধে একেবারে সুদূর মান্দারণ অবধি জয় করলেন, এ কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়; সাতগাঁও, ত্রিবেণী প্রভৃতি নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিও তখন পর্যন্ত (চতুর্দশ শতকের শেষ দশকের আগে পর্যন্ত) মুসলমানরা জয় করতে পারে নি, আর ইউজবক এক লাফে মান্দারণ অবধি জয় করে নিলেন? অতএব এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে "উমর্দন" গঙ্গা বা পদ্মা নদী থেকে অল্প দূরে অবস্থিত ছিল।*

"উমর্দন"-এর মত নদীয়াও ইউজবক জয় করেন। ইতিপূর্বে তাঁর "নদীয়ার রাজস্ব অবলম্বনে প্রস্তুত" মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল, সম্প্রতি নদীয়ার টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রাও মিলেছে (Numismatic Digest, June 81, Pt. I, pp. 40-44 এবং JNSI, 1979, pp. 136-138 দ্রঃ)। নদীয়াও ইউজবক প্রথম জয় করেন নি, পুনরধিকার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

আসলে, ইউজবক শাহের তিন রকম মুদ্রা পাওয়া গেছে (JNSI, 1983, pp. 180 ff. দ্রষ্টব্য),

(১) দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে উৎকীর্ণ ৬৫১ বা ৬৫২ হিঃ-র মুদ্রা। এতে ইউজবকের উপাধি "ফি

---

* কেউ কেউ মনে করেন উমর্দন=বর্ধমান। এই মত অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত। ভাষাতত্ত্বও এই মতের অনুকূল। নদীয়া থেকেও বর্ধমান খুব কাছে, মান্দারণ বহু দূর।

নৌ বৎ অল আব্‌দ্‌ ইউজবক অস্‌-সুলতানা"। ইউজবক এতে নিজেকে সুলতানের দাস বলেছেন।

(২) নদীয়া টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ ৬৫২ হিঃ-র মুদ্রা—ইউজবক এতে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলেছেন।

(৩) লখনৌতি টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ "উর্মর্দন (উর্মর্দন, উর্জমর্দন, অজমর্দন, অর্মর্দন) ও নদীয়ার রাজস্ব থেকে প্রস্তুত" ৬৫৩ হিঃ-র মুদ্রা। এতেও ইউজবক স্বাধীন সুলতান হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বাধীন সুলতান হিসাবে উৎকীর্ণ ইউজবক শাহের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার শীতলমঠ গ্রামে (তবকাৎ-ই-নাসিরী, যাকারিয়া সাহেবের অনুবাদ, পৃঃ ১৭০)।

জলালুদ্দীন মাসুদ জানী (দ্বিতীয়বার) ও ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকী

'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে অন্তত দু'বার লেখা হয়েছে যে ৬৫৬ হিজরার জিল্কদ মাসে জলালুদ্দীন মাসুদ জানীকে লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। (যাকারিয়া সাহেবের অনুবাদ, পৃঃ ১২৪, ২২৮)। কিন্তু ঐ বইতেই আবার লেখা হয়েছে যে মাসুদ জানীর জামাতা ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকী দিল্লী-দরবারে দু'টি হাতী, বহু সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি পাঠালে তাঁকে লখনৌতি রাজ্যের জায়গীর দেওয়া হয়। এর থেকে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো ও ডঃ আবদুল করিম অনুমান করেছেন যে মাসুদ জানীকে প্রথমে উক্ত পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইজ্জুদ্দীন বলবনের কাছে উপঢৌকন পেয়ে দিল্লী-কর্তৃপক্ষ সে নিয়োগ বাতিল করে দেন এবং ইজ্জুদ্দীনকে উক্ত পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু জামাই লখনৌতি থেকে সামান্য উপঢৌকন পাঠালেন আর শ্বশুরের নিয়োগ বাতিল হল—এ কেমন কথা? মীনহাজ লিখেছেন যে মাসুদ জানীর নিয়োগের পিছনে প্রধান মন্ত্রী উলুগ খান বলবনেরও অনুমোদন ছিল, সম্ভবত শত্রুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর নিয়োগ বাতিল হতে উলুগ খান দেবেন বলে মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয়-বার লখনৌতি-রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর জলালুদ্দীন মাসুদ জানী জামাতা ইজ্জুদ্দীন বলবনকে নিয়ে এ দেশে আসেন, কিন্তু অল্প কিছু দিনের

মধ্যেই তিনি অক্ষম বা পরলোকগত হলে ইজ্জুদ্দীন এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে পূর্বোক্ত উপঢৌকন পাঠান, তখন দিল্লী-কর্তৃপক্ষ শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর নিয়োগ পাকা করেন।

ইজ্জুদ্দীন বলবন ইতিপূর্বে ৬৫১ হিজরায় দিল্লীতে "আমীর-ই-হাজীব"-এর পদে নিযুক্ত হন এবং ৬৫৩ হিজরায় তিনি দিল্লীর সুলতানের পক্ষ থেকে উলুগ খানের সঙ্গে মীমাংসার জন্য তাঁর শিবিরে যান। লখনৌতি-রাজ্যের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি। রাজধানী অরক্ষিত রেখে তিনি পূর্ববঙ্গ অভিযানে যান এবং সেই সুযোগে তাজুদ্দীন অর্সলান খান রাজধানী দখল করে নেন। ফিরে এসে ইজ্জুদ্দীন তাজুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সম্ভবত নিহত হন (পরবর্তী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

তাজুদ্দীন সনজর অর্সলান খান

তাজুদ্দীন সনজর অর্সলান খান বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা লখনৌতি রাজ্যের কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। তাঁর সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে এই বিবরণ পাওয়া যায়:

মালিক অর্সলান খান একজন প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও বীর পুরুষ ছিলেন এবং বিজ্ঞতা ও সাহসিকতায় তিনি অতি উঁচুস্তরে পৌছোন। মহান সুলতান (ইলতুৎমিশ) তাঁকে ইখতিয়ার-উল-মুল্‌ক্ আবু বিক্‌র্ হাবশীর নিকট থেকে ক্রয় করেন। ইখতিয়ার-উল্‌-মুল্‌ক্ তাকে আদন অঞ্চল থেকে ক্রয় করেন এবং মিশরে নিয়ে আসেন। কেউ কেউ এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে শাম ও মিশর রাজ্যের খোওয়ারজম আমীরদের (মধ্যে একজনের) পুত্র ছিলেন তিনি এবং সেই অঞ্চলে তিনি বন্দী হন এবং তাঁকে বিক্রয় করা হয়।

প্রথমে সুলতান তাঁকে যখন ক্রয় করেন তখন তাঁকে 'জামাহ্‌দার'-এর পদে নিযুক্ত করেন এবং সেই পদে কিছুকাল ধরে তিনি সুলতানের সেবা করেন। শামসী রাজত্বকালের অবসান ঘটলে ও রুকনুদ্দীন (ফিরোজ শাহ্)-এর রাজত্ব শেষ হলে, সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালে তিনি 'চাশ্‌নীগীর'-এর পদে নিযুক্তি লাভ করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে তিনি বলারাম-এর জায়গীর লাভ করেন।

মহান শহীদ সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ তাঁর জীবৎকালে ভিয়ানা

(রাজ্যের) মালিক বাহাউদ্দীন তুগরলের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। প্রথম মুসলিম অধিকারের সময় ঐ রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মালিক বাহাউদ্দীন কর্তৃক উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করা হয়। এই সূত্রে নাসিরী রাজত্বে—তাঁর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক—ভিয়ানার জায়গীর অর্সলান খানকে প্রদান করা হয়। এর কয়েক বৎসর পরে তিনি ওয়াকিল-ই-দার-এর পদে নিযুক্ত হন।

পরবর্তী কালে (মালিক নসরৎ-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন) শের খান (সোনকর)-এর বংশধরদের নিকট থেকে তবরহিন্দাহ্-র সুরক্ষিত নগরী জয় করা হলে, ৬৫১ (হিজরী) সনের জিলহজ্জ মাসে (সে স্থানের জায়গীর) তাঁকে প্রদান করা হয়। এর পরে মহান সুলতানের আদেশে—তাঁর রাজত্ব এমনিভাবে চিরস্থায়ী হোক—উলুগ খান-ই-আজম যখন নাগওয়ার গমন করেন এবং সুলতানের খেদমতে প্রত্যাবর্তনেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন অর্সলান খান তাঁর খেদমতে (নিজেকে) সমর্পণ করেন (এবং তাঁর সহযাত্রী হন)। রাজধানীতে উপস্থিত হলে বিশ্বেব আশ্রয়স্থল সুলতানের নিকট থেকে তিনি সম্মান লাভ করেন। তিনি তবরহিন্দাহ্-তে প্রত্যাবর্তন করেন।

তুর্কীস্তান থেকে ফিরে এসে মালিক শের খান তবরহিন্দাহ্ পুনরধিকারে সচেষ্ট হন। লাহোরের দিক থেকে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সঙ্গে করে এনে তিনি রাত্রিকালে তবরহিন্দাহ্ দুর্গদ্বারে এসে উপস্থিত হন। শের খানের সৈন্যদল নগর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাতঃকালে সূর্যের আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হলে অর্সলান খান তাঁর সহকারী ও তাঁর পুত্রদের নিয়ে দুর্গের বাইরে এসে আক্রমণ করেন। শের খানের অশ্বারোহী সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, তিনি প্রয়োজনের তাগিদে পশ্চাদপসারণ করেন। এর পরে শের খান যখন মহান দরবারে আগমন করেন তখন শাহী দরবারের এক আদেশের ফলে অর্সলান খান নিজেও দরবারে উপস্থিত হন। তিনি রাজধানীতে কিছুকাল অতিবাহিত করেন।

এর পরে তাঁকে অযোধ্যার জায়গীর প্রদান করা হয়। (মালিক) কুতলুগ খান ও তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত আমীর হাত মিলিয়েছিলেন, তাঁরা বার কয়েক অযোধ্যা ও করাহ্ রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অত্যাচার করেন। অর্সলান খান তাঁদের এ অত্যাচার দমন করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হন এবং ঐ দলকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এর পরে রাজধানীর (সুলতানের) প্রতি তাঁর

কিছুটা বিদ্রোহের মনোভাব প্রকাশ পেলে শাহী পতাকা তাঁর মনোবাসনাকে দমন করার উদ্দেশ্যে অযোধ্য ও করাহ্ অঞ্চলে অগ্রসর হয়। শাহী পতাকার ছায়া ঐ রাজ্যে পতিত হলে অর্সলান খান (রাজকীয়) কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিকট থেকে সরে দাঁড়ান এবং বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণ করে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন যে, শাহী পতাকা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি ও মালিক (আলাউদ্দীন) জানীর পুত্র কুতলুগ খান (সুলতানের) খেদমতে উপস্থিত হবেন। তাঁদের আবেদন ক্ষমাময় মহানুভবতার সঙ্গে গৃহীত হয়। বাদশাহী সেনাদল রাজত্বের কেন্দ্রস্থল মহান রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরে অর্সলান খান দ্বিতীয় বারের মত শাহী দরবারে উপস্থিত হন এবং প্রচুর সম্মান ও পারিতোষিকের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করেন।

কিছুকাল শাহী দরবারে অবস্থান করার পর ৬৫৭ (হিজরী) সনে করাহ্ নগরের জায়গীর তাঁকে প্রদান করা হয়। এর পরে সপ্তম সনের (একই বৎসরের) প্রথম দিকে তিনি মালব ও কালিঞ্জর রাজ্য লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ অগ্রসর হন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি গতি পরিবর্তন করে লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন।

(সে সময়ে) লখনৌতির শাসনকর্তা বঙ্গ রাজ্যে (অভিযানে) গিয়েছিলেন এবং লখনৌতি নগর অরক্ষিত ছিল। তাঁর পুত্রগণ, আমীরগণ ও অনুচরবর্গ, কারও কাছেই অর্সলান খান এই গোপন তথ্য প্রকাশ করেন নি যে, তাঁরা লখনৌতি রাজ্য অধিকার করতে যাচ্ছেন এবং এই অধিকারের জন্য শাহী দরবার থেকে তাঁর কোন অনুমতি এবং আদেশও ছিল না। তিনি ঐ রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছোলে তাঁর পুত্র ও আমীরদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর উদ্দেশ্য কি তা জানতে পেরে তাঁর অনুগামী হতে অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় না থাকায়, প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা তাঁর অনুগামী হন। তিনি লখনৌতির নগর-দ্বারে উপস্থিত হলে নগরবাসিগণ নগর-প্রতিরক্ষক হন।

বর্ণনাকারিগণ এমন উক্তি করেছেন যে, তিন দিন ধরে তিনি (অর্সলান খান) যুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে তিনি নগর অধিকার করেন এবং লুণ্ঠনের আদেশ দেন। বহু ধনরত্ন, গবাদি পশু ও মুসলমান বন্দী তাঁর সৈন্যদের হস্তগত হয়। তিন দিন ধরে এই লুণ্ঠন ও ধ্বংসের কাজ চলতে থাকে। এই উত্তেজনা প্রশমিত এবং নগর অধিকৃত হলে লখনৌতির শাসনকর্তা মালিক ইজ্জুদ্দীন

বলবন (ইউজবকী) যেখানে ছিলেন, সেখানে এ বিপদের সংবাদ পান। তিনি ফিরে আসেন। অর্সলান খান ও তাঁর মধ্যে যুদ্ধ হয়।

শাহী দরবার থেকে (পূর্বেই) ইজ্জুদ্দীন বলবন (ইউজবকী)-কে লখনৌতি রাজ্যের জায়গীর প্রদান করার এক আদেশ দেওয়া হয়েছিল (এবং তা দেওয়া হয়েছিল মালিক বলবন ইউজবকী কর্তৃক) সুলতানের দরবারে দুটি হস্তী, অসংখ্য সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণ করার পর।

অর্সলান খান সনজর যুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করেন এবং মালিক ইজ্জুদ্দীন বন্দী হন এবং কেউ কেউ এমন বলেন যে, তিনি নিহত হন। ঐ রাজ্যের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তাজুদ্দীনের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' থেকে আর কিছুই জানা যায় না। তবে যতদূর মনে হয়, তাজুদ্দীন স্বাধীন সুলতান হিসাবে এ দেশে কয়েক বছর রাজত্ব করেন। তার পর তিনি পরলোকগমন করেন এবং তাঁর পুত্র তাতার খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (পরবর্তী প্রসঙ্গ দ্রঃ)। তাজুদ্দীন যে লোভী, বিশ্বাসঘাতক ও স্বজাতিদ্রোহী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাতার খান

তাজুদ্দীন অর্সলান খানের পুত্র মুহম্মদ অর্সলান তাতার খানের নাম জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে এবং পরবর্তী ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থের মতেই তাতার খান অর্সলান খানের পুত্র।

বারনি লিখেছেন যে ৬৬৪ হিজরায় গিয়াসুদ্দীন বলবন সিংহাসনে আরোহণ করলে "তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরে অর্সলান খানের পুত্র তাতার খান লখনৌতি থেকে দিল্লীতে ৬৩টি হাতী সমেত অনেক উপঢৌকন পাঠান। বলবন তাতার খানের প্রতিনিধিদের রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁদের বহুমূল্য উপহার দেওয়া হয়। জনসাধারণও এতে খুব খুশি হয় এবং তারা আনন্দপ্রকাশ করতে থাকে।"

তাতার খানের ৬৬৫ হিজরার ১৮ই জমাদী অল-আউয়ল তারিখে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে বিহারের বারদারীতে। এতে ৬৬৩ হিজরায় মৃত জনৈক সুলতান শাহের সমাধি নির্মাণের কথা লেখা আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সুলতান শাহ তাতার খানের পিতা তাজুদ্দীন অর্সলান

খান। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন ইনি একজন দরবেশ। প্রথম মতই সত্য বলে আমাদের মনে হয়।

বারনির মতে তাতার খান বলবনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেন। এই কথা সত্য, কারণ লখনৌতির টাকশালে উৎকীর্ণ বলবনের ৬৬৫, ৬৬৭ (বা ৬৬৯), ৬৬৮ ও ৬৭৩ হিজরার মুদ্রা মিলেছে (Abdul Karim, Corpus of the Muslim Coins of Bengal, p. 8)। আনুগত্য স্বীকার না করলে বলবন তাতাব খানের প্রেরিত উপহার গ্রহণ করতেন না।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে তাতার খান "সাহসিকতা, সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য দেশবিখ্যাত ছিলেন।" সম্ভবত তিনি পিতার লখনৌতি-জয়ের বিরোধী ছিলেন (পৃ: ৬৯ দ্র:)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলবন ও তাঁর বংশধরদের রাজত্ব

শের খান

তাতার খানের পরবর্তী শাসনকর্তা শের খানের নাম জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে মেলে, কিন্তু এঁর পবিচয় কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁকে "a member of thc family of Tājuddin Arslān Khan and not a Governor sent from Delhi" বলেছেন—কিন্তু এ মতের অনুকূলে কোন প্রমাণ তিনি দেন নি। শের খানও বলবনের নামেই মুদ্রা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। কয়েক বছর শাসন করাব পরে তাঁব মৃত্যু হলে বলবন আমিন খানকে লখনৌতি-রাজ্যের শাসনর্কতা এবং তুগরল খানকে সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। শের খানেব পক্ষেও বলবন কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

আমিন খান ও তুগরল খান (মুগীসুদ্দীন)

গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে লখনৌতি-রাজ্যের "শাসনকর্তা" তুগরল খানের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা এবং বলবনেব বাংলায় এসে তাঁকে দমন ও বধ করার প্রসঙ্গ ভারতের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত ঘটনা। কিন্তু এপর্যন্ত ঘটনাটির একটি সর্ববাদিসম্মত ও পরিষ্কার চিত্র পাওয়া সম্ভব হয় নি। তার প্রথম কারণ, সমসাময়িক বিবরণের অভাব। এ সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রাচীন সূত্র জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। কিন্তু এই বই আলোচ্য ঘটনার প্রায় আশী বছর পরে লেখা। অবশ্য, বারনির মাতামহ সিপাহ্-সালার হিসামুদ্দীন বলবনের বাহিনীর সঙ্গে বাংলায় গিয়েছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য লখনৌতি শহরের সাহানা (সামরিক প্রশাসক) নিযুক্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া বারনি তাঁর পিতা, পিতামহ এবং বলবনের অধীনস্থ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের কাছ থেকেও বলবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং বারনির বিবরণের প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য, যদিও তার মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা

অস্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তুগরলের বিদ্রোহ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'র বিবরণের সঙ্গে এর কয়েক দশক পরে লেখা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কেবল পরবর্তী গ্রন্থ বলেই 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র সব কথা অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ এর লেখক য়াহিআ বিন শিরহিন্দী যে খুব সাবধানী লেখক ছিলেন এবং আমাদের অজ্ঞাত নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন—এর অনেক নিদর্শন আমরা পাই। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' ও 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণের এই অমিলকে উপেক্ষা করে জোড়াতালি দিয়ে দুই সূত্রের উক্তির মধ্যে "সমন্বয়" সাধন করেছেন। আমরা তা না করে প্রথমে দু'টি সূত্রের বিবরণের সংক্ষিপ্তসার আলাদা আলাদা ভাবে দেব এবং তারপর এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বারনির বিবরণের সংক্ষিপ্তসার এই :

স্থলতান গিযাসুদ্দীন বলবনের সিংহাসনে আরোহণের পরে প্রায় পনেরো ষোল বছর পর্যন্ত দেশ শান্ত ছিল, কোন শত্রু বা ক্ষুব্ধ লোক শান্তি ভঙ্গ করে নি। অবশেষে দিল্লীতে খবর পৌঁছোলো যে বিশ্বাসঘাতক তুগরল লখনৌতিতে বিদ্রোহ করেছেন। তুগরল ছিলেন তুর্কী—খুব কর্মঠ, নির্ভীক সাহসী ও উদার প্রকৃতির লোক। বলবন তাঁকে লখনৌতি ও বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। লোকে লখনৌতিকে 'বলগাকপুর' (বিদ্রোহীদের এলাকা) নাম দিয়েছিল, কারণ মুইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ স্যামের দিল্লী-বিজয়ের পর থেকে—লখনৌতিতে দিল্লী থেকে প্রেরিত প্রত্যেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাসনকর্তা দূরত্ব এবং খারাপ রাস্তাঘাটের সুযোগ নিয়ে, বিদ্রোহ করত। তারা নিজেরা বিদ্রোহ না করলে অন্যেরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত এবং তাদের হত্যা করে দেশ দখল করত। বহু বছর ধরে এ দেশের লোকেদের মধ্যে বিদ্রোহের প্রবণতা গড়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে যারা ক্ষুব্ধ ও দুষ্টপ্রকৃতির লোক, তারা সাধারণত শাসনকর্তাদের (দিল্লীর প্রতি) আনুগত্য নষ্ট করতে সমর্থ হত।

লখনৌতিতে নিযুক্ত হয়ে তুগরল খান কয়েকটি অভিযানে সাফল্য লাভ করেন। জাজনগর আক্রমণ করে* অনেক মূল্যবান সম্পদ এবং হাতী তিনি নিয়ে

* এটা উল্লেখযোগ্য, 'তুগরল' নামক লখনৌতির তিন শাসনকর্তাই ('তুগরল তুগান খান, যুজবক তুগরল খান ও এই তুগরল খান) জাজনগর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

আসেন। বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহীরা তখন তাঁর কাছে গেল এবং বলল যে সুলতান বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর দুই পুত্র মোগলদের প্রতিরোধে ব্যস্ত। এমন কোন বছর যায় না, যখন মোগলরা হিন্দুস্তানে এসে বিভিন্ন শহর দখল না করে। দিল্লীর শাসকবৃন্দ এইসব আঘাত ঠেকিয়ে রাখার ব্যাপারেই ব্যস্ত—সুলতান ও তাঁর পুত্রদের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছেড়ে লখনৌতিতে আসা সম্ভব নয়। হিন্দুস্তানের আমীরদের নেতা নেই ; সৈন্য, লোকজন, হাতী এবং অর্থেরও অভাব। তাদের লখনৌতিতে অভিযান করে তুগরলের বিরোধিতা করার শক্তি নেই। এই কারণে তারা (পূর্বোক্ত লোকেরা) তাকে (তুগরলকে) বিদ্রোহ করতে এবং সিংহাসনে আরোহণ করতে পরামর্শ দিল। তুগরল এইসব কুপরামর্শদাতাদের কথা শুনে বিপথগামী হলেন ; তিনি ছিলেন যুবক, স্বেচ্ছাচালিত এবং দুঃসাহসী। "তাঁর মাথায় বহুদিন ধরে উচ্চাশা ডিম পেড়ে আসছিল।" (রাজশক্তির) প্রতিহিংসা এবং দমনের আশঙ্কা তাঁর মনে ঠাঁই পেত না। জাজনগর থেকে পাওয়া লুঠের মাল ও হাতী তিনি নিজেই রেখে দিয়েছিলেন, দিল্লীতে কিছু পাঠান নি। তিনি রাজকীয় তকমা ধারণ করলেন, সুলতান মুগীসুদ্দীন উপাধি নিলেন, এবং এই নামে খুৎবা পাঠ করলেন ও মুদ্রা উৎকীর্ণ করালেন। তাঁর উদারতা খুব বেশি ছিল ; সুতরাং শহরের ও আশপাশের লোকেরা তাঁর বন্ধু হয়ে পড়েছিল। (তাঁর) টাকা স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের চোখ বন্ধ করেছিল। রাজনীতিবোধসম্পন্ন লোকদের চোখ লোভে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল। সৈন্যেরা ও নাগরিকেরা সার্বভৌম শক্তির ভয় ভুলে সর্বান্তঃকরণে তুগরলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

তুগরলের বিদ্রোহ বলবনের পক্ষে খুবই অস্বস্তির কারণ হয়েছিল, কারণ তুগরল ছিলেন বলবনের একজন প্রিয় ক্রীতদাস। রাগে দুঃখে তাঁব ক্ষুধা ও নিদ্রা অন্তর্হিত হল। তুগরলের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারী এবং দিল্লীতে তুগরলের বিরাট পরিমাণ দান পাঠানোর খবরে তিনি উত্তরোত্তর জ্বলতে লাগলেন। এ ব্যাপার নিয়ে তিনি এত মাথা ঘামাতে লাগলেন যে আর কোন কাজে মন বসাতে পারলেন না। প্রথমে তিনি তুগরলের বিরুদ্ধে তাঁর একজন পুরোনো ক্রীতদাস "লম্বাচুল" আবতাগিনকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত যোদ্ধা, বহু বছর অযোধ্যার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর অধীনে তমোর খান শামসী, কৎলগ খানের পুত্র মালিক তাজুদ্দীন এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য আমীরদের

দেওয়া হল। আবতাগিন বা আমীর খান সসৈন্যে সরযূ পার হয়ে লখনৌতির দিকে রওনা হলেন। তুগরল অনেক হাতী সমেত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁকে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন। দুই বাহিনী পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে যখন এল, তখন এক বিরাট সংখ্যক লোক তুগরলের উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে তুগরলের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল; তুগরল তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত দিল্লীর বহু সৈন্যকে হাত করে ফেললেন। তিনি আমীর খানকে আক্রমণ করে পরাস্ত করলেন। দিল্লীর সৈন্যেরা পালাল, হিন্দুরা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করল। এই পরাজয়ের খবর সুলতানের কাছে পৌছোলে শতগুণ রাগে ও লজ্জায় অস্থির হয়ে তিনি ঈশ্বরের রোষের ভয়ও হারিয়ে ফেললেন এবং অপ্রয়োজনীয় কঠোর আচরণ করলেন। তিনি আমীর খানকে অযোধ্যার ফটকে ফাঁসি দিতে বললেন। এই শাস্তি তখনকার জ্ঞানী লোকদের মনে প্রচণ্ড বিরোধিতার মনোভাব সৃষ্টি করল, তাঁরা মনে করলেন বলবনের রাজত্ব যে শেষ হয়ে আসছে এটা তারই ইঙ্গিত।

পরের বছর বলবন এক নতুন সেনাপতির অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আমীর খানকে হারিয়ে তুগরল আরও সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লখনৌতি থেকে বেরিয়ে দিল্লীর বাহিনীকে আক্রমণ করলেন এবং তাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলেন। এই বাহিনীর অনেক সৈন্যও তুগরলের সোনায় লুব্ধ হয়ে তুগরলের দলে যোগ দিল। এ খবর পেয়ে সুলতান লজ্জায় রাগে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তুগরলকে পরাস্ত করতে তাঁর সমস্ত মনোযোগ ও শক্তিকে তিনি নিয়োজিত করলেন। তিনি তুগরলের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধাভিযান করবেন স্থির করলেন এবং গঙ্গা ও যমুনায় বিরাট সংখ্যক নৌকা সংগ্রহের আদেশ দিলেন। যেন শিকারে যাচ্ছেন, এইভাবে তিনি সমানা ও সন্নমে (এখানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খান শাসনকর্তা ছিলেন) গেলেন এবং এই অঞ্চলগুলি ভাগ করে এখানকার সৈন্যবাহিনী ও তাদের অধ্যক্ষের অধীনে এগুলি রাখলেন। মালিক সুনজ্ সর্জন্দর সমানার নায়েব ও সৈন্যাধ্যক্ষ হলেন। বুগরা খানকে আদেশ দেওয়া হল নিজের সৈন্যবাহিনী গঠন করে পিতার বাহিনীর পিছন পিছন চলতে। বলবন সমানা থেকে দোআব গিয়ে গঙ্গা পার হলেন এবং লখনৌতির পথ ধরলেন। মুলতানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠালেন, দিল্লীর কোতোয়াল আমীর-উল-উমারাকে দিল্লীর শাসনভার দিলেন। সবাইকে তিনি বললেন তুগরলের পিছু ধাওয়া করতে তিনি বদ্ধপরিকর এবং তাঁর বিরুদ্ধে

প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ না করে তিনি ফিরে আসবেন না। বলবন আশপাশের সব সৈন্যকে আনালেন এবং লখনৌতির দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর রাগ ও লজ্জা বর্ষাকেও গ্রাহ্য করল না। অযোধ্যায় পৌঁছে তিনি ব্যাপক সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিলেন এবং সর্বশ্রেণীর মিলিয়ে দু'লক্ষ লোক সংগ্রহ করলেন। "ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, পাইক, দানাক, কাহার, কিওয়ানি, খুদ আস্‌পাহ্ (নিজের ঘোড়া নিয়ে যারা যুদ্ধ করত), তীরন্দাজ, গোলাম, চাকর, সওদাগর ও বাজারী—সংগৃহীত হল।"

বহু নৌকাও সংগৃহীত হল, এগুলিতে চড়ে তিনি সরযূ পার হলেন। এদিকে বর্ষা চলে এল। যদিও বলবনের অনেক নৌকা ছিল, নীচু দেশের উপর দিয়ে যেতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। জল-কাদা-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সৈন্যবাহিনীর দশ বারো দিন দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তুগরল গুপ্তচরের মুখে বলবনের অগ্রগতির খবর পেলেন। তিনি বন্ধু ও সমর্থকদের বললেন, "সুলতান ছাড়া আর কেউ আমার বিরুদ্ধে এলে আমি তার মুখোমুখি হতাম ও যুদ্ধ করতাম। কিন্তু সুলতান যখন দিল্লীর কাজ ছেড়ে চলে এসে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, তখন আমি তাঁর মোকাবিলা করতে পারব না।" বলবনের সরযূ পার হবার খবর তুগরলের কাছে এলে তিনি পালাবার উদ্যোগ করলেন, বর্ষার জন্য সুলতানের আসতে দেরী হওয়ার ফলে তিনি প্রচুর সময়ও পেলেন। সুলতানের প্রতিহিংসার ভয়ে বহু লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। তিনি বহু ধনরত্ন, হাতী, বাছাই-করা সৈন্যবাহিনী, রাজপুরুষ, আত্মীয়স্বজন এবং অনুচর-বর্গকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানবর্গ সমেত তাঁর সঙ্গে নিয়ে চললেন। সুলতানের প্রতিশোধের ভয় দেখিয়ে তিনি বহু লোককে বশে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি জাজনগরের পথ ধরলেন এবং একটি শুকনো জায়গায় বিশ্রাম করলেন, যা লখনৌতি থেকে এক দিনের পথ। শহরে গুরুত্বপূর্ণ খুব কম লোকই রইল। তুগরলের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব ভালই ছিল, এর কারণ এক দিকে সুলতানের ভয়, অপর দিকে তুগরলের অনুগ্রহ পাবার আশা। সুলতান যখন লখনৌতি থেকে ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরে ছিলেন, তখন তুগরল আবার জাজ-নগরের দিকে যাত্রা সুরু করলেন। যে সব লোক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল, তাদের তিনি এই বলে আশ্বাস দিলেন যে তিনি কিছু সময় জাজনগরে থাকবেন; সুলতান বেশি দিন লখনৌতিতে থাকতে পারবেন না। সুলতানের চলে যাবার

খবর পাওয়া মাত্র তারা সবাই জাজনগর লুঠ করবে এবং ধনী হয়ে নিরাপদে দিল্লী ফিরে আসবে।* সুলতানের নিযুক্ত কোন লোকই তাদের ফেরার সময় বাধা দিতে পারবে না। তারা ফিরে এলে সুলতানের প্রতিনিধিও চলে যাবে।

বলবন লখনৌতিতে সৈন্যদেব নতুন কবে সংগঠিত ও সশস্ত্র করার মধ্য দিয়ে কয়েক দিন অতিবাহিত কবলেন। গ্রন্থকারের মাতামহ—মালিক বারবকের ওয়াকিলদার—সিপাহ্-সালার হিসামুদ্দীন লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল—দিল্লী থেকে যে সব খবর আসবে, তার পূর্ণ বিবরণ—বলবনের কাছে সপ্তাহে তিন চার বার পাঠাবাব জন্য। বলবন পূর্ণ গতিতে যাত্রা করে কয়েক দিনের মধ্যে সোনারগাঁও পৌঁছোলেন। সেখানকার রায—তাঁর নাম দনুজ রায়—সুলতানের সঙ্গে দেখা করলেন। দনুজ রায়ের সঙ্গে তাঁব এই মর্মে এক চুক্তি হল যে—দনুজ রায দেখবেন তুগরল জলে বা স্থলে কোথাও যাতে না অবস্থান করতে পারে, অথবা জলপথে পালাতে বা জলে লুকিয়ে থাকতে না পাবে।

[পূর্ববর্তী গবেষকবা এলিয়ট ও ডাউসনের অনুবাদের উপর নির্ভর করে বলেছিলেন যে, তুগরল যাতে জলপথে না পালাতে পারে, দনুজ রায় তা দেখবেন, এই কথা বারনি বলেছেন। বারনিব মূল বিবরণে কিন্তু ঠিক এই কথা বলা হয় নি, এতে বলা হয়েছে দনুজ রায় বলবনকে এই প্রাতশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তুগরল জলে বা স্থলে যেখানেই থাকুন না কেন (তখন মানুষ অন্তরীক্ষে যেতে পারত না বলে অন্তরীক্ষের কথা বলা হয নি), দনুজ রায় তা দেখবেন অর্থাৎ ফাঁক পেলেই তাঁকে ধরবেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে দনুজ রায়ের প্রতিশ্রুতির মধ্যে জল বা স্থলের কোন কথা নেই, শুধু তুগরলকে ধরে দেওয়ার কথা আছে।]

তারপর বলবনের সৈন্যবাহিনী সত্তর ক্রোশ চলে জাজনগরের কাছে পৌঁছোলো। কিন্তু তুগরল অন্য পথে পালিয়েছিলেন, তাঁর বাহিনীর একটি লোককেও দেখা গেল না। তাই সুলতান সাত আট হাজার সৈন্য সঙ্গে দিয়ে মালিক

* সম্ভবত তুগরল মিথ্যা আশ্বাস দিযে তাঁর লোকদের ভুলিয়েছিলেন। এ রকম সময়ে জাজনগর আক্রমণ করলে তুগরল সামনে জাজনগবের রাজা এবং পিছনে বলবন বা তাঁর প্রতিনিধি—এই দুই শত্রুর মাঝখানে পড়ে স্যাণ্ডউইচ্‌ড্ হয়ে যাবেন, এ বোধ নিশ্চয়ই তাঁর ছিল।

বারবক বেকতুর্স্ সুলতানীকে পাঠালেন, তিনি মূল বাহিনী থেকে এগিয়ে দশ বারো ক্রোশ চলে গেলেন। প্রত্যহ চার দিকে চর পাঠানো হতে লাগল তুগরলের খবর আনবার জন্য। কিন্তু কোন খবর পাওয়া গেল না। অবশেষে এক দিন সেখান থেকে দশ বারো ক্রোশ দূরে কোল-এর সর্দার মুহম্মদ শের-আন্দাজ, তাঁর ভাই মালিক মুকদ্দীর ও "তুগরল-কুশ"* এক জায়গায় একদল শস্যবিক্রেতার দেখা পেলেন, যারা তুগরলের সঙ্গে ব্যবসায় সেরে বাড়ি ফিরছিল। এই লোকগুলিকে অবিলম্বে আটক করা হল। মালিক শের-আন্দাজ তাদের দু'জনের মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। এর ফলে বাকী লোকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জানাল যে তুগরল আধ ক্রোশের কম দূরে একটি পাথরে তৈরী জলাধারের কাছে রয়েছেন, পরদিন জাজনগর রাজ্যে প্রবেশের সঙ্কল্প করেছেন। মালিক শের-আন্দাজ দু'জন তুর্কী ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দু'জন শস্যবিক্রেতাকে মালিক বাবরকের কাছে পাঠিয়ে এই আবিষ্কারের খবর জানালেন এবং তাঁকে আসতে বললেন। তারপর নিজেরা এগিয়ে গিয়ে একটি বাঁধের ধারে তুগরলের তাঁবু দেখতে পেলেন। তুগরলের পুরো বাহিনীটাই সেখানে ছিল। কারও মনেই বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না; কেউ কেউ কাপড় কাচছিল, অন্যেরা মদ খাচ্ছিল এবং গান গাইছিল। হাতীরা গাছের ডাল খাচ্ছিল এবং ঘোড়া ও গরু-মহিষগুলি চরছিল। অনুসন্ধানকারী দলের নেতারা নিজেদের মধ্যে বললেন যে তাঁদের কথা যদি এরা জেনে যায়, তা হলে তুগরল পালাবেন। তাঁর হাতী ও ধনরত্ন তাঁদের হস্তগত হতে পারে, কিন্তু তুগরলকে তাঁরা ধরতে পারবেন না। তা' যদি হয়, সে ক্ষেত্রে সুলতানকে তাঁরা কী বলবেন এবং তাঁদের জীবনের কী আশা থাকবে? তাঁরা তাই ঠিক করলেন অবিলম্বে তুগরলের শিবিরে হানা দেবেন। এই ঠিক করে ঐ সাহসী লোকরা তলোয়ার বার করে তুগরলের নাম ধরে চীৎকার করতে করতে তাঁবুতে হানা দিলেন। তখন তুগরল রান্নাঘরের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে জিনবিহীন একটি ঘোড়ায় চড়ে কাছের একটা নদীর দিকে ছুটে গেলেন। তুগরলের গোটা বাহিনী ধরে নিল যে সুলতান স্বয়ং তাদের আক্রমণ করেছেন, তারা ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। মুকদ্দীর ও "তুগরল-কুশ" তুগরলের পিছু পিছু ধাওয়া করলেন। যখন তুগরল নদীর কাছে পৌঁছেছেন,

* অর্থাৎ 'তুগরল-নিহন্তা'। এই উপাধি ইনি পরে পান। এঁর আসল নাম অজ্ঞাত।

তখনই "তুগরল-কুশ" একটি তীর ছুঁড়ে তাঁকে আহত করে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুকদ্দীর ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর মাথা কেটে ফেলে দেহটাকে নদীতে ছুঁড়ে দিলেন। পোষাকের নীচে তুগরলের মাথা লুকিয়ে তিনি নদীতে গিয়ে হাত ধুলেন। তুগরলের লোকেরা তখন চারদিকে তাঁর খোঁজ করছিল। ঠিক এই সময়ে মালিক বারবক সসৈন্যে এসে পড়ে তুগরলের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। মুকদ্দীর ও "তুগরল-কুশ" মালিক বারবককে তুগরলের কাটা মাথা দিলেন, বারবক বলবনকে সাফল্যের কথা জানিয়ে তখনই চিঠি দিলেন। তুগরলের পুত্রকন্যারা, ভৃত্যরা, সঙ্গীরা এবং রাজপুরুষেরা—সবাই বিজয়ীদের হাতে পড়ল। বিজয়ীরা লুঠ করে এত টাকা, জিনিসপত্র, ঘোড়া, অস্ত্র, ক্রীতদাস ও দাসী পেল যা তারা ও তাদের সন্তানরা বহু বছর ধরে ভোগ করতে পারে। দু'তিন হাজার স্ত্রী পুরুষ বন্দী হল।

বলবন সব খবরই শুনলেন এবং মালিক বারবক কিছু পরে লুঠের মাল ও বন্দীদের নিয়ে ফিরে এলেন। শের-আন্দাজের কাছে সব কথা শুনে তাঁর দুঃসাহসিক কাজের জন্য বলবন তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন যে এতে তাঁর এবং দিল্লীর বাহিনীর বিপদ ঘটতে পারত। তারপর তিনি শের-আন্দাজ ও মুকদ্দীরকে পুরস্কার দিলেন এবং যিনি তুগরলকে তীর ছুঁড়ে মাটিতে ফেলেছিলেন, তাঁকে "তুগরল-কুশ" উপাধি দিলেন। এই ঘটনার পরে বলবন সম্বন্ধে প্রজাদের ভীতি শতগুণ বেড়ে গেল।

'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল :

লখনৌতির জায়গীরদার শের খানের মৃত্যুর খবর পেয়ে বলবন লখনৌতির শাসনভার দিলেন আমিন খানকে, তুগরল তাঁর সহকারী নিযুক্ত হলেন। বলবনের অসুস্থতা ও লোকচক্ষের সামনে উপস্থিত না হবার খবর লখনৌতিতে পৌঁছোলে তুগরল ও আমিন খানের (এঁদের মধ্যে ইতিমধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল) মধ্যে বিরোধ বাধল। তুগরলই এতে জয়ী হলেন, আমিন খান তাঁর হাতে বন্দী হলেন। তুগরল মুইজ্জুদ্দীন নাম নিয়ে মাথায় রাজছত্র ধারণ করলেন।

কিছু দিন পরে আমিন খান, তুগরল, জমালুদ্দীন কান্দাজী ও আবতাকিন মুসার কাছে রাজ-আদেশ গেল যে সুলতান বলবন আরোগ্য লাভ করেছেন, উপযুক্ত সমারোহ সহকারে যেন এই রোগমুক্তির উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তুগরল এই আদেশ পেয়ে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিহারে উপস্থিত হলেন। আবতাকিন,

জমালুদ্দীন কান্দাজী ও আমিন খানকে তিনি বন্দী করে নারকিলাহ্‌তে (নরকিলা) রেখে দিলেন।

তুগরলের বিদ্রোহের খবর বলবনের কাছে পৌছোলে তিনি মালিক তুরমতীকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠালেন। তুগরল তখন একটু পিছু হটে লুকিয়ে রইলেন। তুরমতী বোকার মত তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন। তুগরল তখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুরমতীকে আক্রমণ করে পরাস্ত করলেন। তুরমতী পালিয়ে অযোধ্যায় গেলেন। সুলতান অযোধ্যার আমীর মালিক শাহাবুদ্দীনকে সৈন্য-বাহিনী পরিচালনার ভার দিলেন এবং তুরমতীকে সরযূ নদীর তীরে বধ করে তার দেহ তুগরলকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। সুলতানের আদেশ পালিত হল। কিন্তু শাহাবুদ্দীন পরিচালিত বাহিনী লখনৌতির কাছাকাছি এলে তুগরল যুদ্ধ করে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করলেন।

এই সংবাদ শুনে বলবন বিরক্ত হলেন এবং নিজেই সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার নিলেন। এ খবর পেয়ে তুগরল নৌকায় চড়ে নরকিলায় পালালেন। বলবন মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন নেকতারসের অধীনে এক শক্তিশালী বাহিনী তুগরলকে ধরবার জন্য পাঠালেন। ইতিমধ্যে, রায় দনুজ* সুলতানকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য (তাঁর কাছে) আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে চিঠি দিলেন এবং অনুরোধ জানালেন যে তিনি (বলবন) রায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবেন। একজন মুসলমান রাজার বিধর্মীকে উপযুক্ত সম্মান জানানো উচিত নয়—এই ব্যাপারটা সুলতানকে চিন্তিত করল। মালিক নেকতারস উপস্থিত ছিলেন, তিনি সুলতানকে চিন্তা না করতে বললেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে রায়ের আসার আগে সুলতান একটা বাজপাখি হাতে নিয়ে সিংহাসনে বসে থাকবেন এবং রায় সন্নিহিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে বাজ-পাখিটি ছেড়ে দেবেন। এতে লোকে অনুমান করবে যে সুলতান পাখিকে ছেড়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। "সুলতান মালিকের পরামর্শ অনুমোদন করলেন এবং তদনুসারে কাজ করলেন। তিনি মালিককে মূল্যবান উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। রায় সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে তুগরলকে সুলতানের সামনে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন।" সুলতান এর পর ক্রমে ক্রমে লখনৌতিতে পৌঁছোলেন,

* রায় দনুজ কোথাকার রাজা, তা 'তবকাৎ-ই-মুবারক শাহী'র লেখক জানতেন না।

তাইতে ভয় পেয়ে তুগরল জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—সুলতানের সৈন্যেরা তার পিছু পিছু ধাওয়া করল। মালিক নেকতারস তুগরলের উপরে চড়াও হয়ে তাকে জীবন্ত বন্দী করলেন। তারপর তিনি তুগবলের চামড়া ছাড়িয়ে তার দেহ সুলতানকে পাঠালেন।"*

এই দুই বিবরণের মধ্যে অনৈক্য এত বেশি যে স্পষ্টই বোঝা যায়, এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সূত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে। য়াহিআ বিন শিরহিন্দী তাঁর আলোচ্য বিবরণ লেখবার সময় বারনিব বই আদৌ ব্যবহার করেন নি বলে মনে হয। সেইজন্য এই দুই বিবরণের মধ্যে যে সব জায়গায় মিল আছে, সেগুলি মূল্যবান এবং সত্য বলে গৃহীত হবাব যোগ্য।

আলোচনাব সুবিধার জন্য তুগরলের প্রসঙ্গটিকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করে প্রত্যেকটি পর্ব সম্বন্ধে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করছি :

প্রথম পর্ব—তুগরলেব অভ্যুদয়।

এ সম্বন্ধে দু'টি বিবরণে অনৈক্য দেখা যায়। বারনির বিবরণ অনুসারে তুগরল একা প্রত্যক্ষভাবে লখনৌতি-রাজ্যের পূর্ণ শাসনভার পেয়েছিলেন, আমিন খানের কোন উল্লেখ বাবনি করেন নি। কিন্তু য়াহিআ বিন শিরহিন্দীর বিবরণ অনুসারে, শের খানের মৃত্যুব পর বলবন আমিন খানকে লখনৌতি-রাজ্যের শাসনকর্তা এবং তুগবলকে সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত কবেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বারনির কথাই সত্য বলে মনে করেছিলেন এবং আমিন খানের নিয়োগে অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন। পক্ষান্তরে, কালিকারঞ্জন কানুনগো য়াহিআ বিন শিরহিন্দীর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র কথাই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন—কিন্তু গ্রহণ করার অনুকূলে কোন কারণ দেখান নি, যা দেখানো তাঁর অবশ্য-কর্তব্য ছিল। তাই আমরা এ বিষয়টির বিচার করছি।

সময়ের অগ্রবর্তিত্ব এবং সিপাহ্‌সালার হিসামুদ্দীনের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করে কেউ যদি বারনির কথাকে প্রামাণিক বলে মনে করেন, তা হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। আমিন খানের নিয়োগ, এমন কি আমিন খানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান্ হবার অধিকার সকলের আছে, কারণ আপাত-দৃষ্টিতে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র উক্তির কোন প্রামাণিকতা নেই। কিন্তু

* " " চিহ্নের মধ্যবর্তী অংশটুকু 'তারিখ-ই-মুবারক' শাহীর আক্ষরিক অনুবাদ।

আমাদের মনে হয়, এক্ষেত্রে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তেই সঠিক কথা বলা হয়েছে; কারণ এই বইয়ে লেখা হয়েছে যে শের খানের মৃত্যুর পর বলবন আমিন খান ও তুগরল খানকে নিযুক্ত করেছিলেন। বলবনের রোগমুক্তির পর বাংলায় প্রেরিত বলবনের ফরমানের সংক্ষিপ্তসার যেভাবে য়াহিআ দিয়েছেন* এবং ফরমানের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা যেভাবে ঐ সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন, তা থেকে মনে হয় য়াহিআ ঐ ফরমান দেখেছিলেন; লক্ষণীয় যে তিনি বলেছেন ঐ ফরমান আমিন খান ও তুগরল ছাড়া জমালুদ্দীন কান্দাজী ও আবতাকিন মুসার কাছেও গিয়েছিল; শেষোক্ত দু'টি নাম প্রায় অজ্ঞাত এবং প্রামাণিক সূত্র বা ঐ ফরমান না দেখলে এই দু'জন অপরিচিত লোকের নাম য়াহিআ বিন শিরহিন্দীর কাছে পৌঁছোনো প্রায় অসম্ভব। এই কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে আমিন খানের শাসনকর্তা ও তুগরলের সহকারী শাসনকর্তার পদে নিয়োগ সম্বন্ধে 'তারিখ ই-মুবারক শাহী'র কথা সত্য।

দ্বিতীয় পর্ব—তুগরলের বিদ্রোহের উন্মেষ ও বিকাশ।

বারনি লিখেছেন যে তুগরল জাজনগরের লুণ্ঠনলব্ধ হাতী ও ধনরত্ন দিল্লীতে পাঠান নি। য়াহিআ লিখেছেন যে বলবনের অসুস্থতা ও লোকচক্ষে দেখা না দেবার খবর শুনে তুগরল পুরোপুরি বিদ্রোহী হন এবং আমিন খানকে বন্দী করেন। এই দু'টি কথাই সত্য হতে পারে। এর পরবর্তী ব্যাপার সম্বন্ধে দুই সূত্রই একমত, তুগরল মুগীসুদ্দীন নাম নিয়ে সুলতান হন।†

তৃতীয় পর্ব—বলবনের প্রেরিত বাহিনীর সঙ্গে তুগরলের যুদ্ধ।

দুই সূত্রই এ বিষয়ে একমত যে বলবন তুগরলের বিরুদ্ধে দু'টি সৈন্যবাহিনী পাঠান, দু'টিকেই তুগরল পরাস্ত করেন; প্রথমটিকে পরাস্ত করেন অযোধ্যার

* "that his (Sultan's) enemies had caused him affliction for a few days, and the Most high God had granted him a speedy cure, that the drum of joy be beaten, cupolas erected, amusements held, prisoners liberated and theologians rewarded; that if anybody had been justly suspended by the Tribunal of Fate, he should be presented with cash from the royal treasury and provided with an asylum," (Tarikh-i-Mubarak Shahi, translated by K. K. Basu, 1932, p. 39)

† এর আগে আর একজন তুগরল (যুজবক তুগরল খান) 'মুগীসুদ্দীন' নাম নিয়ে সুলতান হয়েছিলেন। এই তুগরল সম্ভবত তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।

খানিকটা পূর্ব দিকে অবস্থিত কোন জায়গায়।

এই বিষয়গুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দু'টি সূত্রের মধ্যে মতৈক্য নেই। বলবনের প্রথম বাহিনীর সেনাপতির নাম বারনির মতে আমীর খান আবতাগিন, য়াহিআর মতে মালিক তুরমতী; দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতির নাম যাহিআর মতে মালিক শহাবুদ্দীন, ইসামীর 'ফুতুহ-উস-সলাতীন'-এর মতে বাহাদুর (বারনি কোন নাম উল্লেখ করেন নি)। সবটাই রহস্যময়। দ্বিতীয় যুদ্ধের স্থান সম্বন্ধে বারনি কিছু লেখেন নি, যাহিআর মতে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল লখনৌতির কাছে এবং ইসামীর মতে ত্রিহুত ও লখনৌতির সীমান্তে।

চতুর্থ পর্ব – বিদ্রোহ দমন করতে বলবনের আগমন ও তুগরলের পলায়ন।

বলবন যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিনা প্রতিরোধে লখনৌতি-রাজ্যে এসে পৌঁছেছিলেন, সে বিষয়ে সূত্রগুলির মধ্যে মতানৈক্য নেই, এ বিষয়ে বারনির বিস্তৃত বিবরণকে সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়, কারণ তাঁর মাতামহের চোখের সামনেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল।

বলবনের লখনৌতিতে আসার খবর পেয়ে তুগরল পালিয়ে গেলেন, এ সম্বন্ধে দুই সূত্রই একমত। কিন্তু পালিয়ে কোথায় গেলেন? বারনি বলেন, জাজনগরের দিকে, যাহিআ বিন শিরহিন্দী বলেন নরকিলায়।

এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার আগে আমাদের জানা দরকার, নরকিলা কোথায় ছিল?

কালিকারঞ্জন কানুনগো এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (H.B.II, pp. 56 57 দ্রঃ)। তিনি দেখিয়েছেন যে তুগরল পূর্ববঙ্গের কতকাংশ জয় করেছিলেন, যাহিআ যাকে 'নরকিলা' বলেছেন, বারনি তাকেই 'কিলা-ই-তুগরল' বলেছেন এবং এই দুর্গটি হচ্ছে আসলে ঢাকা শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে এবং রাজবাড়ি থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'নরিকল', যা একদা ফিরিঙ্গীদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। স্থানটি সোনারগাঁওয়ের নিকটেই অবস্থিত। তুগরল সম্ভবত সোনারগাঁওয়ের রাজা দনুজ রায়ের কাছ থেকে এই অঞ্চল জয় করেছিলেন, যার ফলে দনুজ রায় তুগরলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হন এবং তুগরলকে ধ্বংস করার জন্য বলবনের সঙ্গে চুক্তি করেন। সুতরাং বলবনের লখনৌতিতে আসার খবর পেয়ে তুগরল পালিয়ে এই নরকিলা বা নরিকলেই চলে এসে-

ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তুগরল পালিয়ে নরকিলাতে এসেছেন খবর পেয়ে বলবন নরকিলায় এলেন, কিন্তু এসে দেখলেন তুগরল নরকিলা থেকে পালিয়ে গেছেন। তখন বলবন ঠিক করলেন যে তুগরলকে তিনি যেভাবেই হোক ধরবেন। কিন্তু তুগরল দনুজ রায়ের অধীন এলাকা দিয়েও পালিয়ে যেতে পারেন। তাই তিনি দনুজ রায়ের সঙ্গে চুক্তি করলেন। দনুজ রায়ও তুগরলকে ধরবার জন্য প্রতিশ্রুত হলেন।

তুগরল পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? বারনি তাঁকে জাজনগরের দিকে নিয়ে গেছেন। সোনারগাঁও থেকে, এমনকি সোনারগাঁও-সীমান্ত থেকেও জাজনগর সীমান্ত বহু দূর, ৭০ ক্রোশ (১৪০ মাইল) "চলে" বলবন সেখানে পৌঁছতে পারেন না—এটাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন, "Having found out that his retreat eastward or southward was cut off by the enmity of the Rai, Tughral apparently evacuated Narkila before the enemies had any suspicion of his movement."

অর্থাৎ পূর্বে বা দক্ষিণে না যেতে পেরে তুগরল পশ্চিমে "জাজনগরের" দিকে যান। ডঃ কানুনগো আরও লিখেছেন,

"Details in Barani clearly show that Balban after having marched for 70 kos was still at a considerable distance from the boundaries of Jajnagar,* a general name for the whole of the tract, south of the then known Muslim dominion in Bengal, and Satgaon became a part of the Muslim territory about twenty years after." (H B II, p. 66, f. n.)

ডঃ কানুনগো এইভাবে বারনির উক্তির আপাত-অসঙ্গতিকে মেরামত করেছেন। এ সম্বন্ধে 'তারিখ ই-মুবারক শাহী'তে শুধু লেখা আছে, তুগরল নারকিলা থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

---

* ব্লকম্যান প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেছিলেন—তুগরল যে জাজনগরের দিকে গিয়েছিলেন, তা উড়িষ্যা নয়, ত্রিপুরা। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক (H B II, pp. 65-66 দ্রঃ)।

যাহোক, বারনি অথবা যাহিআ বিন শিরহিন্দী—যাঁর কথাই সত্য হোক্ না কেন, একটা বিষয় পরিষ্কার। সেটা এই যে, দনুজ রায়ের সঙ্গে চুক্তি করার পরে বলবন জানতে পারলেন যে তুগবল কোন্ দিকে গিয়েছেন, তখন তিনি সেই দিকে যাত্রা শুরু করলেন এবং ১৪০ মাইল চলে তুগরলের আস্তানার কাছাকাছি পৌঁছোলেন।

কিন্তু তুগরল যে সত্যই জাজনগব অর্থাৎ উডিষ্যারাজ কর্তৃক অধিকৃত বাঢেব দক্ষিণাংশেব দিকে গিযেছিলেন—তার প্রমাণ আছে। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু এই অভিযানের সময়ে বুগরা খানের সহযাত্রী হয়ে লখনৌতিতে এসেছিলেন। তিনি 'ফতেহ্‌নামা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে বেক্‌তুব্‌স্ (যিনি তুগরলকে ধবার ব্যাপারে নেতৃত্ব করেন) অযোধ্যা এবং জাজনগর জয়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, মলদেও রানার নেতৃত্বাধীন এক শক্তিশালী বাহিনীকে পরাস্ত করে তিনি রাজার বাসস্থান জাহানবায়ে যান এবং আশীরগাঁওযের* দুর্ভেদ্য দুর্গ জয করেন।

তারপব বাজা বীরজিৎ মল মুসলমান রাজাব সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার এবং তাঁকে ভেট দেবাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে সুলতানের সামনে হাজির করা হয় এবং সুলতানের সামন্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়; এবপর সুলতান তাঁব বাহিনী নিয়ে ৬৮০ হিঃব ৫ই শওয়াল তারিখে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। (A. B. M. Habibullah, Foundation of Muslim Rule in India, 2nd ed. pp. 184-185, f. n.)।

এব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তুগরলকে বন্দী করার পরে† বেকতুরস বলবনের নির্দেশ অনুসারে আরও এগিযে জাজনগর রাজ্যে অর্থাৎ উডিষ্যারাজ অধিকৃত রাঢে প্রবেশ করেন এবং আশীরগাঁও প্রভৃতি বর্তমানে অজ্ঞাতনামা কিছু অঞ্চল জয় করেন, "বীরজিৎ মল" নিঃসন্দেহে উড়িষ্যারাজের অধীনস্থ

---

* দু'টি পুথিতে আশীরগাঁও" যেব জায়গায় "গাঁওসুনার" পাঠ আছে, এর থেকে ডঃ এ. বি. এম হবিবুল্লাহ মনে করেন বেকতুবস্ জাজনগর নয়, সোনারগাঁও জয় করেছিলেন, কিন্তু আমীর খসরু পরিষ্কারভাবে বেকতুরসের জাজনগর অভিযানের কথা লিখেছেন। এক্ষেত্রে এই সমসাময়িক ও প্রত্যক্ষদর্শী লেখকেব উক্তিকে গ্রহণ না করে উপায় নেই।

† আমীর খসরু তুগরল খানের নাম উল্লেখ করেন নি। এর থেকে বোঝা যায়, এ গ্রন্থে তুগরলেব নিধনের পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সামন্ত, যিনি বেকতুরসের কাছে পরাজিত হয়ে (সম্ভবত সাময়িকভাবে) বলবনের সামন্ত হন। এর থেকে সন্দেহ থাকে না যে তুগরল "জাজনগর"-এর দিকেই এগিয়ে গিয়েছিলেন।

পঞ্চম পর্ব—তুগরলের পরিণতি।

এই বিষয়টির খুঁটিনাটি ব্যাপারে দুই সূত্রের মধ্যে অমিল থাকলেও এক বিষয়ে মিল আছে যে বলবনের যে সেনানায়ককে বারনি 'বেকতুরস' ও য়াহিআ 'নেকতারস' বলেছেন (এঁকে বখশি নিজামুদ্দীন 'বেগতাবস', ফিরিশতা ও বদাওনী 'বেগ বির্লাস' বলেছেন), তাঁরই প্রচেষ্টায় তুগরল নিহত হন। এ ব্যাপারে বারনিরই বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। য়াহিআর মতে "নেকতাবস" তুগরলকে জীবন্ত বন্দী করেন এবং তাঁর চামড়া ছাড়িয়ে দেহ বলবনকে পাঠান; কিন্তু তুগরল জীবন্ত বন্দী হলে নিঃসন্দেহে তাঁকে বলবনের সামনে নিয়ে আসা হত এবং বলবন তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেন।

এই দুই বিবরণে দনুজ রায়ের সঙ্গে বলবনের সাক্ষাৎকার এবং চুক্তির প্রসঙ্গটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে মিল আছে; তবে তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে এই বর্ণনা অনেক বিস্তারিত; দনুজ রায়ের প্রতিশ্রুতিটি অবশ্য বারনিই বিশদতরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। য়াহিআ জানতেন না দনুজ রায় কোথাকার রাজা, তিনি অজ্ঞতাবশত বলবন ও দনুজ রায়ের সাক্ষাৎকারকে বলবনের লখনৌতি আগমনের আগে স্থাপন করেছেন; বারনি ঠিকই লিখেছেন যে দনুজ রায় সোনারগাঁওয়ের রাজা; পূর্ববঙ্গের রাজা দনুজমাধব (পুরো নাম অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথদেব)-এর একাধিক তাম্রশাসন মিলেছে। কুলজীগ্রন্থেও তাঁর নাম পাওয়া যায়।* এঁর সম্বন্ধে এ বইয়ের 'পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরাজত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। য়াহিআ বিন্ শিরহিন্দী বলবনের সভায় রায় দনুজের আগমন সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য। বারনি ও য়াহিআ দু'জনেই বলেন যে

* কুলজীগ্রন্থগুলিতে তাঁকে দনুজমাধব বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর কুলীন ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে।

কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন (H B II, p. 59 দ্রঃ), "...there is considerable truth in the tradition recorded by the Ghataks of Idilpur that Chandradvip or the modern Barisal district became the seat of an independent Hindu kingdom under one Danuj Rai Kayastha who was, we have strong reasons to believe, the same person as Danuj Rai, the Rai of Sonargaon of the Muslim Historians."

দনুজ রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলবনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেছিলেন; কিন্তু কালিকারঞ্জন কানুনগো মনে করেন "it was the Sultan who sought it." ডঃ আবদুল করিম এক্ষেত্রে কালিকাবাবুর মতকে সমর্থন করেন নি, যদিও তুগরল সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারে তিনি কালিকাবাবুর সঙ্গে একমত। তিনি মনে করেন বলবন ও দনুজ রায় "উভয়ের নিজ নিজ প্রয়োজনেই উভয়ের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।" তুগরলের সঙ্গে হয়ত দনুজের শত্রুতার সম্পর্ক ছিল, তাই তুগরলকে ধরার প্রয়োজন দনুজের থাকতে পারত; কিন্তু আসল প্রয়োজন যে বলবনেরই ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ দনুজ বলবনের সভায় এলে বলবন উঠে দাঁড়াবেন, এই অমর্যাদাজনক শর্তে (যাহিআর বিবরণ অনুযায়ী) বলবন রাজী হয়েছিলেন, দনুজ যদি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতেন, তা হলে কখনই তিনি বলবনের উপর এ রকম শর্ত চাপিয়ে দিতে পারতেন না। বেকতুরস বা নেকতারসের পরামর্শে বলবন যে রকম আত্মপ্রবঞ্চনাকারী ছলনার মধ্য দিয়ে এই শর্ত পালন করলেন, তা'ও হাস্যকর। একে ডঃ আবদুল করিম "সুন্দর সমাধান" বলেছেন। কিন্তু বলবন কোন দিন হাতে বাজপাখি ধরে সভায় বসতেন না, সে দিন বসলেন এবং অন্য কোন সময়ে নয়, দনুজ রায়ের সভায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বলবন উঠে দাঁড়িয়ে বাজপাখিটি ছেড়ে দিলেন, এতে সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই নিশ্চয় বুঝেছিল আসল ব্যাপারটা কী।* বেকতুরস সুলতানের মন রাখার এবং সম্ভবত নিজের মাথা বাঁচাবার জন্য এই সমাধান বার করেছিলেন, যা আদৌ কোন সমাধান নয়।

দু'টি সূত্রের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আমরা তুগরলের ইতিহাস এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করলাম। তুগরলের চরিত্র সম্বন্ধেও এর থেকে একটা ধারণা করা যায়। তিনি দুঃসাহসী প্রকৃতির লোক ছিলেন,

এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল (অথচ ডঃ আবদুল করিম এর উপর আস্থা স্থাপন করেছেন)। চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম দনুজমর্দন (দনুজমাধব নয়), একথা ইদিলপুরের ঘটকদের লেখা কুলজীগ্রন্থ ও অন্যান্য কুলজীগ্রন্থে পরিষ্কার লেখা আছে, ইনি অনেক পরবর্তী কালের লোক; এর সম্বন্ধে আমি বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর বইয়ে (৩য় সং, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ১৩০-১৩৪ ও পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৪২-৩৩৩ দ্রষ্টব্য) আলোচনা করেছি।

* তারা হয়ত এ'ও মনে করেছিল যে বাজপাখি ছাড়ার মধ্য দিয়ে দনুজ রায়কে একটা বিশেষ সম্মান জানানো হল।

তা না হলে বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন না। তিনি ভাল যোদ্ধাও ছিলেন, দু'বার বলবনের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করার মধ্যে তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আর কোন প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করা কঠিন। বহু লোককে, এমন কি বলবনের পক্ষের অনেক সৈন্যকেও তিনি দলে টানতে পেরেছিলেন, তার কারণ (১) তাঁর অকাতর অর্থদান এবং (২) বলবনের কঠোরতার তুলনায় তাঁর বিপরীতধর্মী স্বভাব।* প্রথমটি সম্বন্ধে বলা যায়, ঘুস দিয়ে লোককে হাত করার নিদর্শন আধুনিক কালেও পাওয়া যায়, এই পথ অবলম্বন করার জন্য তুগরল নিন্দা লাভেরই যোগ্য। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায় বলবন অত্যাচারী লোক ছিলেন না, তিনি যে দযালু ছিলেন—তার বহু প্রমাণ মীনহাজ-ই-সিরাজ থেকে সুরু করে ইব্‌ন্ বতুতা পর্যন্ত অনেক লেখকই দিয়েছেন। তিনটি বিষয় বলবন সহ্য করতে পারতেন না—(ক) তাঁর কর্তৃত্বের অস্বীকার, (খ) দুর্নীতি এবং (গ) যৌন ব্যভিচার ও নেশাভাঙ করা। এই তিনটি কার্যের কোনটি কেউ করলে তিনি তার প্রতি কঠোর হতেন। কিন্তু এই তিনটির কোনটিতেই লিপ্ত হয় নি, এমন লোক কম ছিল। সুতরাং জনসাধারণের অনেকেই তুগরলের দলে ভিড়েছিল। বারনি তুগরলের নিহত হওয়ার পূর্বাহ্ণে তাঁর শিবিরের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে সেই দুঃসময়েও শিবিরের লোকেরা মদ্যপান ও সঙ্গীতে মশগুল হয়ে ছিল। এইরকম জীবনযাত্রা বলবনের সান্নিধ্যে থাকলে পাওয়া যেত না এবং এই জাতীয় জীবনযাত্রার প্রলোভনেই যে বহু লোক বলবনের পক্ষ ছেড়ে তুগরলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এর জন্য তুগরল কখনই প্রশংসাভাজন হতে পারেন না।

দু'টি যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তুগরলের সমস্ত সাহস ও বীরত্ব যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বলবনের আসার খবর পেয়েই কোনরকম যুদ্ধের চেষ্টা না করে পালিয়ে গেলেন। এক দিকে একজন প্রায় আশী বছর বয়সী বৃদ্ধ সম্রাট (সম্ভবত) কখনও অশ্বারোহণে, কখনও গোযানে, কখনও নৌকায় বিদ্রোহীর পিছু পিছু অক্লান্তভাবে ধাওয়া করছেন শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করে—অপরদিকে

* বারনি লিখেছেন, "তিনি (তুগরল) ছিলেন খুব বেশি উদার, তাই সেখানে (লখনৌতিতে) মহানগরীর (দিল্লীর) যে সমস্ত লোক ছিল, তারা এবং সেখানকার (লখনৌতির) অধিবাসীরা তাঁর প্রতি খুব বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সৈন্য ও নাগরিকেরা বলবনের পীড়নের সব কিছু (ভয়) ঝেড়ে ফেলে আন্তরিকভাবে তুগরলের সঙ্গে যোগ দেয়।"

একজন যুবক শাসনকর্তা চোরের মত পালিয়ে পালিযে বেড়াচ্ছেন। তুগরলের যেরকম জনপ্রিয়তা ছিল বলে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো ও ডঃ আবদুল করিম অনুমান করেছেন, সেরকম জনপ্রিয়তার অধিকারী হলে তুগরল গেরিলা-পদ্ধতিতে বলবনের সৈন্যবাহিনীকে (যাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিযেছিল বলে বারনি লিখেছেন*) আক্রমণ করে উদ্‌ব্যস্ত করে তুললেন না কেন ? এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা তো তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল না। বারনির বিবরণে দেখি, মালিক শের-আন্দাজ ও তাঁব কয়েকজন সঙ্গী শিবিরে ঢুকে হাঁক-ডাক করার সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল বলবনেব পুরো বাহিনী এসেছে মনে করে রান্নাঘরের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেলেন , এ'ও তাঁর পক্ষে চরম অগৌরবের। তুগবল লক্ষ্মণসেনের মত আচমকা শত্রুসৈন্য-পরিবৃত হয়ে পড়েন নি। শের আন্দাজদেব প্রবেশের সময়ে তুগরল একটু আড়ালেই ছিলেন—তিনি ধৈর্য না হারিযে একটু নজর করলেই দেখতে পেতেন যে পুরো বাহিনী নয়, মাত্র কয়েক জন লোক এসেছে। আর পুরো বাহিনী এসেছে ধরে নিয়েও তিনি পালালেন কেন ? তাঁর সৈন্যসামন্ত হাতের কাছেই ছিল, তাদের একত্র সমবেত কবে মরিয়া হযে শেষ যুদ্ধ করাই উচিত ছিল। তুগরল তাঁর লোকজন, এমন কি তাঁব পুত্রকন্যাদেরও ফেলে পালালেন, কিন্তু তাঁর লোকজন তাঁর প্রতি আনুগত্য ত্যাগ কবে নি , বলবনের বাহিনী এসেছে ধরে নিয়েও তারা নিজেদের বিপদ তুচ্ছ করে তুগরলেব খোঁজ করছিল। সুতরাং শেষ মুহূর্তে তুগরল চরম কাপুরুষতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিপদ যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে জেনেও তুগরল যেভাবে শিবিরের মধ্যে আমোদপ্রমোদ চালু রেখেছিলেন, তাও তাঁব অপদার্থতার পবিচয় দেয়। বলবনের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়িযেও তিনি উপযুক্ত গুপ্তচরবাহিনী গড়ে তুলতে

* বারনি লিখেছেন, "সুলতান অনেকবাবই তাঁব সৈন্যদের প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'তুগবলকে ধরবার জন্য আমি অর্ধেক দিল্লী সাম্রাজ্য নিযে জুয়া খেলছি , সে যদি সমুদ্রে বসে থাকে, তা হলেও তাকে আমি ধরব। তাব এবং তাব সহকারীদেব রক্তপাত না কবে আমি দিল্লীর দিকে ফিরব না, এমন কি দিল্লীর নামও উচ্চারণ করব না।' সৈন্যবিভাগের লোকরা যারা সুলতানের মেজাজ জানত এবং তাঁর ইচ্ছার গুরুত্ব বুঝত—বাড়ি ফেরার আশা ত্যাগ করল , বহু লোক বাড়িতে তাদের শেষ ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখল। দিল্লীর লোকরা এবং (বাংলার) শিবিরের লোকরা বন্ধুবিচ্ছেদে পীড়িত ও বিরক্ত হল। উভয় পক্ষ থেকেই শস্য-বিক্রেতা এবং সংবাদবাহকদের মারফৎ বিচ্ছেদবেদনার চিঠি চালাচালি হতে লাগল।"

পারেন নি। শেষ সময়ের (বারনি প্রদত্ত) বর্ণনাতেও দেখি বলবন কোথায় আছেন, বেকতুরস্ কোথায় আছেন, শের-আন্দাজ ও তাঁর সঙ্গীরা কোথায় আছেন, এ সম্বন্ধে তুগরলের কোন ধারণাই ছিল না। বলবন স্বয়ং আসছেন, এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুগরলের সব দক্ষতা উবে গিয়েছিল। বলবনকে তিনি যমের মত ভয় করতেন। এত ভয় যাঁর, তাঁর বলবনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত হয় নি।

ডঃ কানুনগো ও ডঃ করিম মনে করেন যে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সবাই তুগরলের পক্ষে ছিল। কিন্তু হিন্দুদের তুগরলের পক্ষে থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বারনি লিখেছেন, তুগরল কয়েকটি অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। নিশ্চয়ই বিভিন্ন হিন্দু রাজ্যে হানা দিয়ে তিনি এই সাফল্য লাভ করেন। একটি হিন্দু রাজ্যে (জাজনগরে) হানা দিয়ে তিনি লুঠপাট করেছিলেন এবং আর একটি হিন্দু রাজ্যের (সোনারগাঁও) রাজা তুগরলের শত্রু ছিলেন। সুতরাং লখনৌতি-রাজ্যের হিন্দুদের তুগরলের প্রতি অনুকূল-ভাবাপন্ন না হওয়ারই কথা। বাংলার হিন্দুদের বলবন সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, তার ফলে বলবনের কঠোরতার জন্যে তাদের তুগরলের সমর্থক হবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তুগরলের অর্থদান সম্ভবত মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; বারনি লিখেছেন যে তিনি একবার পাঁচ মণ সোনা দান করেছিলেন দরবেশদের একটি খানকাহ্ চালাবার জন্য। সুতরাং অর্থের জন্যও হিন্দুদের তুগরলের পক্ষ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এটা ঠিক যে তুগরলের প্রেরিত বলবনের প্রথম সৈন্যবাহিনী যখন তুগরলের কাছে পরাস্ত হয়, তখন তাদের পলায়নের সময়ে (বারনির উক্তি অনুসারে) হিন্দুরা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। কিন্তু এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল অযোধ্যার পূর্ব দিকে কোন জায়গায়; এখানকার হিন্দুরা বোধহয় তুগরলের "প্রজা" ছিল না। মুসলমান সৈন্যেরা যুদ্ধে হেরে পালাচ্ছে, সুযোগ পেয়ে স্থানীয় হিন্দুরা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে নিজেদের জাতক্রোধ চরিতার্থ করছে—এর দ্বারা তুগরলের প্রতি তাদের টান প্রমাণিত হয় না।

আসলে, হিন্দুরা তুগরলের দলে ভিড়েছিল—এ কথাটা কালিকারঞ্জন কানুনগোর কল্পনার সৃষ্টি। এ কল্পনা বোধহয় তিনি করেছেন একটি ভ্রান্ত ধারণা থেকে; সেটি এই যে, তুগরল ত্রিপুরার হিন্দু রাজপুত্র রত্ন-ফাকে ত্রিপুরার রাজা

হতে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁকে 'মাণিক্য' উপাধি দিয়েছিলেন, (HB II, p. 59 দ্রঃ) ; কিন্তু 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর বইয়ে (৩য় সং, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ 21-24) আমি দেখিয়েছি যে রত্ন-ফার সাহায্যকারী ও উপাধিদাতা পঞ্চদশ শতাব্দীর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ।

ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে বলবন শুধুমাত্র একজন বিদ্রোহী তুগরলের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি, সারা বাংলার বিরুদ্ধেই তাঁকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কী দেখলাম ? বলবন বাংলায় এসে কোথাও বাধা পেলেন না। এই কি সারা বাংলার বলবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নমুনা ?

মোটের উপর, তুগরলের যে সমস্ত প্রশংসোক্তি কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বিশেষ কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। আমার বিবেচনায় তুগরল একজন সাধারণ বিদ্রোহী মাত্র ছিলেন এবং তাঁর যতটা স্পর্ধা ও উচ্চাশা ছিল, ততটা সামর্থ্য ছিল না। তাই তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, প্রাণও যায়।

এখন, তুগরলের বিদ্রোহের সূচনা এবং সেই বিদ্রোহ দমন করে বলবনের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কত সময় ব্যয়িত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

কালিকারঞ্জন কানুনগো মনে করেন, ৬৮২ হিজরা বা ১২৮৩-৮৪ খ্রীঃ-র মধ্যেই বলবন দিল্লীতে ফিরেছিলেন, কারণ "At Garh-Mukteswar (U. P.), a mosque was built during the governorship of Bekturs as-Sultani in the middle of Rabi'l 682 A. H." (H B II, p. 62, f.n.)। ডঃ কানুনগোর মতে এই বেকতুরসই তুগরলকে ধরার ব্যাপারে নেতৃত্ব করেছিলেন ; সুতরাং ৬৮২ হিঃ-র রবী উল-আউয়লের অর্থাৎ ১২৮৩ খ্রীঃ-র জুন মাসের আগেই বলবনের বঙ্গাভিযান শেষ হয়েছিল ও বেকতুরস গড়-মুক্তেশ্বর অঞ্চলে তাঁর নতুন কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

ডঃ কানুনগোর অনুমান নির্ভুল। আমীর খসরুর 'ফতেহ্ নামা' (পৃঃ ৮৫তে বইটির কথা বলা হয়েছে) থেকে এর সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা পেয়েছি ; আগেই আমরা বলেছি যে, এই বইতে আমীর খসরু বলবনের বাহিনী ৬৮০ হিজরার ৫ই শওয়াল তারিখে (১২৮১ খ্রীঃ) দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে—এই কথা লিখেছেন (A. B. M. Habibullah, Foundation of Muslim Rule in India,

2nd ed., p. 185)। এ উক্তি প্রামাণিক। বারনি লিখেছেন যে এই অভিযান উপলক্ষে বলবন তিন বছর দিল্লীর বাইরে ছিলেন। সুতরাং এই অভিযান ৬৭৭ হিজরায় সুরু এবং ৬৮০ হিজরায় শেষ হয়।

বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ

তুগরল খান নিহত হবার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে বারনির 'তারিখ ই-ফিরোজ শাহী'তে যা লেখা আছে—তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

তুগরলের নিধনের পরে বলবন লখনৌতিতে ফিরে এলেন। তাঁর আদেশে এক ক্রোশেরও বেশি দীর্ঘ লখনৌতির বাজারে সারি সারি ফাঁসিকাঠ পোঁতা হল, তাতে তুগরলের ছেলে, জামাই, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনানায়ক, দেহরক্ষী, বর্মবাহক, পাইক, প্রিয়ভৃত্য--সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হল।

একজন ফকীরকে তুগরল অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁকে ও তাঁর সমস্ত অনুবর্তীকে ফাঁসি দেওয়া হল। দু'তিন দিন ধরে এই নিষ্ঠুর শাস্তিদান চলল, যারা এই দৃশ্য দেখল তারা ভয়ে মারা যাওয়ার মত হল। এ রকম শাস্তির কথা কেউ কোন দিন শোনে নি। তুগরলের সহায়কদের মধ্যে যারা দিল্লীর অধিবাসী, তাদের দিল্লীতে ফাঁসি দেবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হল।

বলবনের এই নিষ্ঠুরতা অমার্জনীয়। এ সম্বন্ধে আগে আমরা যা বলেছি, তার পুনরুক্তি করছি। তিনি দয়ালু ছিলেন, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব কেউ অস্বীকার করলে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। এই কারণেই তুগরলের স্থানীয় অনুবর্তীদের তিনি নিষ্ঠুরভাবে বধ করলেন। কিন্তু দিল্লীতে যাদের ফাঁসি দেওয়ার কথা ছিল, তারা তাঁর দয়া পেল এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশই বিনা শাস্তিতে ও অন্যেরা খুব লঘু শাস্তি পেয়ে মুক্তি লাভ করল কারণ দিল্লীর কাজী বলবনের পায়ে ধরে তাদের জন্য অনুনয় করেছিলেন।

বারনি লিখেছেন যে, এর পর বলবন আরও কিছুদিন লখনৌতিতে রইলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খানকে এই রাজ্যের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করলেন; তাঁকে তিনি রাজছত্র, দূরবাস (লাঠি) এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। সমস্ত রাজকর্মচারী ও জায়গীরদারের নিয়োগ বলবন নিজেই করে দিলেন। হাতী ও সোনা ছাড়া তুগরল খানের শিবির থেকে লুঠ করা সব সম্পত্তিই বলবন বুগরা খানকে দিলেন। অতঃপর তিনি বুগরা

খানকে বলেন যে তিনি যেন 'দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ্' (অর্থাৎ তখনও হিন্দুদের দ্ব রা অধিকৃত পূর্ববঙ্গের অঞ্চলগুলি) জয়ের চেষ্টা করেন। তিনি লখনৌতির বাজারে বিদ্রোহীদের কী ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়েছেন, সে কথা বুগরা খানকে মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে অসং ও মংলববাজ লোকরা যদি তাঁকে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করার পরামর্শ দেয়, তাহলে তিনি যেন লখনৌতির বাজারের এই শাস্তিদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি এব পরও বুগরা খানকে কিছু উপদেশ দেন। এর পর সুলতান দিল্লীর দিকে রওনা হন ; বুগরা খান কিছু দূর তাঁর সঙ্গে যান। বুগরা খানেব বিদায় নেবার সময বলবন বুগরা খানকে তাঁর দবীর (কেরাণী)-কে ডেকে আনতে বলেন। বুগরা তাঁর দবীর শামসুদ্দীনকে নিয়ে ফিরে এলে বলবন তাঁদের বসতে বলেন , এরপর তিনি কিছু উপদেশ দেন, শামস দবীর তা লিপিবদ্ধ করেন ; উপদেশগুলি এই—লখনৌতি-শাসন-কর্তা যেন দিল্লীশ্বরের কর্তৃত্ব মেনে চলেন,* তাঁর কখনও বেশি বা কম কর সংগ্রহ কবা উচিত নয়, জ্ঞানী ও হিতৈষী ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুসারে তাঁর চলা কর্তব্য, তিনি যেন নির্লোভ ও নিঃস্বার্থভাবে বিচার করেন, সৈন্যদের ভাল মাইনে দেন, তাদের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন ও তাদের সম্বন্ধে চরম পন্থা অবলম্বন না করেন এবং ঈশ্বরগতপ্রাণ কোন সন্ন্যাসীর উপর যেন তিনি নির্ভর করেন। উপদেশগুলি দেবার পর বলবন অনুগত লোকদের বলেন যে এই পুত্রকে তিনি যে উপদেশই দিন না কেন, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে সে সবই উপেক্ষা করবে, তবু পিতৃস্নেহের অনুরোধে তিনি এই সব উপদেশ দিচ্ছেন।

অতঃপর তিনি বুগরা খানকে সম্মান-পরিচ্ছদ দান করে, আলিঙ্গন করে এবং অশ্রুবর্ষণ করে বিদায় দিলেন। অতঃপর বলবন দিল্লীর দিকে রওনা হন , দিল্লীর কোন লোক বাংলায় থেকে যাবে অথবা বাংলার কোন লোক দিল্লীতে যাবে, বলবন এটা চাইতেন না। বিনা অনুমতিতে যাতে কেউ এরকম না করে, সে সম্বন্ধে তিনি এক নির্দেশ জারী করেন।

বারনি লিখেছেন যে, বলবন বুগরা খানকে বলেছিলেন, "হিন্দ, সিন্ধু, মালব,

* বলবন নাকি বুগরা খানকে বলেছিলেন যে দিল্লীশ্বর লখনৌতিতে এলে শাসনকর্তার দূরে চলে যাওয়া এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করলে লখনৌতিতে ফিরে এসে সরকার চালানো উচিত। কেন ? দিল্লীশ্বর লখনৌতিতে এলে তাঁর কি শাসনকর্তার সাহায্য নেবার দরকার পড়বে না ?

গুজরাট, লখনৌতি, সোনারগাঁও—যে কোন জায়গায় শাসনকর্তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তার পরিণতি তুগরলের মত হবে।" এর থেকে ড এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ মনে করেছেন ইতিমধ্যে সোনারগাঁও বলবনের অধিকারে এসেছিল। কিন্তু এই মত মানা কঠিন, কারণ এর অল্প কিছু আগে সোনারগাঁওযের স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজ রায়ের সঙ্গে বলবনের সাক্ষাৎকার ও চুক্তি হয়েছিল। বারনির বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে বলবন 'সোনারগাঁও' বলতে পূর্ববঙ্গের যে অঞ্চল আগেই মুসলমানরা জয় করেছিলেন (এবং যা তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল), তাকেই বুঝিযেছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থ ইসামীর 'ফুতুহ্-উস্-'সলাতীন' গ্রন্থের মতে বলবন বুগরা খানকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য দু'জন রাজপুরুষকে রেখে যান , দু'জনের নামই ফিরোজ , "একজন খলজী, তিনি 'ফরখোন্দারায়' বা উত্তম বিবেচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন , অপরজন কোহ-ই-জুদের অধিবাসী, তিনি 'কিশওর-কোশা' বা রাজ্য-বিজয়ীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।" এই সব দক্ষ সাহায্যকারীকে পাওয়ার ফলে বুগরা খানের শাসনকার্য ভালই চলে, কিন্তু তিনি নিজে সম্ভবত ভোগবিলাসেই মত্ত থাকতেন।

বারনির 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী' থেকে জানা যায়—৬৮৩ হিজরায় বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। শোকার্ত বলবন তখন বুগরা খানকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান এবং তাঁর কাছে থাকতে ও তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসতে বলেন। বুগরা খান দিল্লীতে দু'তিন মাস থাকেন, কিন্তু সম্ভবত কঠোর সংযমী বলবনের প্রাসাদে ভোগ বিলাসের কোন উপকরণ না পেয়ে তিনি হতাশ হন। ইতিমধ্যে বলবনের অবস্থার উন্নতি হয়, তখন বুগরা খান বোধ হয় এইরকম কৃচ্ছ্রসাধন করে দীর্ঘকাল দিল্লীতে কাটাতে অনিচ্ছুক হযে একদিন পিতার অনুমতি না নিয়েই বাংলার দিকে রওনা হন। তিনি লখনৌতিতে পৌঁছোবার আগেই বলবনের অবস্থা আবার খারাপ হতে থাকে। বলবন বুগরার আচরণে খুবই হতাশ হন। তিনি মুহম্মদের পুত্র কায়খসরুকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। ৬৮৬ হিজরায় বলবন পরলোকগমন করলেন। তাঁর মৎলববাজ উজীর নিজামুদ্দীন তাঁর মনোনয়ন না মেনে বুগরা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৮ বছর বয়সী কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসালেন। 'ফুতুহ-উস্-সলাতীন'-এর মতে বুগরা খান পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে

সাত দিন শোক পালনের পর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ নাম নিলেন। বারনির গ্রন্থেও তাঁর স্বাধীন হওয়া ও নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ নাম নেওয়ার কথা আছে। ঐ বইতে লেখা আছে যে বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন নিজের নামে মুদ্রা জারী করেন ও খুৎবা পাঠ করান। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীনের নবাবিষ্কৃত মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়। বারনির বিবরণে দেখা যায় যে, নিজামুদ্দীনের কুপরামর্শে কায়কোবাদ—যিনি বলবন কর্তৃক শুচিতাপূর্ণ পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন -পুরোনো দিল্লীর কাছে কিলোখারিতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে বিলাসব্যসনে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁরই পরামর্শে কায়কোবাদ কায়খসরুকে হত্যা করান, বলবনের পুরোনো ভৃত্যদের পদচ্যুত বা বধ করেন এবং আরও নানা কুকর্মে লিপ্ত হন। বুগরা খান লখনৌতি থেকে তাঁকে অনেক পত্র লিখে তাঁর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। অবশেষে তিনি পুত্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লীর দিকে রওনা হতে মনস্থ করলেন। বারনি লিখেছেন যে পিতা ও পুত্র অযোধ্যার সরু (সরযূ) নদীর তীর অবধি গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেন—এরকম স্থির হয়। নিজামুদ্দীনের পরামর্শে কায়কোবাদ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে জাঁকজমক সহকারে দিল্লী থেকে রওনা হলেন। বুগরা খানও এ কথা জানতে পেরে অনেক সৈন্য ও হাতী নিয়ে যাত্রা করলেন।

কবি আমীর খসরু কায়কোবাদের সঙ্গে যান এবং বুগরা খান ও কায়কোবাদের বিরোধ ও মিলনের প্রসঙ্গ নিয়ে 'কিরান উস-সদাইন' নামে একটি বই (J. A. S. B. 1860, pp. 225-239 দ্রঃ) লেখেন। এটি যে কাব্য নয়, প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা—তা তিনি স্পষ্টই লিখেছেন। বুগরা খান ও কায়কোবাদের সরযূ-তীরে সাক্ষাৎকারের দু'বছর পরে কায়কোবাদের নির্দেশে এই বই লেখা হয়। আমীর খসরুর বিবরণ পড়লে মনে হয়, বুগরা খান দিল্লীর সিংহাসনের উপর নিজের দাবী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পুত্রের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু পুত্রের মুখোমুখি হবার এবং তাঁকে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার পর তাঁর মতি পরিবর্তিত হয়।

আমীর খসরুর লেখা থেকে জানা যায় যে—শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে এক দিন কায়কোবাদ পিতার বিদ্রোহের কথা জেনে বিচলিত হন। বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীনের বাহিনী স্থল ও জল উভয় পথে অগ্রসর হয়ে অযোধ্যা

প্রদেশ (যত দূর বোঝা যায়, এই প্রদেশের একাংশ) অধিকার করেছিল। কায়কোবাদ শাসনকর্তা ও জায়গীরদারদের ডেকে পাঠিয়ে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে বললেন এবং অনতিবিলম্বেই এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে দিল্লী থেকে রওনা হলেন। যমুনা পার হয়ে জয়পুর নামে একটি স্থানে পৌঁছে কায়-কোবাদ খান জহান বারবককে এক দল সৈন্য দিয়ে "সরু" (সরযূ) নদীর তীরে পাঠালেন। বুগরা খান বারবকের কাছে শাম্‌স্ দবীর নামে এক জন বিশ্বস্ত দূতকে পাঠালেন, উভয় পক্ষে এর পর কিছু আলোচনা ও ভীতি প্রদর্শন হল, কিন্তু কাজ কিছু হল না। ইতিমধ্যে কায়কোবাদ তাঁর বাহিনী নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে অযোধ্যা-প্রদেশে এসে পৌঁছোলেন। সূর্য তখন মিথুন রাশিতে (মে জুন), প্রখর গ্রীষ্মে কায়কোবাদ অযোধ্যা শহরে প্রবেশ করে সরযূর তীরে শিবির সন্নিবেশ করলেন, নদীর অপর পারে তার পিতা শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে পুত্রকে দেখতে পেয়ে পিতার অন্তরে পুত্রের প্রতি স্নেহ জাগ্রত হল, তিনি "পিতার অশ্রু" পুত্রের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এক দূতকে পাঠালেন, কিন্তু গর্বিত কায়কোবাদ একটি তীর ছুঁড়ে দূতকে বিরত করলেন। সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। অতঃপর পিতা সরকারীভাবে একজন দূত প্রেরণ করলেন। সে কায়কোবাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর পিতার বক্তব্য বলল, তাতে কায়কোবাদকে ছেলেমানুষি ও বিবেচনাহীনতার জন্য ভৎসনা করা হয়েছিল এবং পুত্রের কর্তব্য (filial duty) পালন করতে বলা হয়েছিল। কায়কোবাদ উদ্ধতভাবে বললেন যে রাজমুকুট লব্ধ হয় ভাগ্যের দ্বারা, উত্তরাধিকারসূত্রে নয়। তাছাড়া তিনিই পিতামহের মনোনীত ব্যক্তি, সুতরাং সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। এর পর তাঁর পিতা একজন কূটনীতিজ্ঞ দূতকে পাঠালেন, সে যা বলল তার মর্মার্থ এই—বুগরা খানের সৈন্য সংখ্যায় বিপুল, বীরত্বে অতুলনীয়; তাঁর বহু হাতী আছে, সুতরাং কায়কোবাদ তাঁর তুলনায় হীনবল, তাছাড়া কায়কোবাদের পিতামহ তাঁকে সিংহাসন দিয়ে গেলেও তাঁর কর্তব্য হবে প্রকৃত মালিককে (অর্থাৎ বুগরা খানকে) তা ছেড়ে দেওয়া। এর উত্তরে কায়কোবাদ তাঁর শক্তিশালী অশ্বরোহিবাহিনীর কথা বললেন; তবে সেই সঙ্গে তিনি বিনীত ভাবে এ'ও বললেন যে সৈন্যবাহিনীর এত শক্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রভুর (পিতার) ক্ষতি করতে চান না, রুস্তমকে অস্ত্রাঘাত করে সোহরাবের যে পরিণতি হয়েছিল, তা সুবিদিত; তিনি পিতার দাস; পিতা

যদি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তা হলে তিনি তাঁর রাজমুকুট পিতার চরণে নিবেদন করতে রাজী আছেন। এ কথা শুনে পিতার অন্তর পরিবর্তিত হল এবং তিনি দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকারের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। তিনি পুত্রের কাছে আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কায়কোবাদ এর উত্তরে বললেন, "আমার মুকুট চাঁদ অবধি পৌছোলেই বা কী? আমার মাথা আপনার পায়ের নীচে থাকবে।" এই উত্তরে পিতা খুব খুশী হলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কায়কাউসকে উত্তর ও বহুমূল্য উপহার সমেত পাঠালেন। কায়কোবাদ অবিকল তাঁরই মত দেখতে ভাইকে দেখে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সিংহাসনে তাঁর পাশে বসালেন। পর দিন কায়কোবাদ নিজের শিশু পুত্র কায়মুরস্‌কে একজন অভিজ্ঞ উজীরের সঙ্গে দিয়ে পিতার কাছে অনেক উপহার সমেত পাঠালেন। পৌত্রকে দেখে বুগরা খান সিংহাসন থেকে নেমে এলেন এবং তাকে সিংহাসনে তাঁর পাশে রেখে আদর করতে লাগলেন। সাময়িকভাবে তিনি দিল্লীর উজীর ও উপহারের কথা ভুলেই গেলেন, পরে সে দিকে তাঁর নজর পড়লে উজীরের সঙ্গে তিনি কথা বললেন এবং পরের দিন তিনি কায়কোবাদেব সঙ্গে দেখা করবেন স্থির হল।

আমীব খসরু লিখেছেন যে, পরের দিন সন্ধ্যায় বুগরা খান অধৈর্য চিত্ত নিয়ে নৌকায় চড়ে নদী পার হলেন; কায়কোবাদ নদীর কূলে বিহ্বলচিত্তে দাঁড়িয়েছিলেন; তাঁর পিতা নৌকা থেকে নেমে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁদের মধ্যে অনেক প্রীতিভরা কথাবার্তা হল; বহু সভাসদ এই দৃশ্য দেখল, তাদের মধ্যে আমীর খসরুও ছিলেন। এর পর পিতা-পুত্রের আরও কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আমীর খসরু দিয়েছেন; তাদের মধ্যে একটিতে বুগরা খান পুত্রকে কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ (some salutary counsel) দেন এবং কয়েকজন দুষ্ট অমাত্য সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। এর পর পিতা ও পুত্র নিজের নিজের স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই হচ্ছে বুগরা খান ও কায়কোবাদের প্রথমে বিরোধ ও পরে মিলনের প্রকৃত বর্ণনা। বারনি, ইসামি, য়াহিআ বিন শিরহিন্দী প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা এবং আরও পরবর্তীকালের বথশী নিজামুদ্দীন, বদাউনী, ফিরিশতা,. গোলাম হোসেন প্রভৃতি লেখকরা এই ঘটনার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। কিন্তু আমীর খসরু এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

বলে এ সম্বন্ধে তাঁর বিবরণই গ্রহণযোগ্য।* তবে বুগরা খান ও কায়কোবাদের কথোপকথনের যে বিস্তৃত বিবরণ শেষোক্ত লেখকরা দিয়েছেন, তার মধ্যে কতকটা সত্য নিহিত থাকতে পারে। এঁদের মতে বুগরা খান কায়কোবাদকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসৎ আমোদপ্রমোদ থেকে বিরত হতে উপদেশ দেন এবং কায়খসরুকে ও বলবনের প্রিয় ভৃত্যদের হত্যা করার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি প্রকাশ্যে কায়কোবাদকে উজীর নিজামুদ্দীন ও খাস দবীর কিওয়ামুদ্দীনকে খাতির করতে বলেন, কিন্তু বিদায় নেবার সময় তাঁর কানে কানে—এই দু'জনকে প্রথম সুযোগেই হত্যা করতে বলেন। বারনি লিখেছেন যে নিজের শিবিরে ফিরে এসে বুগরা খান বলেছিলেন, "আমি পুত্রকে এবং দিল্লী-সাম্রাজ্যকে বিদায় জ্ঞাপন করে এসেছি, কারণ আমি ভালভাবেই জানি যে আমার পুত্র অথবা দিল্লী সাম্রাজ্য—এদের কোনটিই বেশি দিন টিকবে না।"†

পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বুগরা খান অযোধ্যা প্রদেশ ছেড়ে দেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। আসলে অযোধ্যার বৃহদংশ বরাবরই দিল্লীর সুলতানের অধীন ছিল, বুগরা খান যুদ্ধযাত্রা করে সরযূ নদীর তীর অবধি অগ্রসর হয়েছিলেন। পুত্রের সঙ্গে মধুর মিলনের পর এই জোর করে অধিকার করা অংশ তিনি ধরে রাখবেন না, এটাই স্বাভাবিক।

বিহার ও লখনৌতি-রাজ্য এর পর বুগরা খানের হাতেই রইল; তিনি স্বাধীনভাবেই এই সব অঞ্চল শাসন করতে লাগলেন। কায়কোবাদ দিল্লীতে ফিরে কয়েক দিন সংযম পালন করলেন, কিন্তু তারপর আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন। তিনি দিল্লীতে ফেরার কিছুকাল পরে তাঁর লোকরা নিজামুদ্দীনকে বিষ খাইয়ে বধ করে। কিন্তু তাঁর প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন ফিরোজ খলজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন। ৬৮৯ হিজরায় কায়কোবাদ জলালুদ্দীনের আদেশে নিহত হলেন। তাঁর শিশুপুত্র কায়মুরস্ বন্দী অবস্থায় মারা গেলেন। এ দিকে ৬৮৯ হিজরা থেকেই লখনৌতি-রাজ্য ও বিহারে যে বুগরা খানের অপর

---

* ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো (H. B. II, pp. 72-73 দ্রঃ) আমীর খসরুর প্রামাণিক বিবরণের সঙ্গে পরবর্তী লেখকদের বিবরণগুলিকে একত্র মিশিয়ে ফেলেছেন।

† পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে কায়কোবাদের সভায় বুগরা খানের গমন, যাওয়ার সময় তিনবার ভূমি চুম্বন করা, সিংহাসনে উপবিষ্ট কায়কোবাদের সামনে বুগরা খানের হাত জোড় করে দাঁড়ানো প্রভৃতি যে সব কথা লেখা আছে—সেগুলি অমূলক।

পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্ব সুরু হয়, তা মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো ও ডঃ আবদুল করিম মনে করেন যে কায়কোবাদের মৃত্যুর পরে বুগরা খান সিংহাসন ত্যাগ করেন, অপর দিকে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে দিল্লীর খলজী সুলতানদের ভয়ে বুগরা খান সিংহাসন ত্যাগ করেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, বুগরা খান সিংহাসন ত্যাগ করেন নি—বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে তিনি মারা যান এবং কায়কাউস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ বাংলার মুসলমান আমলের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় চিত্তাকর্ষক চরিত্র। যেভাবে তিনি দিল্লীর সিংহাসন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন, যেভাবে তিনি নিজে চরম বিলাসী হয়েও পুত্রকে বিলাসব্যসন থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন, যেভাবে তিনি পুত্রের কাছ থেকে দিল্লীর সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার জন্য রওনা হয়ে শেষ পর্যন্ত পুত্রস্নেহের বন্যায় ভেসে যান—এ সমস্তই আমাদের মনে তাঁর প্রতি কৌতুকমিশ্রিত অনুরাগ জাগ্রত করে। তবে বুগরা খান বিলাসী হলেও বোধ হয় তাঁর পুত্রের মত অতটা উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না এবং শাসনকার্যে ষোল আনা মন না দিলেও একেবারে অবহেলা করতেন না। তার প্রমাণ, তিনি যতখানি অঞ্চল তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাঁর রাজ্যে কোন বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল বলেও জানা যায় না।

বুগরা খান ও কায়কোবাদের সরযূতীরে মিলনের কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক হলেও বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। যতদূর বোঝা যায়, কায়কোবাদের পিতা এবং বলবনের পুত্র হিসাবে বুগরা খান কায়কোবাদের অধঃপতনের সংবাদে এবং দিল্লীর সিংহাসন থেকে বলবনী বংশের আসন্ন চ্যুতির আশঙ্কায় বিচলিত বোধ করেছিলেন, তারই পরিণতি হিসাবে এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এই ঘটনার আগে বাংলার সুলতান হিসাবে বুগরা খানের মর্যাদা যা ছিল, পরেও তাই থেকে গেল। কায়কোবাদ বা তাঁর দুষ্ট মন্ত্রী নিজামুদ্দীন—কেউই বাংলার সুলতান হিসাবে বুগরা খানের মর্যাদা খর্ব করার বা তাঁর উপর দিল্লীর শাসন চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি; পিতা-পুত্রের মিলনের স্থানটিও বাংলা থেকে বহু দূরে অযোধ্যায় অবস্থিত। কাজেই বাংলার ইতিহাসে এই ঘটনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবী করতে পারে না।

বুগরা খানের একটি মুদ্রা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পরিমল রায় সংগ্রহ করেছেন। তার বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নি।

রুকনুদ্দীন কায়কাউস

বুগরা খানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রুকনুদ্দীন কায়কাউসের নাম 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' (বারনি) থেকে সুরু করে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'—কোন ইতিহাসগ্রন্থেই পাওয়া যায় না। অবশ্য আমীর খসরুর 'কিরান-ই-সদাইনে' কায়কাউসের নাম মেলে বুগরা খানের দ্বিতীয় পুত্র হিসাবে—তখনও তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নি।

কায়কাউসের ৬৯০ থেকে ৬৯৮ হিঃ অবধি বছরগুলির প্রায় সমস্ত বছরের মুদ্রা এবং ৬৯২, ৬৯৭ ও ৬৯৮ হিজরায় উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলি লখনৌতির টাকশালে এবং শিলালিপিগুলি মুঙ্গের, দিনাজপুর, বগুড়া ও হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ হয়েছিল; তাঁর কোন কোন মুদ্রায় লেখা আছে সেগুলি "বঙ্গের রাজস্ব থেকে প্রস্তুত"। এর থেকে বোঝা যায়—বিহার, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকখানি অঞ্চল কায়কাউসের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং 'বঙ্গ' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের কিছু অঞ্চল তাঁর রাজত্বকালে বিজিত হয়। (এ সম্বন্ধে সপ্তম পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করেছি)। তিনি যে অন্তত ৬৯০ থেকে ৬৯৮ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, তা'ও মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়।

শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য থেকে আরও বোঝা যায় যে, বিহারের যে অংশে কায়কাউসের অধিকার ছিল—তাতে শাসনকর্তা ছিলেন ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ ইতগীন এবং লখনৌতি-অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন শহাবুদ্দীন জাফর খান বাহরাম ইতগীন। ত্রিবেণী অঞ্চলে ব্যাপক প্রবাদ আছে যে জাফর খান গাজী ঐ অঞ্চলের প্রথম মুসলমান বিজেতা। এই প্রবাদ সত্য এবং উপরে উক্ত জাফর খান বাহরাম ইতগীনই যে ঐ জাফর খান গাজী—তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—কায়কাউসের রাজত্বকালেই ত্রিবেণী প্রথম মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়।

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, কায়কাউসকে রাজাধিরাজ, তুর্কী ও পারসিক রাজাদের সম্রাট এবং তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তা ফিরোজ

ইতগীনকে খানদের খান, প্রাচ্য ও চীনের খান, দ্বিতীয় সিকান্দর প্রভৃতি ও জাফর খান ইতগীনকে দ্বিতীয় সিকান্দর বলা হয়েছে। ডঃ আবদুল করিম মনে করেন যে "দিল্লীর খলজী সুলতানকে উপেক্ষা করার ইঙ্গিত স্বরূপ" এঁরা এইসব উচ্চ উপাধি নিয়েছেন। আসলে—বলবনের পৌত্র ও কায়কোবাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে এবং বলবনী বংশের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি হিসাবে কায়-কাউস নিশ্চয়ই নিজেকে de jure ভারতসম্রাট বলে দাবী করতেন। কায়কাউস এবং তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তাদের ঐ সব উপাধি ঐ দাবীরই পরিচায়ক।

কায়কাউসের সমসাময়িক দিল্লীর খলজী সুলতান জলালুদ্দীন খলজী ও আলাউদ্দীন খলজী কোনদিন বাংলা ও বিহার জয় করতে পারেন নি। বারনি 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন, জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে আলাউদ্দীন ৬৯৫ হিজরায় লখনৌতি অভিযানের সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত করেন।

বাংলার সুলতানকে এবং এ দেশকে দিল্লীর খলজী সুলতানরা বিদ্বেষের চোখে দেখতেন বলে মনে হয়। খলজী সুলতানরা পূর্ব ভারতের কোন অঞ্চলই জয় করতে পারেন নি।

জিয়াউদ্দীন বারনি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিবোজ শাহী'তে লিখেছেন, "(জলালুদ্দীন খলজীর) রাজত্বকালে শহরে (দিল্লীতে) কয়েকজন ঠগ ধরা পড়ে; ঐ দলের একজনের মাধ্যমে প্রায় এক হাজার (ঠগ)-কে বন্দী করা হল। কিন্তু সুলতান তাদের একজনকেও বধ করলেন না। তিনি আদেশ দিলেন যে তাদের নৌকায় করে নীচের দেশে লখনৌতির সন্নিকটে নিয়ে যাওয়া হোক। সেখানেই তারা ছাড়া পাবে। তাহলে ঠগেরা লখনৌতি অঞ্চলে বাস করবে এবং (দিল্লীর) আশপাশে আর উপদ্রব করবে না।" বারনি জলালুদ্দীনের দয়ালুতা এবং দুর্বলতার নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন—কিন্তু মনে হয়, ঠগেরা শত্রু-দেশ বাংলার লোকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, এই বাসনা করেই জলালুদ্দীন খলজী তাদের বাংলায় পাঠিয়ে দেন। তখন বাংলার সুলতান কায়কাউস।

কায়কাউসের রাজত্ব ৭০১ হিঃ বা ১৩০১ খ্রীঃর মধ্যে শেষ হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কায়কোবাদের বয়স ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় ছিল ১৮ বছর। কায়কাউস তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই এবং মাত্র কয়েক মাসের ছোট ছিলেন

বলেও যদি ধরি, তা হলেও ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে কায়কাউসের বয়স ৩২ বছরের বেশি হয় না। সুতরাং কায়কাউস অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন বা সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন।

কায়কাউসের ৬৯৮ হিঃ অবধি রাজত্ব করার প্রমাণ মেলে ঐ বছরে উৎকীর্ণ তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে। ৬৯৮ থেকে ৭০১ হিঃর মধ্যেই তাঁর রাজত্ব শেষ হয়, কারণ ৭০১ হিঃ থেকে পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে ৭০০ হিজরায় উৎকীর্ণ এক শিলালিপি পাওয়া গেছে, এতে সুলতান হিসাবে কারও নাম নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ

এখন যে রাজার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি—তিনি ঐতিহাসিকদের কাছে এক বিরাট প্রহেলিকা। তিনি ছিলেন এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গেব এক বিরাট অঞ্চলে তাঁরই আমলে মুসলিম অধিকার প্রসারিত হয়। বিহারের এক বিশাল অঞ্চলও তাঁর অধীনে ছিল, পূর্ববর্তী সুলতানদের অধিকৃত বাংলার অঞ্চলগুলির তো কথাই নেই। ইনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতান। এঁর রাজত্বকালও সুদীর্ঘ। অথচ এই অসাধারণ রাজার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এঁর বংশপরিচয়ও অজ্ঞাত। কিছু মুদ্রা, কয়েকটি শিলালিপি ও দু'একটি সূত্রে বিচ্ছিন্ন উল্লেখ ভিন্ন এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করার মত সূত্র প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নি। কোন ইতিহাসগ্রন্থেও এঁর নাম উল্লিখিত হয় নি। এই রহস্যময় সুলতানের নাম শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ।

যাহোক, সূত্রের অভাব ঐতিহাসিকদের নিরস্ত করতে পারে নি। অসীম অধ্যবসায় সহকারে তাঁরা সযত্নে তিল তিল করে উপকরণ আহরণ করে এই সুলতানের ইতিহাসের একটা কাঠামো গড়ে তুলেছেন। আমরাও সে চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে একটা কথা বলা দরকার। প্রায়-সমসাময়িক দুটি সূত্রে এঁর বিচ্ছিন্ন উল্লেখ মিলেছে। এদের মধ্যে একটি হ'ল ইব্‌ন্ বতুতার রেহ্‌লা বা ভ্রমণ-কাহিনী। অপরটি চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত দরবেশ শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ 'মলফুজৎ'। শেষোক্ত সূত্রটি অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে এর থেকে কিছু তথ্যও আহরণ করেন। কিন্তু এই সূত্রটি এ পর্যন্ত বিশেষ কোন গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় নি। যাহোক্, এখন আমরা আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

প্রথমে আলোচ্য, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজ্যের সীমা। রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্বতন সুলতানদের দ্বারা অধিকৃত উত্তর

ও পশ্চিম বঙ্গের অঞ্চলগুলি, তাছাড়া বিহারের কিছু অংশ। সাতগাঁও তাঁর আমলেই বিজিত হয় এবং বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) অধিকারও তাঁর আমলে সুরু হয়। সাতগাঁও অঞ্চল যে পরিপূর্ণভাবে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের অধীনে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নাম সংবলিত ত্রিবেণীর এক শিলালিপি থেকে, এতে খান জাহান জাফর খানের আদেশে ৭১৩ হিজরায় একটি মাদ্রাসাহ্ স্থাপনেব উল্লেখ আছে। লখনৌতি, সোনারগাঁও (ঢাকা জেলা) ও "বঙ্গ"-এর টাকশালে উৎকীর্ণ ফিরোজ শাহের মুদ্রা পাওয়া গেছে। গিয়াসপুর (ময়মনসিংহ জেলা) থেকে তাঁরই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের মুদ্রা পাওয়া গেছে (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। বিহারেও তাঁর রাজত্বকালে উৎকীর্ণ তাঁর নামাঙ্কিত ৭০৯ ও ৭১৫ হিজরার দুটি শিলালিপি মিলেছে ; দুটিরই নির্মাতা তাঁর পুত্র হাতেম খান। সিলেটও শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহেব রাজত্বকালে ৭০৩ হিজরায় বিজিত হয বলে একটি শিলালিপিতে লেখা আছে (পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এব থেকেই বোঝা যাবে, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজ্যের আয়তন কত বিরাট ছিল।

অতঃপর আমরা আলোচনা করব, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহেব সঙ্গে তাঁর পুত্রদের কী সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে। ফিরোজ শাহেব পুত্র হিসাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে ছ'টি নাম পাওয়া যায়। সেগুলি হ'ল :

(১) শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ,
(২) জলালুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ,
(৩) গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ,
(৪) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ,
(৫) তাজুদ্দীন হাতেম খান,
(৬) কুৎলু খান বা কুৎলুগ খান।

এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন নিজেদের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন। শিহাবুদ্দীন ও জলালুদ্দীন পিতার জীবদ্দশায়, গিয়াসুদ্দীন পিতার বর্তমান ও অবর্তমান দু'সময়েই এবং নাসিরুদ্দীন পিতার মৃত্যুর পরে মুদ্রা জারী করেছিলেন (JNSI, Dec. 1978, pp. 58-67 দ্রষ্টব্য)। শিহাবুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীনের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতেও মেলে। তাজুদ্দীন হাতেম খান পিতার অধীনস্থ বিহারের শাসনকর্তা হিসাবে ৭০৯ ও ৭১৫ হিজরায়

দু'টি শিলালিপি খোদাই করিয়েছিলেন। কুৎলু খান বা কুৎলুগ খানের নাম ইতিমধ্যে কেবল ইব্‌ন্ বতুতার ভ্রমণ-বিবরণীতে পাওয়া গিয়েছিল বলে অনেকেই তাঁর অস্তিত্বে সন্দিহান্ ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফুজুস-সফর'-এও তাঁর নাম পাওয়া গেছে (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

আগেই বলা হয়েছে যে, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় ও রাজত্বকালে তাঁর অন্তত তিনজন পুত্র নিজেদের নামে মুদ্রা জারী করেছিলেন। এর থেকে কালিকারঞ্জন কানুনগো সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এইসব পুত্রেরা বিদ্রোহ করে সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ অধিকার করে নিয়েছিলেন (HB II, pp. 80-89 দ্রঃ)। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একই বছরে বা পর পর একাধিক বছরে যে টাকশাল থেকে ফিরোজ শাহের মুদ্রা বেরিয়েছে, সেই টাকশাল থেকেই তাঁর কোন পুত্রেরও মুদ্রা বেরিয়েছে (বা. ই. স্থ. আ., পৃঃ ১৭৪ দ্রঃ)। পুত্রেরা বিদ্রোহী হয়ে ঐ টাকশালের এলাকা দখল করলে সেখান থেকে ফিরোজ শাহের মুদ্রা বেরোত না। তাছাড়া, ফিরোজ শাহের বিশাল রাজ্য গড়ে ওঠা এবং নতুন নতুন অঞ্চল অধিকৃত হওয়া কী করে সম্ভব হত, যদি পুত্রদের সঙ্গে তাঁর ক্রমাগত বিরোধ লেগে থাকত ? এর থেকে বোঝা যায় যে, ফিরোজ শাহের পুত্রেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি, তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তার পদে পুত্রদের নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের নামে মুদ্রা জারী করার অধিকার দিয়েছিলেন।

শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফুজৎ'-এর অন্যতম—'মুনীসুল-মুরিদীন' থেকে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এর থেকে জানা যায় যে, ফিরোজ শাহের অন্যতম পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ—যিনি পিতার জীবদ্দশায় প্রায় অব্যাহতভাবে ৭১০ থেকে ৭২২ হিঃ পর্যন্ত মুদ্রা জারী করেছিলেন—হাতেম খানেরই মত ফিরোজ শাহের রাজ্যের একটি অঞ্চলে শাসনকর্তা ছিলেন। নীচে আমরা "মলফুজৎ-এর সংশ্লিষ্ট অংশটির (অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির অনুবাদ) উদ্ধৃত করছি,

"When questioed about the requisite qualifications of a ruler he (Sharfuddin Yahia Maneri) said that both benevolence and sparingness were necessary and severities should be tempered

with mercy. He added in the past there was a king at Sonar-gaon called Shamshuddin who had a vazir named Arslan Khan. One day he summoned his vazir and asked him as to which of his two sons, Hatim Khan, the ruler of Behar, and Bahadur Shah, who was in Kamrup (Assam) was worthy of kingship. The Vazir replied that none was fit enough for being a king. The king felt a little annoyed but asked the vazir as to why he said so. He replied that Hatim was a man of generous disposition ; was mild and merciful, while Bahadur Shah was over-bearing, despotic and jealous in point of honour. The one lacked force and severity while the other was wanting in kindness and affability and, therefore, both were deficient and unfit for kingship. The saint further said that whatever the vazir had said was seen and actually happend for when Sultan Shamshuddin died Bahadur Shah was the ruler of Kamrup and Hatim Khan was the ruler of Behar. After some time the one fell from kingship because of his haughty, overbearing and despotic character, while the other proved to be a failure owing to his exccssive benevolence and marcifulness." (JBR*S*, Vol. XXXIV, Pt. III & IV, 1948, pp. 95-96)।

শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি এই সব কথা তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন ৭৬০ হিজরার ৩০-শে জমাদী-অল-আউয়ল মাসে (১৩৫৯ খ্রীঃ); ঐ সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯০ বছর, কারণ তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যাঁকে তিনি "শামসুদ্দীন" বলছেন—তিনি শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহই। শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি ফিরোজ শাহের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং উপরে উদ্ধৃত বিবরণ প্রামাণিক। ফিরোজ শাহ যে সোনারগাঁওতে ছিলেন, শরফুদ্দীনের এই উক্তিতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই; সোনারগাঁও যখন ফিরোজের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এখান থেকে তাঁর ও তাঁর পুত্রের মুদ্রা বেরিয়েছিল—তখন তিনি কিছু সময় এখানে থাকতেই পারেন। হাতেম খান যে

উদার, মৃদু প্রকৃতি ও দয়ালু লোক ছিলেন—সে কথাও এই 'মলফুজৎ' থেকে জানা যাচ্ছে ; আমরা জানতাম যে হাতেম খান ৭০৯-৭১৫ হিজরায় পিতার অধীনে বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু 'মলফুজৎ' থেকে জানলাম যে হাতেম খান পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন এবং পিতৃবিয়োগের পরে তিনি বিহারের সুলতান হয়েছিলেন, কিন্তু বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি ; শেষোক্ত খবরটি খুব মূল্যবান, কারণ ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর যখন বাংলা দেশের অধিকার নিয়ে তাঁর গিয়াসুদ্দীন, নাসিরুদ্দীন, শিহাবুদ্দীন প্রভৃতি পুত্রেরা মারামারি করছিলেন, তখন বিহারের অবস্থা কী রকম ছিল, তা আমরা জানতাম না। 'মলফুজৎ' থেকে অর্সলান খান নামে ফিরোজ শাহের একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী উজীরের নাম পাওয়া গেল, যিনি সুলতানের কাছে শাহজাদাদের বিরুদ্ধে হক কথা বলবার ক্ষমতা রাখতেন। 'মলফুজৎ'-এ বলা হয়েছে যে (গিয়াসুদ্দীন) বাহাদুর শাহ ফিরোজ শাহেব মৃত্যুর সময় (তার আগেও) কামরূপের শাসনকর্তা ছিলেন ; কিন্তু ফিরোজেব জীবদ্দশায় ৭১০-৭১৩ ও ৭২০-৭২২ হিজরায় লখনৌতির টাকশালে বাহাদুর শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল, অর্থাৎ তিনি ঐ সময়ে লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন ; ৭২২ হিজরায় (ফিরোজ শাহের মৃত্যুর বছর) গিয়াসপুর (ময়মনসিংহ শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত) টাকশালে তাঁর মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়, অর্থাৎ ঐ বছরে তিনি লখনৌতি থেকে গিয়াসপুরে বদলি হন। শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি সম্ভবত গিয়াসপুরকেই কামরূপ বলেছেন ; তার কারণ বোধ হয় এই যে, গিয়াসপুর আগে কামরূপের রাজার অধীনে ছিল এবং তাঁর কাছ থেকেই ফিরোজ শাহ গিয়াসপুর জয় করে-ছিলেন। 'মলফুজৎ'-এ বাহাদুর শাহকে যে উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ বলা হয়েছে, তা যে সম্পূর্ণ সত্য, তা গিয়াসুদ্দীন তুগলক ও মুহম্মদ তুগলকের রাজত্বকালে তাঁর কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায়।

পুত্রদের ছাড়া আরও দু'জন শাসনকর্তাকে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ তাঁদের নামে মুদ্রা জারীর অধিকার দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এঁরা হলেন,

(১) জলালুদ্দীন কুরবান (?) শাহ। এর ৭১৯ (?) হিজরার মুদ্রা মিলেছে (Numismatic Digest, Dec. 1978, pp. 58-67 দ্রঃ)।

(২) শামসুদ্দীন দৌলৎ শাহ (JNSI, pp. 130-131 দ্রঃ)।

এঁদের দু' জনেরই মুদ্রা হুবহু শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের ও তাঁর পুত্রদের

মুদ্রার অনুরূপ। প্রথম জনের মুদ্রার আনুমানিক তারিখ ফিরোজ শাহের রাজত্ব-কালেই পড়ছে। তাই এঁরাও ফিরোজ শাহের অধীনস্থ মুদ্রা জারী করার ক্ষমতা-প্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন বলে আমরা মনে করি।

এখন আমরা শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ সংক্রান্ত একটি জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করব। সেটি এই—তাঁর পরিচয় কী ?

এক সময়ে (১৯৪২ সাল পর্যন্ত) এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কারও কোন সংশয় ছিল না। সকলেই জানতেন যে তিনি ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বলবনের পৌত্র এবং বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহেব পুত্র। ইব্‌ন্ বতুতার রেহ্‌লার নিম্নোদ্ধৃত দু'টি উক্তিই ছিল তাঁদের ধারণার হেতু।

(ক) "নাসিরুদ্দীন তাঁর পুত্রের (কায়কোবাদ) পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং বাংলা দেশে ফিরে এসে আমরণ কাল সেখানেই রইলেন। এর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করলেন।"

(খ) "(গিয়াসুদ্দীন বলবনের) অবশিষ্ট আমীররা (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য) গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের পুত্র সুলতান শামসুদ্দীনের কাছে পালিয়ে গেলেন।"

কিন্তু শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ যে নাসিরুদ্দীন অর্থাৎ বুগরা খানের পুত্র ছিলেন না, তা নিম্নোক্ত চারটি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় ;

(১) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের কোন মুদ্রা বা শিলালিপিতে লেখা নেই যে তাঁর পিতাও সুলতান ছিলেন ; তা অবশ্যই লেখা থাকত, যদি তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের পুত্র হতেন।

(২) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের চারজন পুত্র (শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ, জলালুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ্, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ) নিজেদের নামে মুদ্রা জারী করেছিলেন ; ঐসব মুদ্রায় তাঁরা নিজেদের 'সুলতানের পুত্র' বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তাঁদের পিতামহও যে সুলতান ছিলেন, সে কথা বলেন নি ; তাঁরা নাসিরুদ্দীনের পৌত্র হলে নিশ্চয়ই সে কথা বলতেন।

(৩) গিয়াসুদ্দীন বলবনের পৌত্র ও প্রপৌত্রদের নামের আরম্ভ 'কায়' দিয়ে, যথা—কায়খসরু, কায়কোবাদ, কায়কাউস, কায়মুরস। নামের এই মিল শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ও তাঁর পুত্রদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

(৪) আমীর খসরুর 'কিরান-ই-সদাইন' থেকে জানা যায় যে, ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে

বুগরা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়কোবাদের বয়স ছিল ১৮ বছর, তাহলে ঐ সময়ে তাঁর তৃতীয় পুত্র শামসুদ্দীনের বয়স (কায়কোবাদের বৈমাত্রেয় ভাই হলেও) ১৬।১৭ বছরের বেশি হয় না, তা হলে ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স হবে ত্রিশের সামান্য কিছু বেশি এবং তাঁর পুত্রেরা ঐ সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্কই হবেন, কিন্তু ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর এক পুত্র জলালুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ নিজের নামে মুদ্রা জারী করেন এবং তার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর অন্যান্য পুত্রেরা মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ করাতে থাকেন। এটা কেমন করে হয়?

১৯৪২ সালে আবদুল মাজেদ খান সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ বুগরা খানের (নাসিরুদ্দীন) পুত্র ছিলেন না (I. H. Q., 1942, p. 65 ff.)। এর ছ'বছর পরে (১৯৪৮) প্রকাশিত History of Bengal (Vol. II)-তে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোও ঐ কথা বলেন। পরবর্তী সব গবেষকই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এঁরা সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন বলবনের বংশের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। এ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। পরে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি। তার আগে আমাদের আলোচনা করা দরকার—সিংহাসনে আরোহণ করার আগে ফিরোজ শাহ কী ছিলেন, সেই বিষয়টি নিয়ে।

এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আবদুল মাজেদ খান*, কালিকারঞ্জন কানুনগো** ডঃ আবদুল করিম† প্রভৃতি গবেষক বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, সকলেরই মতের সার সংকলন এবং বিচার করেছেন ডঃ আবদুল করিম (বা. ই. সু. আ., পৃ ১৫৯-১৬৩ দ্রঃ)। আমরা তাঁর লেখা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে —যেখানে দরকার, সেখানে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করব।

ডঃ করিম লিখেছেন, "দিল্লীর আলা-উদ-দীন খলজী সুলতান জলাল-উদ-দীন ফীরুজ খলজীর ভয়ে যখন পলাইয়া বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনা করিতেছিলেন, তখন তিনি জফর খানকে সরযূ নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা যোগাড় করার আদেশ করেন। এই সূত্র ধরিয়া আবদুল মাজেদ খান বলেন যে

---

* I. H. Q., 1942, p. 65 ff.

** H. B. II, p. 93-94

† Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume, p. 1 ff.

শমস-উদ-দীন [ফিরোজ শাহ] জফর খানের সঙ্গে অযোধ্যায় আসেন কিন্তু জফর খান ফিরিয়া গেলে শমস উদ-দীন তাঁহার পুত্রদের সঙ্গে লইয়া থাকিয়া যান এবং পরে লখনৌতির সিংহাসন আরোহণ করেন। শমস-উদ-দীন জফর খানের সঙ্গে অযোধ্যায় আসিলেও বাংলাদেশে কিভাবে আগমন করেন বা থাকিয়া যান তাহা মাজেদ খান সাহেব পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। রুকন-উদ-দীন কাই-কাউসের শিলালিপি পরীক্ষা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তিনি বিহারে দক্ষ সেনাপতি গবর্নর পদে নিযুক্ত করিয়া সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। এমতাবস্থায় শমস-উদ-দীনের মত কেহ (যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না) হঠাৎ দিল্লী হইতে আসিয়া লখনৌতি দখল করিয়া নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।" আমরা ডঃ করিমের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

ডঃ করিম আরও লিখেছেন, "ঐতিহাসিক ইসামী বলেন যে সুলতান গিয়াস উদ-দীন বলবন বুগরা খানকে লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত করার সময় বুগরা খানকে শাসন ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য ফীরুজ নামক দুইজন উচ্চ-পদস্থ অফিসারকে লখনৌতিতে রাখিয়া যান। ডঃ কানুনগো মনে করেন যে এই দুইজন ফীরুজের মধ্যে একজন রুকন-উদ-দীন কাইকাউসের সময় বিহারের গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিই কাইকাউসের পরে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। মনে হয় ডঃ কানুনগোর অনুমানই ঠিক, অর্থাৎ কাইকাউসের সময়ের বিহারের গবর্নর (ইখতিয়ারুদ্দীন) ফীরুজ ইতগীন এবং সুলতান শমস-উদ-দীন ফীরুজ শাহ এক ও অভিন্ন।" এই মতও আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। এই মতের পক্ষে আমরা আরও দু'টি যুক্তি দিচ্ছি,

(১) বলবন যে দু'জন ফিরোজকে বুগরা খানের সাহায্যের জন্য বাংলায় রেখে গিয়েছিলেন, তাঁরা দিল্লী থেকে আগত অর্থাৎ 'দেহলভী'। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ৯১৮ হিজরায় উৎকীর্ণ সিলেটের শাহ জলাল দরগাহ্‌র শিলালিপিতে (শামসুদ্দীন) ফিরোজ শাহকেও 'দেলভী' অর্থাৎ 'দেহলভী' বলা হয়েছে।

(২) রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অধীনে দু'জন প্রধান আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন বলে তাঁর রাজত্বকালের শিলালিপি থেকে জানা যায়; এঁরা হলেন বিহারের শাসনকর্তা ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ ইতগীন এবং প্রথমে দেবকোট ও পরে ত্রিবেণীর শাসনকর্তা জাফর খান ইতগীন। এঁদের প্রত্যেকের নাম দু'টি করে

শিলালিপিতে পাওয়া যায় ; এঁদের মধ্যে জাফর খান ইতগীন শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায় ; কিন্তু ঐ রাজার রাজত্বকালে ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ ইতগীন নামক অপর আঞ্চলিক শাসনকর্তার কোন হদিসই মেলে না। এর থেকেও মনে হয় ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ ইতগীন তখন শাসনকর্তা ছিলেন না, তিনি রাজা হয়ে বসেছিলেন অর্থাৎ তিনিই শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ।

অতঃপর ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "জিয়া-উদ-দীন বরণী বলেন যে শমস-উদ দীন নামক বুগরা খানের একজন দবীর বা সেক্রেটারী ছিলেন, বুগরা খান লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত হওয়ার সময় বলবন বুগরা খানের জন্য যেই উপদেশ রাখিয়া যান, শমস উদ-দীন দবীর সেই উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করেন। আমীর খসরু বলেন যে, শমস-উদ-দীন দবীর বুগরা খানের সঙ্গে ছিলেন। বুগরা খান কায়কোবাদের নিকট সংবাদ পাঠাইতে চাহিলে তিনি একজন উপযুক্ত, চতুর এবং স্পষ্টবক্তা লোক খুঁজিতেছিলেন, শেষে তিনি শমস উদ-দীন দবীরকে এই দৌত্য কাজের জন্য নির্বাচন করেন এবং তাঁহার মারফৎ কায়কোবাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, শমস-উদ-দীন দবীরও বুগরা খানের সময়ে লখনৌতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে এই শমস-উদ-দীন দবীরই কাইকাউসের সময়ে বিহারের গবর্নর নিযুক্ত হইযাছিলেন এবং তিনিই হয়ত কাইকাউসের পরে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয শমস-উদ-দীন দবীর, ফীরূজ ইতগীন এবং শমস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ একই ব্যক্তি।"

এই মত আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ প্রথমত, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ছিলেন একজন প্রবলপরাক্রান্ত সুলতান, বিরাট রাজ্য তিনি শাসন করতেন এবং বহু নতুন অঞ্চল তাঁর আমলে বিজিত হয়েছিল ; এর থেকে বোঝা যায়,—রাজ্যশাসন, সৈন্য পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল ; তিনি যদি প্রথম জীবনে 'দবীর' বা কেরানী হয়ে থাকতেন, তা হলে ঐ সব অভিজ্ঞতা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। দ্বিতীয়ত, ফিরোজ ইতগীনের নামের প্রথমে 'ইখতিয়ারুদ্দীন' শব্দ দেখা যায় ; তাঁর মূল নাম যদি 'শামসুদ্দীন' হত তা হলে শাসনকর্তা হবার সময়ে অযথা তাকে বদলে 'ইখতিয়ারুদ্দীন' করা এবং সিংহাসনে বসার সময়ে আবার 'শামসুদ্দীন' করার

কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর থেকে বোঝা যায়, শামসুদ্দীন দবীর এবং ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ ইতগীন আলাদা লোক ; ফিরোজ ইতগীন যদি সুলতান হবার সময়ে নামের প্রথমাংশ পরিবর্তন করে থাকেন, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু বারবার নাম পালটানোর কথা কল্পনা করা যায় না।

এখন, আমরা আমাদের পুরোনো প্রশ্নে ফিরে আসছি। ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি যে, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ বুগরা খানের পুত্র নন ; কিন্তু তার দ্বারাই প্রমাণ হয় না "বলবনী বংশের সঙ্গে শমস-উদ-দীন ফীরুজ শাহের কোন সম্পর্ক ছিল না" ; ফিরোজ শাহ বৈবাহিক সূত্রে বা আত্মীয়তার সূত্রে বলবনী বংশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হতে পারেন। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টির আপাতদৃষ্টিতে কোন প্রমাণ নেই, তাই এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রথমে ইব্‌ন্ বত্তুতার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করা দরকার। ইদানীং আবদুল মাজেদ খান ও কালিকারঞ্জন কানুনগো থেকে সুরু করে অনেক গবেষকই বলছেন যে ইব্‌ন্ বত্তুতার সাক্ষ্য তত প্রামাণিক নয়। এ সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "ইবন বতুতা দেশে ফিরিয়া যাওয়ার দিন তাঁহার ডায়েরী বা রোজ-নামচা হারাইয়া ফেলেন। তাই তিনি স্মৃতি-শক্তি রোমন্থন করিয়া তাঁহার সফর কাহিনী বর্ণনা করেন, যাহা ইবন-জুজাই লিপিবদ্ধ করেন। তিনি যে সব কিছু ঠিকভাবে সাজাইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।" (বা. ই. সু. আ., পৃঃ ১৫৭) পক্ষ স্তরে, ইব্‌ন্ বত্তুতার ভ্রমণ-কাহিনীর অনুবাদক মাহ্‌দী হোসেন বলেন, "It is true that Muslim history presents examples of theologians who have learnt by heart the holy Qur'ān and even the books of hādis, but it has presented no example of a person who could learn by heart the day-to-day events, phenomena and minutiae ranging over a quarter of a century and keep them stocked for years together in a mind which like that of Ibn-Battuta was not infrequently distressed and embittered.

"This tends to show that the alleged loss of notes is a fallacy." (The Rehla of Ibn-Battuta, Introd., p. lxxiv)।

মাহ্‌দী হোসেন যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করেছেন যে ইব্‌ন্ বত্তুতা নিজের পশার বাড়াবার জন্য, অর্থাৎ সব কিছু তিনি মনে রাখতে পারেন, তা

দেখাবার জন্য ডায়েরী হারাবার কথা বানিয়ে বলেছিলেন। আসলে ডায়েরী বা নোট তিনি হারান নি, হারালে এত সব দেশের এত সব ঘটনা ও ব্যক্তি-নাম তিনি নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন না; বাংলা সংক্রান্ত তাঁর দু'টি বিবরণে দেখতে পাই তিনি শামসুদ্দীন (ফিরোজ শাহ), শিহাবুদ্দীন (বুগড়া শাহ), নাসিরুদ্দীন (ইব্রাহিম শাহ), গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বুর, কুৎলু (কুৎলুগ) খান, ফখরুদ্দীন, আলী শাহ প্রভৃতির নাম এবং শামসুদ্দীনের পুত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ফখরুদ্দীনের সঙ্গে আলী শাহের যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, যা কুড়ি বছর আগেকার স্মৃতি থেকে লিখলে সম্ভব হত না। অবশ্য ভুল তাঁর কিছু হতে পারে এবং তা হয়েছেও। মনে রাখতে হবে, তিনি বুগরা খানের রাজত্ব অবসানের ৫৫।৫৬ বছর বাদে বাংলায় এসেছিলেন, কাজেই তার অব্যবহিত পরবর্তী কালের ঘটনা একটু ভুলভাবে তাঁর বিবরণে বর্ণিত হতে পারে। তারই নিদর্শন হচ্ছে বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর "তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করলেন" এই উক্তিটি। প্রকৃতপক্ষে, নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম শামসুদ্দীন নয়, রুকনুদ্দীন কায়কাউস; তাঁর পরে শামসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করে-ছিলেন; অর্থাৎ ইব্‌ন্ বতুতা নাসিরুদ্দীনের পরবর্তী প্রথম ও দ্বিতীয় নৃপতি—রুকনুদ্দীন ও শামসুদ্দীনকে এক করে ফেলেছেন। এ রকম ভুল অনেককেই করতে দেখা যায়।

সে যা হোক্, তিনটি বিষয় থেকে আমার মনে হয় শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ও তাঁর পুত্রদেব সঙ্গে বলবনী বংশের সম্পর্ক ছিল। সেগুলি এই,

(১) ইব্‌ন্ বতুতা শামসুদ্দীন এবং তাঁর পুত্রদের নাম উল্লেখের ও গিয়া-সুদ্দীন বাহাদুর বূরের মৃত্যু বর্ণনার একটু পরে লিখেছেন,

"যখন ফখরুদ্দীন দেখলেন যে সুলতান নাসিরুদ্দীনের বংশের রাজত্ব শেষ হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের জন্য সোদকাওয়াঙে (চাটগাঁওয়ে) ও বাংলার অবশিষ্ট অংশে বিদ্রোহ করলেন।"

ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহ ও পূর্ববঙ্গের শাসন ক্ষমতা অধিকারের (১৩৩৮ খ্রীঃ) আট বছর পরে ইব্‌ন্ বতুতা বাংলায় আসেন; তিনি ফখরুদ্দীনের রাজ্যেই ভ্রমণ করেছিলেন। ফকরুদ্দীন যেখানে থাকতেন, সেই সোদকাওয়াঙ বা চাট-গাঁওয়েই তিনি প্রথম আসেন। ফখরুদ্দীন কী পরিস্থিতির মধ্যে রাজা হয়েছেন,

সে সময়ে তাঁর রাজ্যের অনেকেই নিশ্চয় তখন আলোচনা করত এবং তা'ই ইব্‌ন্ বত্তুতা শুনেছিলেন। নাসিরুদ্দীনের বংশের রাজত্ব শেষ হওয়ার জন্যই তাঁদের বন্ধু ফখরুদ্দীন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন—বিদ্রোহের এই রকম অছিলা ফখরুদ্দীন ঘোষণা করেছিলেন, উদ্ধৃত অংশটি থেকে এটাই মনে হয়। সুতরাং গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বূর প্রভৃতির সঙ্গে নাসিরুদ্দীনের অর্থাৎ বলবনী বংশের সম্পর্ক সম্বন্ধে এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

আমাদের বক্তব্য হয়ত স্পষ্ট হ'ল না, তাই আর একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। ইব্‌ন বত্তুতা বলেছেন—(১) শামসুদ্দীন (ফিরোজ শাহ) নাসিরুদ্দীনের (বুগরা খান) পুত্র, (২) গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বূর প্রভৃতি নাসিরুদ্দীনের বংশের লোক। এই দু'টি বিষযের মধ্যে প্রথমটি ভুল, কিন্তু তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় না যে দ্বিতীয়টিও ভুল ; অবশ্য যদি প্রথমটি থেকেই দ্বিতীয়টি এসে থাকে, তা' হলে সেটিও ভুল ; কিন্তু দ্বিতীয়টি থেকেও প্রথমটি আসতে পারে, অর্থাৎ ইব্‌ন্ বত্তুতা আগে শুনলেন যে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর প্রভৃতি নাসিরুদ্দীনের বংশের লোক ; কীভাবে তা হ'ল, তার সহজ ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি মনে করলেন যে তাঁদের পিতা শামসুদ্দীন নাসিরুদ্দীনের পুত্র। তিনি জানতেন যে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজা হয়েছিলেন। সেই পুত্রের সঙ্গে শামসুদ্দীনকে অভিন্ন মনে করলেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিষয়টিকে নিঃসন্দেহে ভুল বলা চলে না। ফখরুদ্দীন তাঁর বিদ্রোহেব কোন অজুহাত নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন ; ইব্‌ন্ বত্তুতার সেই অজুহাত লোকমুখে শোনার সম্ভাবনা ষোল আনা ; সুতরাং ইব্‌ন্ বত্তুতা যা লিখেছেন, সেটিই ফখরুদ্দীনের অজুহাত (অর্থাৎ নাসিরুদ্দীনের বংশের কেউ বেঁচে না থাকার জন্যই তাঁদের বন্ধু ফখরুদ্দীন তাঁদের রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়েছেন) —এটি মনে করতে বাধা কি ? এই হিসাবে গিয়াসুদ্দীন প্রভৃতি নাসিরুদ্দীনের বংশের লোকই হন ; পুত্র পৌত্র ইত্যাদি না হয়েও (দৌহিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতি হলেও) কারও বংশের লোক হওয়া যায়।

(২) আগেই বলা হয়েছে যে রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ ইতগীন এবং জাফর খান ইতগীন ছিলেন দু'জন প্রধান আঞ্চলিক শাসনকর্তা। প্রথম জনই শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে সুলতান হয়েছিলেন, এ কথা অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন, আমরাও করি। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেও জাফর

খান আঞ্চলিক শাসনকর্তা থেকে গেলেন। যিনি ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে সমমর্যাদা-সম্পন্ন ছিলেন, সেই ফিরোজের অধীনে আগেকার পদেই কাজ করে যেতে জাফর খানের কোন দ্বিধা হল না। এর থেকেও মনে হয়, ফিরোজ শাহ উত্তরাধিকার-সূত্রেই রাজা হয়েছিলেন, যে অধিকার জাফর খানের ছিল না; তাই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরোজ শাহের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।

(৩) এখন এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণটি উপস্থাপিত করছি। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের প্রসঙ্গ বর্ণনা করার পরেই (গিয়াসুদ্দীন) বাহাদুর শাহের কথা বলা হয়েছে এবং তাঁকে "নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদের একজন আত্মীয়" (One of the connections of Sultan Nasiruddin) বলা হয়েছে। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-রচয়িতা ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ থেকে তাঁর এ সংবাদ সংগ্রহ করেন নি; ইব্‌ন্ বত্তুতার ভ্রমণ-কাহিনী তখনও ভারতে প্রচারিত হয় নি, তার নামও এদেশে কেউ শোনে নি। 'রিয়াজ'-এ প্রদত্ত সংবাদের উৎস ভিন্ন। সুতরাং শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্রেরা যে বলবনী বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এ কথা শুধু ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণে নয়, অন্য সূত্রেও মিলছে।

এই তিনটি বিষয় থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে বৈবাহিক সূত্রে বা আত্মীয়তার সূত্রে বলবনী বংশের সঙ্গে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সম্পর্ক ছিল এবং অপুত্রক অবস্থায় রুকনুদ্দীন কায়কাউসের মৃত্যুর পর তিনি স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী (Next of kin) হিসাবেই তাঁর সিংহাসন দখল করেন। বলবন, বুগরা খান, কায়কাউস—এঁরা কেউই শামসুদ্দীনের পূর্বপুরুষ ছিলেন না বলে তাঁর মুদ্রায় "বিন সুলতান" ইত্যাদি লেখার প্রশ্ন ওঠে নি।

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "শমস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের একখানি শিলালিপিতে জফর খান বাহরাম ইতগীনকে 'মুয়ীন-উল-মুলুকে ওয়াল-সলাতীন' বা রাজা-বাদশাহদের সাহায্যকারী রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। জাফর খান বাহরাম ইতগীন কাইকাউসের সময়েও প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন, কিন্তু কাইকাউসের সময়ের কোন শিলালিপিতে তাঁহাকে ঐরূপ উপাধি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং শমস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সময়ের শিলালিপিতে তাঁহাকে ঐ উপাধি দেওয়ায় মনে হয় তিনি শমস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের সিংহাসন আরোহণের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা কাইকাউসকে জোরপূর্বক সরাইয়া (বা হত্যা

করিয়া ?) শমস-উদ-দীন ফীরূজের সিংহাসন আরোহণের ইঙ্গিত বহন করে।" (বা. ই. সু. আ., পৃঃ ১৫০-৫১) এখানে অত্যন্ত বেশি অনুমান করা হয়েছে। জাফর খান সত্যই "রাজা-বাদশাহদের সাহায্যকারী" ছিলেন—কারণ তিনি কায়কাউস ও ফিরোজ, দুই সুলতানকেই রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করেছিলেন ; সম্ভবত তিনি তাঁর এই কৃতিত্বের জন্যই, অথবা আমাদের অজ্ঞাত অন্য কোন কৃতিত্বের জন্য ঐ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এর পিছনে ফিরোজ শাহকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করার কোন ইঙ্গিত আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

ফিরোজ শাহ যখন বাংলার সুলতান ছিলেন, সেই সময়ের বেশির ভাগই দিল্লীতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন খলজীবংশীয় সুলতানেরা। তাঁর রাজত্বের একেবারে শেষ দিকে (সেপ্টেম্বর, ১৪২০ খ্রীঃ) গিয়াসুদ্দীন তুগলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে (১৪২১-২২ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র জৌনা খানের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠান তেলেঙ্গানা জয় করার জন্য। মালিক তামুর, মালিক টিকিন, মালিক কাফুর, মালিক বৈরাম প্রভৃতি আমীররাও জৌনা খানের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কয়েকজন আমীরের ষড়যন্ত্রের ফলে এই অভিযান পণ্ড হয় (ইব্‌ন্ বত্তুতার মতে জৌনা খান এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন, কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে এ কথা বিশ্বাস করেন না)। গিয়াসুদ্দীন কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী আমীরকে বধ করেন। ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে অন্যান্য আমীররা বাংলায় পালিয়ে যায় এবং সুলতান শামসুদ্দীনের (ফিরোজ শাহ) কাছে আশ্রয় লাভ করে। ফিরোজ শাহ যে দিল্লীর সুলতানদের পরোয়া করতেন না--এই ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। আলোচ্য বিষয়ে ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তি যে নির্ভুল, তাঁর সঠিক সময়-নির্দেশ থেকেই তা প্রমাণ হয় ; গিয়াসুদ্দীন তুগলকের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার পরের বছর (১৪২২-২৩ খ্রীঃ) তিনি মারা যান।*

ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের দু'একটি ঘটনার কথা পরবর্তী কোন কোন সূত্রে পাওয়া যায়। যেমন, মুসলমানদের সাতগাঁও বিজয় সংক্রান্ত একটি পুরোনো

* এর থেকেও মনে হয়, ইব্‌ন্ বত্তুতার নোট হারানোর কথা অমূলক।

কিংবদন্তীতে (১৮৭০ সালে সংগৃহীত) পাওয়া যায় যে, সুলতান ফিরোজ শাহের শ্যালক সফীউদ্দীন বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করছিলেন ; হুগলীর নৃপতি পাণ্ডব রাজার একজন মুসলমান প্রজা পুত্রের সুন্নৎ উপলক্ষে গোবধ করলে রাজা তাকে শাস্তি দেন ; ফলে রাজা ও সফীউদ্দীনের সংঘর্ষ হয় ; সফীউদ্দীনের প্রার্থনা অনুসারে সুলতান তাঁকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন ; পানিপথ-কর্নালের সূফী বু-আলী কলন্দর সৈফুদ্দীনকে আশীর্বাদ করেন ; জাফর খান গাজী এবং পীর বাহরাম সাক্কা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে পাণ্ডব রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং এই যুদ্ধে জয় লাভ করে সাতগাঁওয়ে মুসলিম অধিকার স্থাপন করেন (P.A.S.B., 1870, pp. 123-125 দ্রঃ)।

এই কিংবদন্তীর মধ্যে দু'একটি অনৈতিহাসিক কথা আছে ; যেমন পীর বাহরাম সাক্কা ঐ সময়ের লোক নন ; কিন্তু কয়েকটি প্রামাণিক কথাও এতে পাই ; যেমন (১) সাতগাঁও জয়ে জাফর খানের অংশগ্রহণ—জাফর খানের ১২৯৮ ও ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি সাতগাঁওয়ে মিলেছে ; (২) ফিরোজ শাহ ঐ সময়ে সুলতান ছিলেন ; (৩) বু-আলী কলন্দর ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন—তিনি ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সুতরাং কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণত না হলেও অংশত সত্য বলেই মনে হয়।

সাতগাঁও বিজয়ের মত ফিরোজ শাহের আমলের শ্রীহট্ট বা সিলেট বিজয় সংক্রান্ত পুরোনো কিংবদন্তীও (১৮৭৩ সালে সংগৃহীত) পাওয়া গেছে। সেটি এই :—

গৌড়গোবিন্দের রাজত্বকালে সিলেটের জঙ্গলে বুরহানুদ্দীন নামে একজন মুসলমান ধার্মিক ব্যক্তি বাস করতেন ; তিনি তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে গোবধ করেন ; সেই গরুর এক টুকরো মাংস নিয়ে এক চিল গৌড়গোবিন্দের একটি মন্দিরে ফেলে ; এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গৌড়গোবিন্দ বুরহানুদ্দীনকে ধরে তাঁর ডান হাত কেটে দেন ও তাঁর পুত্রকে বধ করেন ; বুরহানুদ্দীন তখন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের কাছে নালিশ করেন ; সুলতান তাঁর ভাগিনেয় সিকন্দর খান গাজীর অধীনে এক সৈন্যবাহিনী গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে পাঠান ; কিন্তু সিকন্দর খান দু'বার গৌড়গোবিন্দের কাছে পরাস্ত হয়ে ফিরে আসেন ; এই সময়ে শাহ জলাল তুরস্কের কুনিয়া শহর থেকে ৩১৩ জন শিষ্য নিয়ে বাংলায় আসেন ; প্রথমে সাতগাঁও গিয়ে পরে তিনি সিলেটে এসে

সিকন্দর খানের সঙ্গে যোগ দেন ; তাঁর সৈন্যদের সিপাহসালার বা সেনাপতি নিযুক্ত হন সৈয়দ নাসিরুদ্দীন। এঁদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে গৌড়গোবিন্দ জঙ্গলে পালালেন এবং সিলেটে মুসলিম অধিকার স্থাপিত হল। (J.A.S.B., 1873, pp. 280-81 দ্রঃ)

সাতগাঁও বিজয় কাহিনীর মত এই কাহিনীও সবটা সত্য নয়। প্রথমোক্ত কাহিনীর মত এই কাহিনীতেও হিন্দু রাজার মুসলমান প্রজার গোবধকে মুসলমানদের বিজয় অভিযানের সূত্রপাত হিসাবে দেখানো হয়েছে, এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে এই কাহিনীর মধ্যে অনেক সত্য কথাও আছে বলে মনে হয়। কয়েকটি সূত্রে এর সমর্থনও পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত কাহিনীতে সিলেট-বিজয়-অভিযানের নেতা বলে বর্ণিত শাহ জলালের নামাঙ্কিত দরগাহ্ সিলেটে আছে। সেই দরগাহ্‌তে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের— ৯১১ ও ৯১৮ হিজরায় উৎকীর্ণ দু'টি শিলালিপি পাওয়া যায় ; এই দুই শিলালিপির মতে এঁর পুরো নাম শেখ জলাল মুজাররদ ; ৯১১ হিঃর শিলালিপি অনুসারে ইনি ছিলেন কুনিয়ার অধিবাসী ; ৯১৮ হিঃর শিলালিপির মতে এঁর পিতার নাম মুহম্মদ এবং এঁর দয়ায় সিকন্দর খান গাজী প্রথম সিলেট জয় করেছিলেন ; সিলেট-বিজয়ী সৈন্যদের অন্যতম এবং জলাল মুজাররদের অনুচর নূরুল হুদার বংশধর শেখ আলী শেরের 'শরহ্-ই-নজহল্ উল্-আরওয়াহ্' অবলম্বনে গউসী নামে একজন গ্রন্থকার 'গুলজার-ই-আব্রার' নামে একটি বইয়ে (রচনাকাল ১৬১৩ খ্রীঃ) লিখেছেন যে, শেখ জলালুদ্দীন মুজাররদের বাড়ি ছিল তুর্কীস্তানে এবং তিনি তাঁর গুরুর দেওয়া কয়েক শত সৈন্য নিয়ে সিলেট বা শ্রীহট্ট (সিরহট) জয় করেছিলেন। পূর্বোক্ত কিংবদন্তীর সঙ্গে এইসব পুরোনো সূত্রের সাক্ষ্য মিলিয়ে নিলে এইটুকু অন্তত সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে তুর্কীস্তানের কুনিয়ার অধিবাসী শেখ জলাল মুজাররদের নেতৃত্বে মুসলমানরা সিলেট জয় করেছিলেন।

সাতগাঁও-বিজয়-কাহিনীর পাণ্ডব রাজা এবং সিলেট-বিজয়-কাহিনীর গৌড়-গোবিন্দের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সিলেটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'রিপুরাজ গোপীগোবিন্দ' উপাধিধারী এক রাজা ছিলেন (দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, পৃঃ ১৪৪)। গৌড়-গোবিন্দ এঁর বংশধর হতে পারেন।

শামস-ই-সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে দিল্লীর তুগলকবংশীয় সুলতান ফিরোজ শাহ (১৩৫১-৮৮) পাণ্ডুয়ার (মালদহ জেলা) নাম ফিরোজাবাদ রাখেন। কিন্তু যেহেতু এই ফিবোজ শাহের বাংলা আক্রমণের এমন কি রাজা হবারও কয়েক বছর আগে থেকে ফিরোজাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, সেই হেতু এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, পাণ্ডুয়ার ফিরোজাবাদ নাম বেখেছিলেন শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ ফিরোজ শাহ তুগলকের পূর্ববর্তী ফিরোজ নামক (বাংলার) সুলতান একমাত্র তিনিই।

ডঃ আবদুল করিম মনে করেন শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ হুগলী জেলার পাণ্ডুযার নামও ফিরোজাবাদ রেখেছিলেন, কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, সুলতান শামসুদ্দীন যূসুফ শাহের (রাজত্বকাল ৮৭৯-৮৮৫ হিজরা) আগে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় মুসলিম অধিকাবের কোন প্রমাণ মেলে না। এই পাণ্ডুয়ার প্রথম মুসলিম শিলালিপি (যূসুফ শাহের নামাঙ্কিত) ৮৮২ হিজরার ১লা মহরম (১৫ই এপ্রিল, ১৪৭৭ খ্রীঃ) তারিখে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। তাঁর চরিত্র কীরকম ছিল, সে সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পাবে যে, তিনি একজন বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। বিশাল রাজ্যের সর্বত্র তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপযুক্ত পুত্রদের হাতে পূর্ণ শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও তাঁর বিচক্ষণতার প্রমাণ পাই। কঠিন ব্যাপারে তিনি যোগ্য উজীরের সঙ্গে পরামর্শ করতেন ও ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের কথা শুনতেন—শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরিব 'মলফূজৎ' থেকে তা জানা যায়। রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে তিনি নিজে খুব বেশি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না, তবে তিনি যোগ্য লোকদের উপর সে কাজের ভার দিতেন এবং তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। ফিরোজ শাহকে তাঁর পুত্রেরা খুব ভক্তি করত বলে মনে হয় ; তার প্রমাণ,—পূর্ণ শাসনক্ষমতার, এমন কি নিজেদের নামে মুদ্রা জারীর অধিকার পেয়েও তারা তাঁর আনুগত্য লঙ্ঘন করে নি।

শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফূজৎ'* থেকে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের

* 'মলফূজৎ' শব্দ 'মলফূজ' (অর্থ—বৈঠকী আলোচনা)-এর বহুবচন। শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফূজৎ' (অর্থাৎ শিষ্যদের সঙ্গে বৈঠকী আলোচনাসমূহের যে সব সংকলন তাঁর শিষ্যেরা

চরিত্রের আরও কোন কোন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এর থেকে জানা যায় যে, শামসুদ্দীন ধর্মপ্রাণ সুলতান ছিলেন এবং দরবেশদের ও অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায়ই ধর্ম-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করতেন। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারি লিখেছেন ৭৬২ হিজরার ১৫ই জমাদী অল-আউয়ল তারিখে শিষ্যদের প্রতি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির প্রদত্ত উপদেশে। "there was another reference to Sulṭan Shams'ud-Dīn. Husāmu'd-Dīn Shangarfī and Maulānā Wahīu'd-Dīn came and sat in front of the Sulṭan, there was a discussion of the virtues and excellence of men. It was the habit of the Sulṭan, we are told, that whenever some personage started learned discussions, he used to turn towards him and request him to repeat the points. There was a strain of bitterness in the discussion which fortunately switched on to an eulogistic reference to the great savant, Qādī Quṭbu'd-Dīn Kāshānī (JBRS, 1966, pp. 145-46)।

সঙ্গীতের প্রতি শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের অনুরাগ ছিল খুব বেশি ; তবে সবরকম সঙ্গীত নয়, শুধু ধর্মীয় সঙ্গীতই ছিল তাঁর প্রিয়। শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি (আসকারি সাহেবের ভাষায়) "mentions him very frequently showing him to be a pious man fond of religious, not secular, music." (JBRS, 1966, p. 153) প্রার্থনার ব্যাপারে মৌলানা জৈনুদ্দীনের (শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির গুরু মৌলানা তওয়ামাহ্‌র ভাই) মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ ছিল তাঁর অভিপ্রেত ; আসকারি সাহেব লিখেছেন, "Sulṭan Shams'ud-Dīn had his separate Imāms and Mu'adhdhins in the different places and stations, and wherever he went, when the time of prayer came he offered his prayers under the Imām of

করেছিলেন)—তাদের মধ্যে দু'টিতে কয়েক জায়গায় শামসুদ্দীন (ফিরোজ শাহ) ও তাঁর পুত্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়—(১) মুনীসুল মুরিদীন (৭৭৪ হিজরার ২১শে শাবান থেকে ৭৭৫ হিঃর ১লা মহরম অবধি তারিখের 'মলফুজ'-এর সংগ্রহ), (২) মলফুজুস সফর (৭৬২ হিজরার 'মলফুজ'-এর সংগ্রহ)। [JBRS, 1966, pp. 143-84তে প্রকাশিত অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

that place ; but if Maulānā Zainu'd-Dīn happened to be there, none was decleared to act as the leader of the prayer to the Sulṭan ; as a matter of fact, the latter would himself ask the Maulānā to lead the prayers. (JBRS. 1966, P. 149)।

শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফুজৎ' থেকে জানা যায় যে বিহারের 'প্রথম মুক্তি' মালিক নাখ্‌দ্ সুলতান শামসুদ্দীনের অসন্তোষ উদ্রেক করায় সুলতান তাঁকে বরখাস্ত করে মালিক আলাউদ্দীনকে* ঐ পদে নিয়োগ করেন ; নাখ্‌দ্ সম্ভবত দুর্নীতির জন্য বরখাস্ত হয়েছিলেন, কারণ (আসকারি সাহেবের ভাষায়) "his satirical remark on a later occasion on the offer of a somewhat stale betel-leaf brought forth the retort that it have been acquired by 'lawful' means." (JBRS, 1966, p. 153) এর থেকে বোঝা যায়, কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন করার দিকে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের জাগ্রত দৃষ্টি ছিল এবং তিনি এ ব্যাপারে কঠোর নীতি অনুসরণ করতেন।

শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফুজৎ'-এ শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের তিন পুত্র—হাতেম খান, বাহাদুর শাহ ও কুৎলুগ খানের নাম এবং তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে হাতেম খান ও বাহাদুর শাহ সম্বন্ধে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কুৎলুগ

* এর থেকে সন্দেহ হয়, এখানে হয়তো "শামসুদ্দীন" বলতে শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশকে বোঝানো হয়েছে, কারণ মালিক আলাউদ্দীন জানী তাঁর অধীনে বিহারের (পরে লখনৌতি রাজ্যের) শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারি দেখিয়েছেন যে শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেবির 'মলফুজৎ'-এর অন্যত্র 'শামসুদ্দীন' বলতে সন্দেহাতীত রূপে বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহকেই বোঝানো হয়েছে, ইলতুৎমিশের নাম তাতে কোথাও নেই ; সুতরাং এক্ষেত্রেও বাংলার সুলতানের কথাই বলা হয়েছে (JBRS, 1966. p. 153)। আমাদেরও মনে হয় এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইলতুৎমিশের কথা বললে শরফুদ্দীন অপর শামসুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতেন ; তা ছাড়া 'তবকাৎ-ই নাসিরী' পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়. বিহারের শাসনকর্তা হিসাবে আলাউদ্দীন জানীর নিয়োগ ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে (পৃঃ ৩৮ দ্রষ্টব্য) ; তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তা দুর্নীতি বা অন্য কারণে সুলতান ইলতুৎমিশের অসন্তোষ উদ্রেক করে বরখাস্ত হওয়ায় তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন নি : লখনৌতির সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজীর সঙ্গে সন্ধি করার পর ইলতুৎমিশ আলাউদ্দীন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান। সুতরাং 'মলফুজৎ'-এ শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের কথাই বলা হয়েছে. তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খান সম্বন্ধে 'মলফুজৎ' থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনিও ধর্মপ্রাণ ছিলেন ; পিতার মৃত্যুর পরে তিনি পূর্বোক্ত মৌলানা জৈনুদ্দীনকে ইমামের পদে নিয়োগ করেন ; জৈনুদ্দীনকে তিনি এত ভক্তি করতেন যে তাঁর পিছনে থেকে তিনি প্রার্থনা করতেন ; তাঁর এই কাজ সদর-ই-জাহান (বিচারবিভাগের প্রধান) কাজী শাঙ্গারফী অনুমোদন করেন নি ; আলেমরা (ইসলামধর্মের পণ্ডিত) তাঁদের ছাত্রদের নিয়ে যখনই ধর্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করতেন— কুৎলুগ খান সুযোগ পেলে অবধারিতভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতেন। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির 'মলফুজৎ' অবলম্বনে লিখেছেন, "When Sulṭan Shamsu'd-Dīn died, Qutlugh Khān, the Shāhzāda made the same Maulānā (Zainu'd.Dın) bis Imām saying, 'you have been the Imām and the Maulānā of Sulṭan Shamshu'd-Dīn and now I shall not leave you ; act as my Imām and the Maulānā did act as the Imām of Qutlugh Shah. One day Qutlugh Khān called upon Qādī Shāngarfī (vemillion-robed), 'the Sadr-i jahān', who was very rigid and severe in such matters. The Qādī asked Qutlugh Khān 'Behind whom do you offer your prayers ?' Maulānā Zainu'd-Dīn was mentioned. He then further asked, 'For how many years ?' and the reply was, 'So many times, whereupon Qādı Shāngarfı at once exclaimed, 'It behoves you to turn your back and say your prayers again.·· While dealing with pleasures felt in the acquistion of knowledge, the saint (Sharafu'd-Dın) observed, 'Some people even when they are engaged in their occupation can not refrain from the company of scholars and they enjoy their learned discourses. For instance, it is said about Qutlugh Khān, that invariably he joined learned talks, where scholars and their pupils used to be present in the Majlis" (JBRS, 1966, pp. 149-50)

এই বিবরণ পড়লে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমত, পিতার জীবদ্দশায়

কুৎলুগ খান কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ?

আমরা দেখতে পাই যে, কুৎলুগ মৌলানা জৈনুদ্দীনের পরম ভক্ত এবং পিতার মৃত্যুর পরই তিনি জৈনুদ্দীনকে ইমামের পদে নিয়োগ করলেন ; এই মৌলানা জৈনুদ্দীন ছিলেন সোনারগাঁওয়ের বিখ্যাত দরবেশ এবং শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির (তিনি প্রথম জীবনে সোনারগাঁওয়ে থাকতেন) শিক্ষক মৌলানা শরফুদ্দীন তওয়ামাহ্‌র ভাই ;* সুতরাং জৈনুদ্দীন সোনারগাঁওয়ে থাকতেন এবং শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর সময়ে কুৎলুগ খান সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা ছিলেন বলে মনে হয়—এই ধারণা আরও সুদৃঢ় হয় এই কারণে যে ৭১৭-৭২২ হিজরায় সোনারগাঁও টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ কারও মুদ্রা পাই না ; সুতরাং সম্ভবত কুৎলুগই সেখানে শাসনকর্তা ছিলেন এবং হয় তিনি মুদ্রা জারী করেননি নয়তো সে মুদ্রা পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয়ত, পিতার মৃত্যুর ঠিক পরে কুৎলুগ কোন্ পথ অবলম্বন করেছিলেন ? তিনি মৌলানা জৈনুদ্দীনকে স্বাধীনভাবে ইমামের পদে নিয়োগ করলেন—এর থেকে বোঝা যায় তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন ; এর পর গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের সঙ্গে কুৎলুগ খানের সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষে কুৎলুগ নিহত হন ; ইব্‌ন্ বত্তুতা তাঁর ভ্রমণ-বিবরণীতে লিখেছেন যে শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহকে পরাস্ত করে সিংহাসন অধিকার করে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ তাঁর ভাই কুৎলু খানকে বধ করেন।

শামসুদ্দীন ফিবোজ শাহের যে-সব অমাত্য ও কর্মচারীর নাম আমরা এই আলোচনাব মধ্য দিয়ে পেয়েছি, তাব একটি তালিকা নীচে সঙ্কলন করা হ'ল,

(১) জাফর খান—সাতগাঁও অঞ্চলের শাসনকর্তা

(২) অর্সলান খান—উজীর

(৩) হুসামুদ্দীন শাঙ্গারফী—কাজী এবং সদর্-ই-জাহান (বিচারবিভাগের প্রধান)

(৪) মালিক নাথু—বিহারের প্রধান মুক্তি

(৫) মালিক আলাউদ্দীন—ঐ

* JBRS, 1948, p. 89, p. 97 এবং JBRS, 1966, p. 149 দ্রঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফিরোজ শাহের পুত্রগণ ও তুগলকী শাসন

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং তাঁর রাজত্ব সম্বন্ধে সমসাময়িক ও প্রামাণিক সূত্রগুলি থেকে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে এবং তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে ঐ সব সূত্র থেকে অনেক খবরই পাওয়া যায়। এদের মধ্যে তিনটি সূত্র সমসাময়িক। সেগুলি হল, (১) ইব্‌ন্ বত্তুতার 'রেহ্‌লা' (ভ্রমণ-বিবরণী), (২) জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ ই-ফিরোজ শাহী', এবং (৩) ইসামির 'ফুতুহ-উস্-সলাতীন'। চতুর্থ সূত্র—য়াহিআ বিন শিরহিন্দীর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' আলোচ্য সময়ের শতাধিক বর্ষ পরে লেখা হলেও তাকে অপ্রামাণিক বলা যায় না, কারণ এর লেখক অনেক প্রামাণিক দলিলপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন,

"শামসুদ্দীন (ফিরোজ শাহ) মারা গেলে তাঁর সিংহাসন পেলেন তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দীন। পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বূরা—হিন্দীতে 'বূরা'র অর্থ 'কালো'—তাঁকে পরাস্ত করে সিংহাসন কেড়ে নিলেন এবং কুৎলু খান ও অন্যান্য ভ্রাতাদের বধ করলেন। শিহাবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন—এই দুই ভাই (গিয়াসুদ্দীন) তুগলকের কাছে পালিয়ে গেলেন; তিনি তাঁদের ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর পুত্রকে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রেখে যাত্রা করলেন। দ্রুতগতিতে লখ্‌নৌতি প্রদেশের দিকে অভিযান করে তা তিনি দখল করলেন এবং তার শাসক গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।"

জিয়াউদ্দীন বারনির বিবরণ এই বিবরণের সমর্থক ও পরিপূরক। তিনি লিখেছেন,

"প্রায় এই সময়ে লখনৌতি থেকে কয়েকজন আমীর এসে অভিযোগ করলেন যে পীড়নমূলক সব আইন জারী হওয়ার ফলে তাঁরা কষ্টভোগ

করছেন।* ফলে সুলতান (গিয়াসুদ্দীন তুগলক) লখনৌতি অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং সভাসদদের পাঠিয়ে উলুগ খান (মুহম্মদ তুগলক)-কে অরঙ্গল থেকে ডাকিয়ে আনলেন। তাঁকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং রাজ্যের সব বিষয়ের ভার নিজের অনুপস্থিতিকালে তাঁর উপর দিয়ে তিনি লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করলেন। গভীর জল এবং ধুলো-কাদার মধ্য দিয়ে তিনি এমনভাবে সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করে নিয়ে গেলেন যে কারও মাথার চুলেও আঘাত লাগল না। সুলতানের প্রতি ভীতি ও শ্রদ্ধা খুরাসান ও হিন্দুস্তানে সঞ্চারিত হয়ে পড়েছিল।...সুলতান যখন ত্রিহুতে পৌছোলেন, তখন লখনৌতির শাসক সুলতান নাসিরুদ্দীন সেখানে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আগমন করে সুলতানকে (গিয়াসুদ্দীনকে) সম্মান জানালেন।† তরবারি ব্যবহার না করা সত্ত্বেও, ঐ দেশের (ত্রিহুতের) রায় ও রানারা বশ্যতা স্বীকার করল। সুলতানের পালিত পুত্র তাতার খানকে‡ জাফরাবাদ অঞ্চলের ভার দেওয়া হল। তাঁকে এক সৈন্যবাহিনী দেওয়া হল ; তিনি সমগ্র (বাংলা) দেশকে সম্রাটের শাসনে আনলেন। সোনারগাঁওয়ের শাসক বাহাদুর শাহ কিছু পরিমাণে প্রতিরোধ করলেন ; তাঁর গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসা হল। ঐ দেশের সব হাতীকে রাজকীয় হাতীশালায় পাঠানো হল। এই যুদ্ধাভিযানে সৈন্যবাহিনী অনেক লুঠের মাল হস্তগত করল। সুলতান নাসিরুদ্দীন বিপুল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করার ফলে সুলতান (গিয়াসুদ্দীন) তাঁকে একটি ছত্র ও একটি দুরবাস (যষ্টি) উপহার দিলেন এবং লখনৌতিকে তাঁর শাসনাধীনে দিয়ে তাঁকে ফেরৎ পাঠালেন। সোনারগাঁওয়ের শাসক বাহাদুর শাহ গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরিত হলেন।"

গিয়াসুদ্দীন তুগলকের বাহিনীর সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ ইসামি দিয়েছেন। তাঁর বিবরণের সংক্ষিপ্তসার পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

---

* মনে হয়, এই সব আমীররা শিহাবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং গিয়াসুদ্দীন তুগলকের কাছে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা নানারকম অভিযোগ করে তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন।

† মনে হয় শিহাবুদ্দীন ইতিমধ্যে পরলোকগমন করেছিলেন, তাই একা নাসিরুদ্দীনই গিয়াসুদ্দীন তুগলককে অভ্যর্থনা জানালেন এবং যুদ্ধের পরে পুরস্কার পেলেন।

‡ এই নাম গিয়াসুদ্দীন তুগলকের দেওয়া।

দু' পক্ষের সৈন্যবাহিনী যখন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল, তখন বাহাদুর নিজের বাহিনীর মাঝখানে বইলেন। তিনি দিল্লীর বাহিনীর বাঁ দিকে আঘাত হানলেন। দিল্লীর বাহিনী অবস্থা সামলে নিয়ে এমনভাবে বাংলার বাহিনীকে চেপে ধরল যে তাদের মধ্যে গোলযোগ ও বিভ্রান্তি দেখা দিল। উপায়ান্তর না দেখে বাহাদুর পিছু হটলেন এবং কিছু দূরে অপসরণ করলেন। দিল্লীর বাহিনী তরবারি নিয়ে বাহাদুরের বাহিনীকে আক্রমণ করে সন্ত্রস্ত করে তুলল। বাহাদুরের মনে পড়ল তাঁর শুভ্রবর্ণা রক্তিমকপোলা হৃদয়-আকুল করা উপপত্নীকে, যিনি তাঁর তাঁবুতে ছিলেন। তাঁকে নিয়ে পালাবার জন্য বাহাদুর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। তাতার খান বাহাদুরের পিছু পিছু ধাওয়া করার জন্য এক বাহিনী পাঠালেন। বাহাদুরের বাহিনী দু' তিনটি ছোটখাটো পাহাড় পার হয়ে গিয়েছিল।* একটি নালা পার হতে গিয়ে বাহাদুরের ঘোড়া কাদায় আটকে গেল। বিপক্ষের লোকেরা তখন তাঁকে ধরে ফেলল এবং বন্দী করে বহরাম খানের কাছে নিয়ে গেল। 'তারিখ ই-মুবারক শাহী'র মতে হৈবতুল্লাহ্ খান কুশাবি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেন।

আগেই আমরা দেখে এসেছি যে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম গিয়াসুদ্দীন তুগলকের কাছে লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাই গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে পরাস্ত ও বন্দী করার ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলেও সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায়। নাসিরুদ্দীন লখনৌতি-অঞ্চলের স্বাধীন রাজা হতে পারেন নি, তাঁকে গিয়াসুদ্দীন তুগলকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। ৭২৪ হিজরায় লখনৌতি-টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ কিছু মুদ্রা পাই—তাতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন তুগলকের নামও লেখা আছে। সাতগাঁও ও সোনারগাঁও অঞ্চলে নাসিরুদ্দীনের কর্তৃত্ব ছিল না, এই দুই অঞ্চলের শাসনভার পেলেন বহরাম খান; ইনি পূর্বোক্ত তাতার খানের সঙ্গে অভিন্ন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করছি।

লখনৌতি রাজ্যে অভিযান শেষ করে ফেরার সময়ে দিল্লী থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত আফগানপুরে তাড়াহুড়ো করে তৈরী করা একটি মণ্ডপ চাপা পড়ে

* এর থেকে বোঝা যায়, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর সাবেক ময়মনসিংহ জেলার গিয়াসপুরে গিয়েছিলেন, কারণ এই অঞ্চলেই ঐ জাতীয় পাহাড় আছে।

গিয়াসুদ্দীন তুগলক মারা যান এবং তাঁর পুত্র মুহম্মদ তুগলক রাজা হন। তাঁর আমলে লখনৌতি-রাজ্যের অবস্থা এবং শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্রদের পরিণতি সম্বন্ধে যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি এখন উল্লেখ করছি।

ইব্‌ন্ বতুতা লিখেছেন,

"পিতার মৃত্যুর পর স্থলতান (মুহম্মদ তুগলক) যখন সম্রাট হলেন এবং জনসাধারণ যখন তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল, তিনি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বুরাকে ডেকে পাঠালেন—যাকে স্থলতান (গিয়াসুদ্দীন) তুগলক বন্দী করেছিলেন। তিনি (মুহম্মদ তুগলক) তাঁকে (গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে) অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন, তাঁর শৃঙ্খল মোচন করলেন এবং তাঁকে টাকাকড়ি, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি বহু মূল্যবান উপহার দিলেন। তাঁকে তিনি (মুহম্মদ তুগলক) আবার তাঁর রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন নিজের ভাই বহরাম খানকে সঙ্গে দিয়ে; তাঁর কাছে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে তাঁর রাজ্য যৌথভাবে উভয়ে (মুহম্মদ তুগলক ও বাহাদুর বুর) ভোগ করবেন, মুদ্রায় উভয়ের নাম লেখা হবে এবং উভয়ের নামে খুৎবা পড়া হবে; এছাড়া গিয়াসুদ্দীন (বাহাদুর) তাঁর পুত্র মুহম্মদকে—যে বর্বাট নামে বেশি পরিচিত—জামিন হিসাবে তাঁর (মুহম্মদ তুগলকের) কাছে পাঠাবেন, এই প্রতিশ্রুতিও তিনি আদায় করলেন। গিয়াসুদ্দীন (বাহাদুর) তাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন এবং যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করলেন, কিন্তু পুত্রকে পাঠালেন না সে যেতে চাইছে না এই অছিলায়; কথাবার্তাতেও তিনি শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। তার ফলে স্থলতান জনৈক দুলজি-উং-তাতারীর নেতৃত্বে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বহরাম খানের কাছে পাঠালেন। তাঁরা গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করলেন এবং তাঁর চামড়া ছাড়িয়ে ফেললেন; সেই চামড়ায় খড় ভরে সারা দেশে ঘোরানো হল।"

ইব্‌ন্ বতুতা অন্যত্র লিখেছেন,

"স্থলতান গিয়াসুদ্দীনের পুত্র মুহম্মদ বাহাদুর বুরকে ছেড়ে দেন; তিনি (বাহাদুর) তাঁর (মুহম্মদের) সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন এই শর্তে রাজী হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি কথার খেলাপ করলে স্থলতান মুহম্মদ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করলেন এবং তাঁর শ্যালককে (আসলে ধর্ম-ভাই) এই রাজ্যের শাসনভার দিলেন।" ইব্‌ন্ বতুতা কায়কোবাদের

রাজত্বের বিবরণ দেবার সময়েও গিয়'সুদ্দীন বাহাদুরের গিয়াসুদ্দীন তুগলকের হাতে বন্দী হওয়া এবং মুহম্মদ তুগলকের কাছে মুক্তি লাভের কথা বলেছেন।

মুহম্মদ তুগলকের বিরুদ্ধে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহ ও তার দমন সম্বন্ধে ইসামির বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবরণের ইংরেজী (ড. আগা মাহদী হোসেন কৃত) ও বাংলা (সংকৃত) অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত হল।

"One day a courier came from Bahrām of Lakhnanti and said with folded hands, 'Your Majesty ! Būra had revolted and had caused much bloodshed and disturbances. In Lakhnauti, Bahrām Khān marched against him and had so many of Būra's men killed that the soil was moistened with blood and Būra was completely defeated. He fled towards a river and plunged himself into the waters, but his horse stuck like a donkey in the mud. Instantly, he was pursued by Bahrām Khān who captured him alive. Then he killed him and skinned him and sent his skin to Your Majesty together with news of victory." (A. M. Hussain, Tughluq Dynasty, pp. 222-23)

"এক দিন লখনৌতির বহরামের কাছ থেকে একজন বার্তাবাহক (মুহম্মদ তুগলকের কাছে) এসে করযোড়ে বলল, 'মহারাজ ! বূরা বিদ্রোহ করেছিল এবং অনেক রক্তপাত ও অশান্তি ঘটিয়েছিল। লখনৌতিতে বহরাম খান তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বূরার এত লোককে বধ করেন যে মাটি রক্তে ভিজে যায়। বূরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। সে একটি নদীর দিকে পালায় এবং জলের মধ্যে নামে। কিন্তু তার ঘোড়া গাধার মত কাদায় আটকে যায়। তক্ষণি বহরাম খান তার অনুসরণ করে তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করেন। তারপর তিনি তাকে বধ করে তার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে, সেই চামড়া, জয়ের সংবাদের সঙ্গে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন।"

ইসামির এই বিবরণ খুবই তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান হলেও বিবরণটি আধুনিক গবেষকদের কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তও করেছে। এরই উপর নির্ভর করে ডঃ কানুনগো ও ডঃ করিম সিদ্ধান্ত করেছেন যে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে বহরাম খান তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করে তাঁকে পরাজিত ও

নিহত করেন এবং মুহম্মদ তুগলককে সেই খবর (গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের চামড়া সমেত) পাঠিয়ে দেন ; অর্থাৎ মুহম্মদ তুগলক গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহ, পরাজয় ও নিধনের কথা একই সঙ্গে জানতে পারেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ইব্ন্ বতুতার বিবরণের বিরোধী। ইব্ন্ বতুতার বিবরণ অনুসারে মুহম্মদ তুগলক আগেই গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহের খবর পেযে বহরাম খানের কাছে দুলজী-উৎ-তাতারীর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া বিদ্রোহের পরে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর "৭২৮ হিজরীতে শুধু স্বনামে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুদ্রা জারী করেন।" (বা. ই. সু. আ, পৃঃ ১৮০) অর্থাৎ তিনি মুদ্রা জারী করার জন্য যথেষ্ট সময় পেযেছিলেন। সুতরাং ইসামির বিবরণ, ইব্ন্ বতুতার বিবরণ এবং মুদ্রাব সাক্ষ্য মিলিয়ে নিলে বলা যায় যে—৭২৮ হিজরায গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর বিদ্রোহ কবেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এককভাবে নিজের নামে মুদ্রা জারী কবেন ; তখন বহরাম খান সে কথা মুহম্মদ তুগলককে জানান—মুহম্মদ তুগলকও তাঁর সাহায্যার্থে দুলজী-উৎ-তাতারীর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠান ; এইভাবে শক্তিবৃদ্ধি করে বহরাম খান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং সেই খবর (বিদ্রোহীর চামডা সমেত) মুহম্মদ তুগলককে পাঠান।

ইসামির বিবরণে লেখা আছে যে, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরেব পরাজয় ও নিধনের কথা শুনে মুহম্মদ তুগলক খুবই উল্লসিত হন এবং দীপালপুর শহরের জনসাধারণকে সঙ্গীত ও দামামাধ্বনি সহযোগে চার দিন ধরে আনন্দ করতে আদেশ দেন। তারপর তিনি এক দরবার আহ্বান করেন এবং সিংহাসনে বসে আদেশ জারী করেন যে "নির্বোধ বূরা"র চামড়া এবং মুলতানের বিদ্রোহী বহরামের (কিশলু খান) চামডা এক সঙ্গে উঁচুতে টাঙিয়ে রেখে সবাইকে দেখানো হোক্।

কিন্তু এ সম্বন্ধে ইব্ন্ বতুতার বিবরণ ভিন্নরূপ। ইব্ন্ বতুতা বলেন যে আব একজন নিহত বিদ্রোহী—মুহম্মদ তুগলকের আত্মীয় ও অন্যতম আঞ্চলিক শাসনকর্তা—বাহাউদ্দীন গুরশাস্পের চামড়া এবং গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের চামড়া একসঙ্গে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে সারা দেশ ঘোরানো হয়। বহরাম (কিশলু খান) তখন জীবিত ; তাঁর এলাকায় যখন মুহম্মদ তুগলকের লোকেরা এই দু'জনের চামড়া নিয়ে ঢুকল, তখন তিনি তা আটক করে কবর দেওয়ালেন ;

এতে বিরক্ত হযে মুহম্মদ তুগলক তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কিশলু খান যেতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলেন। মুহম্মদ তুগলক সেই বিদ্রোহ দমন করে তাঁকে বধ করলেন। এই দুই সমসাময়িক বিবরণে অনৈক্য থাকার দরুন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহ দমনের তারিখ স্থির করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে ৭২৭ হিজবার শেষ দিকে বাহাউদ্দীন গুরশ্যাস্প বিদ্রোহ করেন ; তাঁর বিদ্রোহ দমন ও নিধন, অতঃপর কিশলু খানের বিদ্রোহ করা, সেই বিদ্রোহ দমন ও কিশলু খানের বধ প্রভৃতি ঘটনাগুলি পরপর ঘটে এবং এগুলি ঘটতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল সন্দেহ নেই। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়,—গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর ৭২৮ হিজরায় বিদ্রোহ করেন ; তাঁর বিদ্রোহ দমন ও নিধনও খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয় নি ; গুরশ্যাস্প ও কিশলু খান—কারও বধের তারিখই সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না এবং এদের মধ্যে কার চামডা গিযাসুদ্দীন বাহাদুরের চামড়ার সঙ্গে একত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তা'ও বলা যাচ্ছে না। তবে ৭২৮ হিঃর পরে উৎকীর্ণ গিযাসুদ্দীন বাহাদুরের কোন মুদ্রা যেহেতু পাওয়া যায় নি, সেই হেতু মনে হয যে ৭৩০ হিঃর মধ্যেই তাঁর বিদ্রোহ দমিত হয় এবং তিনি নিহত হন।

তাঁব ভাই নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেও লখনৌতিতে নিরুপদ্রবে টিকে থাকতে পারেন নি। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে বাজত্বেব প্রথম বছবে মুহম্মদ তুগলক মালিক অজুদ্দীন য়াহিয়াকে আজম-ই-মুল্‌ক্ উপাধি দিয়ে সাতগাঁওয়ের 'ইক্তা' দেন। লখনৌতি অঞ্চলে তিনি পিণ্ডার খিলজীকে কদর খান উপাধি দিযে ইক্তাদার এব মালিক হিসামুদ্দীন আবু রেজাকে নিজামুদ্দীন উপাধি দিযে উজীর নিযুক্ত করেন। সুতরাং কদর খান নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে যুক্তভাবে লখনৌতি শাসন করার ভার পেলেন বোঝা যাচ্ছে। ইসামি 'ফুতুহ-উস্-সলাতীনে' লিখেছেন যে কিশলু খান বা বহরাম আয়না যখন মুলতানে বিদ্রোহ করেন, তখন নাসিরুদ্দীন লখনৌতি থেকে গিয়ে মুহম্মদ তুগলকের সঙ্গে যোগ দেন এবং মুলতানে গিয়ে বহরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এর পর তাঁর কী হল, তা জানা যায় না। তবে বাংলায় তিনি যে আর ফিরে আসেন নি, তা জোর করেই বলা যায়।

ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো নাসিরুদ্দীনকে "docile traitor" বলেছেন। কিন্তু নাসিরুদ্দীন যা করেছিলেন, তা না করলে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর তাঁকে বধ

করতেন। ভাই যখন প্রাণঘাতী শত্রু হয়—তখন তার বিরুদ্ধে যাওয়া মানে "traitor" হওয়া নয়। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে ডঃ কানুনগো "much nobler character" বলেছেন, কিন্তু তিনি ভাইদের হত্যা করেন এবং উপপত্নীকে সঙ্গে নিতে গিয়ে গিয়াসুদ্দীন তুগলকের হাতে ধরা পড়েন। মুক্তিদাতা মুহম্মদ তুগলককে যে কথা তিনি দিয়েছিলেন, তার খেলাপ করে বিদ্রোহী হন। আমাদের তাঁকে মানবতাবর্জিত বর্বর বলেই মনে হয়। বাংলার শাসকদের মধ্যে একমাত্র আলী মর্দানের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। কিন্তু আলী মর্দানের উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের তা'ও ছিল না।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরকে মুহম্মদ তুগলক যে সমস্ত শর্তে মুক্তি দেন, তার মধ্যে একটি এই যে, তিনি যে সমস্ত মুদ্রা প্রকাশ করবেন, তাতে তিনি ও মুহম্মদ তুগলক উভয়েরই নাম থাকবে—এই কথা ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তি সত্য ; "৭২৮ হিঃ/১৩২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। মুদ্রার এক পিঠে 'জরবে-বি-আমর আল-ওয়াসিক-বিল্লাহ মোহাম্মদ বিন তুগলক শাহ' (অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন তুগলকের আদেশে উৎকীর্ণ) এবং অন্য পিঠে 'আল-সুলতান আল-আজম গিয়াস আল দুনিয়া ওয়াল দীন আবুল মুজফফর বাহাদুর শাহ আল সুলতান বিন আল-সুলতান' (অর্থাৎ সুলতানের পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ) উৎকীর্ণ হয়। মুদ্রাগুলি সোনারগাঁও টাকশাল হইতে জারী করা হয়।···মুদ্রায় ইহাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাহাদুর মোহাম্মদ বিন তুগলকের আদেশে মুদ্রা জারী করেন। নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমের মুদ্রায় এইরূপ আদেশের কথা উল্লেখ নাই। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন যে দিল্লীর সুলতান ইবরাহীম অপেক্ষা বাহাদুরের প্রতি অধিকতর কঠোর শর্ত আরোপ করেন।" (ডঃ আবদুল করিম, বা. ই. সু. আ., পৃঃ ১৭৯-৮০)।

কিন্তু ডঃ আবদুল করিমই দেখিয়েছেন যে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের মুদ্রায় দিল্লীর সুলতানকে "সুলতান অল-আজম" উপাধিতে এবং নাসিরুদ্দীনকে নিম্নতর মর্যাদার উপাধি "সুলতান অল-মুয়াজ্জম"তে অভিহিত করা হয়েছে (বা. ই. সু. আ. পৃঃ ১৭৮)। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের মুদ্রায় কিন্তু তাঁকে "সুলতান অল-আজম"-ই বলা হয়েছে। আসলে, নাসিরুদ্দীন ও গিয়াসুদ্দীন উভয়েই মুদ্রায় নিজেকে দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ বলে ঘোষণা করেছেন, তবে ঘোষণা করার

ভাষাটা ভিন্ন রকম হয়েছে, কারণ নাসিরুদ্দীনের প্রতি শর্ত আরোপ করেছিলেন গিয়াসুদ্দীন তুগলক আর গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের প্রতি শত আরোপ করেছিলেন মুহম্মদ তুগলক।

এখন আমরা তাতার খান ও বহরাম খান একই লোক কিনা, সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এঁরা যে অভিন্ন লোক, সে কথা বারনি, ইসামি, ইব্‌ন্ বত্তুতা প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকদের লেখা বিবরণে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক বিবরণে বহরাম খান গিয়াসুদ্দীন তোগলকের পুত্র এবং তাতার খান তাঁর পালিত পুত্র বলে উল্লিখিত হয়েছেন; গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের প্রথম বিদ্রোহের সময়ে তাতার খান ও দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময়ে বহরাম খান তাঁকে দমন করেন; তাতার ও বহরাম উভয়কেই সোনারগাঁওয়ে সক্রিয় দেখতে পাই; এই সমস্ত বিষয় থেকে উভয়কে এক লোক বলে মনে হয়। উভয়ের অভিন্নতা এবং সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা হিসাবে বহরাম বা তাতারের নিয়োগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি পাই 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'। এই বইয়ে লেখা আছে,

"(মুহম্মদ তুগলক) তাতার খানকে—যিনি (গিয়াসুদ্দীন) তুগলক শাহ কর্তৃক সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হযেছিলেন এবং যিনি সুলতান মুহম্মদ শাহের ধর্ম-ভাই (adopted brother) ছিলেন—বহরাম খান উপাধি দিয়ে, এক দিন একশো হাতী, এক হাজার ঘোড়া ও এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং রাজকীয় ছত্র ও যষ্টি দিয়ে বাংলা ও সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠালেন।"

অর্বাচীন হলেও 'রিয়াজ'-এর বিবরণকে মোটামুটিভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, কারণ এর পিছনে সমসাময়িক সূত্রগুলির পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। তবে তাতার খানকে 'বহরাম খান' উপাধি মুহম্মদ তুগলক দেন নি, দিয়েছিলেন তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দীন তুগলক; বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' থেকে জানা যায় যে সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াসুদ্দীন তুগলক তাঁর "পুত্র"-দের উপাধি দান করেন, এঁদের মধ্যে একজন তাঁর কাছ থেকে বহরাম খান উপাধি লাভ করেছিলেন।*

* মালিক তাতার নামে গিয়াসুদ্দীন তুগলকের আর একজন পালিত পুত্র ছিলেন; গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর সময়ে ইনি শিশু ছিলেন। পরবর্তী কালে ইনি 'তাতার খান' উপাধি লাভ করেন

গিয়াস্থদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহ দমনের পরে ৭৩৯ হিঃ পর্যন্ত সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁওয়ে যথাক্রমে বহরাম খান, কদর খান ও অজুদ্দীন য়াহিআ নির্বিবাদে শাসন করেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ৭৩৯ হিজরায় বহরাম খান পরলোকগমন করেন। ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন, "সৈন্যবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন।" যতদূর মনে হয়, ইব্‌ন্ বত্তুতা বহরাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে কদর খানের মৃত্যুর ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং য়াহিআ বিন শিরহিন্দীর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' থেকে জানা যায় যে কদর খানই সৈন্যবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন এর কিছু দিন পরে। বারনি ও য়াহিআ বিন শিরহিন্দী দু'জনেই লিখেছেন যে—বহরাম খান স্বাভাবিকভাবে মারা যান।

বহরাম খানের মৃত্যুর পরে তাঁর তরবারি-বাহক ফখরুদ্দীন বিদ্রোহ করেন এবং এই ঘটনা থেকে বাংলার দু'শো বছর ব্যাপী স্বাধীনতার স্থচনা হয়। এই দু'শো বছরের ইতিহাস আমরা গ্রন্থান্তরে লিপিবদ্ধ করেছি।

এবং ফিরোজ তুগলকের রাজত্বকালে তাঁর অন্যতম প্রধান অমাত্য, সেনানায়ক ও পরামর্শদাতা হন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখে এসেছি, কীরকম ধীরে ধীরে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব প্রসারিত হয়েছিল। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেকাংশ সুরু থেকেই মুসলমানদের অধীনস্থ হলেও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ উড়িষ্যার রাজাদের (সম্ভবত তাঁদের সামন্তদের) অধীন ছিল এবং তা মুসলমান-অধিকৃত অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল; এই সব সামন্তের মধ্যে কয়েকজনের নাম সমসাময়িক শিলালিপি এবং মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানতে পারা যায়।

পূর্ববঙ্গে অনেক দিন সেন বংশীয় রাজাদের শাসন ছিল। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' অনুসারে লক্ষ্মণসেন ১১২৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে জীবিত ছিলেন এবং সেটি ছিল তাঁর রাজত্বের "রসৈকবিংশ" বর্ষ। "রসৈকবিংশ"=৬+২১=২৭ ধরা হয়, সে হিসাবে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম বছর হয় ১১০১ শক (১১৭৯-৮০ খ্রীঃ); "রসৈকবিংশ"র জায়গায় "রমৈকবিংশ" পাঠ ধরলে ২১-ও বোঝাতে পারে; সেক্ষেত্রে বলতে হবে লক্ষ্মণসেন ১১৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন এবং ১১৩৪ শক বা ১২১১-১২ খ্রীঃ অবধি জীবিত ছিলেন, কারণ তাঁর রাজত্বের ২৭শ বছরে উৎকীর্ণ একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে। যাহোক, তর্কের মধ্যে না গিয়ে আপাতত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের জানা শেষ বছর হিসাবে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দকে নেওয়া যাক্।

লক্ষ্মণসেন কবে মারা গিয়েছিলেন জানি না। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র বিশ্বরূপসেন। তিনি অন্তত ১৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন; তাঁর রাজত্বের ১৪শ বর্ষে উৎকীর্ণ একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে (দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, পৃঃ ১৩৪)। বিশ্বরূপসেনের পরে রাজত্ব করেছিলেন, সেন বংশের এমন কোন রাজার নাম জানা যায় না। তাঁর পুত্র সূর্যসেন পিতার রাজত্বের মাঝখানে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু পরে আবার বিশ্বরূপসেনই রাজা হন (দীনেশচন্দ্র সরকার, ঐ, পৃঃ ১৩৫)। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দেই যদি লক্ষ্মণ-সেনের মৃত্যু ও বিশ্বরূপসেনের সিংহাসনে আরোহণ ঘটে থাকে, তা হলে বলতে

হবে—বিশ্বরূপসেন অন্তত ১২২০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তিনি অথবা সূর্যসেন যবনদের পরাজিত করেছিলেন। (দীনেশচন্দ্র সরকার, ঐ, পৃঃ ১৩৫)। "যবন" বলতে এখানে নিশ্চয়ই গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে। আমরা এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখে এসেছি যে গিয়াসুদ্দীন ইওজ পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু দিল্লীর বাহিনী তাঁর রাজধানী অধিকার করেছে খবর পেয়ে তিনি ফিরে আসেন; ইওজের এই পশ্চাদপসরণকেই মদনপাড়া তাম্রশাসনে বিশ্বরূপসেন বা সূর্যসেনের হাতে যবনদের পরাজয়রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে যে গ্রন্থ রচনার সময়েও (আনুমানিক ১২৬৫ খ্রীঃ) লক্ষ্মণসেনের বংশধররা রাজত্ব করছিলেন।

অবশ্য মীনহাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণসেন সংক্রান্ত বিবরণ শোনেন ১২৪২ থেকে ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—যখন তিনি বাংলায় আসেন। কাজেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও লক্ষ্মণসেনের বংশধররা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করছিলেন, সে কথা বলাই মীনহাজের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয়।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ থেকে অষ্টম দশকে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করছিলেন দেববংশীয়েরা। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র, মধুসূদনের পৌত্র এবং বাসুদেবের পুত্র দামোদর কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমেত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রাজত্ব করতেন; তাঁর ১১৫৬, ১১৫৮ এবং ১১৬৫ শকাব্দের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, এদের মধ্যে প্রথমটি তাঁর ৪র্থ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত; এর থেকে বোঝা যায় তিনি ১১৫৩ শকে (১২৩১-৩২ খ্রীঃ) রাজা হন এবং অন্তত ১১৬৫ শক (১২৪৩-৪৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন (দীনেশচন্দ্র সরকার, ঐ, পৃঃ ৫২, ১৪১)। সেন রাজাদের 'অরিরাজবৃষভশঙ্কর', 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর', 'অরিরাজ-মদনশঙ্কর' প্রভৃতি উপাধির মত দামোদরদেব 'অরিরাজচানুরমাধব' উপাধি গ্রহণ করেন। এর থেকে মনে হয় দামোদরদেব সেন রাজাদের উৎখাত করে বা তাঁদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে পূর্ববঙ্গের বৃহদংশের অধিপতি হন; তিনি যে নিজেকে 'গৌড়' অর্থাৎ বাংলার* অধীশ্বর বলে মনে করতেন তা তাঁর তাম্র-

* ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারীরা সম্ভবতঃ নিজদিগকে 'গৌড়েশ্বর' বলে যাচ্ছিলেন, যদিও গৌড়নগর তখন তুর্কী মুসলমানের অধিকৃত ছিল।" কিন্তু 'গৌড়'

শাসনের এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়,

"খ্যাতো গৌড়মহীমহোৎসবময়ং চক্রে পুনশ্চ শ্রিয়া ॥

(রাজা দামোদর দেশের নষ্ট শ্রী পুনরুদ্ধার করে গৌড় দেশের মহোৎসব সম্পাদনা করেছিলেন।)

দামোদরদেবের পুত্র দশরথদেব পিতার পরে (অর্থাৎ ১২৪৩-৪৪ খ্রীঃ-র আগে নয়) রাজা হন। তিনি আরও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন এবং সেন রাজাদের (সম্ভবত শেষ) ঘাঁটি বিক্রমপুরও অধিকার করে নেন। তিনি 'অরিরাজদনুজ-মাধব' উপাধি† গ্রহণ করেছিলেন। এই উপাধির জন্যই তিনি কুলজীগ্রন্থে 'দনুজমাধব' এবং মুসলমানদের লেখা ইতিহাসগ্রন্থে 'দনুজ রায়' নামে অভিহিত হয়েছেন। তুগরল খানের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় বলবন এঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বলবন এই অভিযান শেষ করে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে ফেরেন এবং অভিযানে মোট তিন বছর ব্যয়িত হয়েছিল (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। সুতরাং ১২৮০ খ্রীঃ-র মত সময়ে বলবন ও দনুজ রায়ের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় অতএব দনুজ রায় অর্থাৎ দশরথদেব ১২৪৩ খ্রীঃ-র আগে রাজা হন নি এবং অন্তত ১২৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের পাকামোড়া ও আদাবাড়ি গ্রামে দশরথদেবের দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পাকামোড়া তাম্রশাসনের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে মুসলমান আক্রমণকারীদের কথা আছে বলে মনে হয় (দীনেশচন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৬৭ দ্রঃ),

পূর্বাং কূলমচেতনস্য নৃপতের্দোষাৎ পরৈরর্থিতৈ-
রাক্রান্তং বিকলাস্তদৈব সকলা লোকা ভয়াদাকুলাঃ।
শ্রীমানস্থ মহীপতির্দশরথো দেবো দ্যু-দেবোপমো
যৎপাদ-প্রণতাস্তয়-প্রমুদিতা ধর্ম্মার্থ-কামোদিতাঃ ॥

অর্থাৎ চেতনাহীন নৃপতির দোষে আমন্ত্রিত শত্রুগণ কর্তৃক পূর্বকূল (অথবা পূর্বকালে রাজ্যের নদীতীরবর্তী ভূভাগ) আক্রান্ত হওয়ায় সমস্ত প্রজা বিকল এবং

শব্দ তখন 'বাংলা' অর্থে ব্যবহৃত হত ; ডঃ সরকার যাকে 'গৌড় নগর' বলছেন, তা 'লক্ষ্মণাবতী' বা 'লখনৌতি' নামে অভিহিত হত।

† দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছিলেন, যে সেযুগে রাজারা অনেক সময় উপাধি দ্বারাই পরিচিত হতেন।

ভয়াকুল হয়েছিল; পরে শ্রীমান রাজা দশরথদেব স্বর্গদেবতার ন্যায় শোভা পেলেন এবং প্রজাগণ তাঁর চরণে প্রণত, শাসন-সংরক্ষণে আনন্দিত এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে সমৃদ্ধ হল।

"অনুমান করা যেতে পারে যে, সেন বংশের শেষ নরপতির নির্বুদ্ধিতার ফলে তদীয় রাজ্যের অর্থাৎ পূর্ববাংলার পূর্বাঞ্চল মুসলমান শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দশরথদেব এই শত্রুগণকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

উদ্ধৃত উক্তিটি ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের। তাঁর অনুমান সমর্থনযোগ্য। তবে এই মুসলমান আক্রমণ কবে ঘটেছিল, তা বিবেচ্য। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ১২৮০ খ্রীঃর আগে লখনৌতি-রাজ্যের তিনজন শাসক পূর্ববঙ্গে অভিযান করেছিলেন—গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহ, ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকী এবং তুগরল খান। এঁদের মধ্যে ইওজ শাহের আক্রমণ দশরথদেবের রাজা হবার আগে এবং তুগরলের আক্রমণ দশরথদেবের রাজত্বের শেষ দিকে ঘটেছিল। পাকামোড়া তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে প্রদত্ত হয়েছিল বলে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার দেখিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকীর আক্রমণকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। ইউজবকী ১২৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে অভিযান করেন; সম্ভবত তিনি কোন হিন্দু রাজার সাহায্য পেয়েছিলেন এবং দশরথদেব তাঁকে প্রতিহত করেন; এর পর ইউজবকী তাঁর রাজধানী তাজুদ্দীন অর্সলান খান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে খবর পেয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যান। দশরথদেব স্বতই তাঁকে বিতাড়িত করার কৃতিত্ব দাবী করেছেন।

"দনুজ রায়"-এর সঙ্গে চুক্তি করলেও বলবনের লুব্ধ দৃষ্টি যে তাঁর রাজ্যের উপর ছিল, তা বোঝা যায় বুগরা খানকে তিনি "দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ" জয়ের নির্দেশ দেওয়ায়। বুগরা খান সম্ভবত এ নির্দেশ কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউসের "বঙ্গের রাজস্ব থেকে প্রস্তুত" মুদ্রা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর আমলে পূর্ববঙ্গের খানিকটা বিজিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'বঙ্গ' শব্দকে সমগ্র পূর্ববঙ্গ হিসাবে কখনই গ্রহণ করা চলে না। মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের একটি শহরের নাম রেখেছিলেন 'বঙ্গ' (কোন্ শহর তা অবশ্য বলা যায় না); তার প্রমাণ, পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের 'বঙ্গ' ও 'সোনারগাঁও' দু' জায়গার টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রাই পাওয়া গেছে। (Numismatic Digest, Dec. 1978, p. 59)। ফিরোজ শাহই পূর্ববঙ্গে

মুসলমান-বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

মীনহাজ ই-সিবাজের গ্রন্থরচনার (অথবা সংবাদ প্রাপ্তির সময়ে) লক্ষ্মণ-সেনের বংশধররা রাজত্ব করছিলেন—এই উক্তির পিছনে কিছু সত্য থাকাও অসম্ভব নয়; 'পঞ্চরক্ষা' নামক একটি গ্রন্থের ১২১১ শকাব্দের ভাদ্র মাস অর্থাৎ ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা পুথির পুষ্পিকায় "গৌড়েশ্বব" মধুসেনের এইভাবে উল্লেখ মেলে,

"পরমেশ্বর পরমসৌগত-পরমরাজাধিরাজ-শ্রীমদ্গৌড়েশ্বর-মধুসেন-দেবকা নাং-প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শক-নরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ২" (R. C. Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 269, f.n. 78)।

এই মধুসেন কোথায় রাজত্ব করতেন, সে সম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে যেহেতু সেই সময়ে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা এবং পূর্ববঙ্গে দেববংশীয়েরা রাজত্ব করতেন, 'It is just possible that he was ruling in an obscure corner of Southern or Western Bengal, or had seized Eastern Bengal from Dasarathadeva or his successor." (Ibid, pp. 238 39) এর মধ্যে দক্ষিণ বা পশ্চিমবঙ্গের "obscure corner" এ রাজত্ব করার ধারণা সত্য বলে মনে হয় না, কারণ এরকম একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের শাসককে 'পঞ্চরক্ষা'-পুথির লিপিকর "গৌড়েশ্বর" বলবেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত ভূতপূর্ব সেন রাজাদের অনুরূপ উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তাই, তিনি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখতে হবে,

(১) ত্রয়োদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের পরে দশরথদেব (দনুজ রায়) বা আর কোন দেববংশীয়ের রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং ঐ শতাব্দীর দশম দশকে উৎকীর্ণ রুকনুদ্দীন কায়কাউসের "বঙ্গের রাজস্ব অবলম্বনে প্রস্তুত" মুদ্রা থেকে পূর্ববঙ্গে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার ইঙ্গিত মেলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নবম দশকে পূর্ববঙ্গে কে রাজত্ব করতেন, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; কিন্তু এই দশকেই মধুসেন রাজত্ব করতেন বলে প্রমাণ মিলছে। অতএব তিনি হিন্দু রাজাদের শেষ বড় ঘাঁটি পূর্ববঙ্গেই এই সময়ে রাজত্ব করতেন বলে মনে করা যায়।

(২) আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে (Jarrett's translation,

2nd Ed, Vol II, pp. 159 ff দ্রঃ) সেন রাজাদের নামের এক তালিকা দেওয়া আছে ; তালিকায় এঁদের নাম মেলে,

সুখসেন, বল্লালসেন, লখনসেন, মধুসেন, কেসু (কেশব) সেন, সদা বা সুর (সূর্য) সেন এবং নোজা।

হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবরণ নির্ভরযোগ্য না হলেও সেন রাজাদের সম্বন্ধে তিনি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়—কারণ বিজয়সেনের স্থলাভিষিক্ত 'সুখ সেন' এবং দেববংশীয় 'নোজা' (অর্থাৎ দনৌজামাধব বা দনুজমাধবকে বাদ দিলে এবং মধুসেনকে আপাতত হিসাবের বাইরে রাখলে) দেখা যায় যে, উপরে উল্লিখিত তালিকার সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং সেনবংশীয়।* সুতরাং মধুসেনকেও সেন-বংশীয় ধরা যায় এবং সেনবংশীয় রাজারা শেষ দিকে যেখানে রাজত্ব করতেন—সেই পূর্ববঙ্গেই তিনি রাজত্ব করতেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। সম্ভবত পূর্ব-বঙ্গের কিছু অংশ মুসলমান বিজয়ের আগে পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সেন রাজাদের অধীনে ছিল এবং মধুসেন সেখানেই রাজত্ব করতেন ; দশরথদেবের মৃত্যুর পরে দেববংশীয়দের অধীন এলাকা জয় করে তিনি তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিতও করে থাকতে পারেন।

* কেশবসেনের রাজত্ব করা সম্বন্ধে কিছু সংশয় থাকলেও তাঁর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কেশবসেনের (জয়দেবরচিত শ্লোকের অনুকরণে লেখা) শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সঙ্কলিত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের অন্যান্য দিক্

আগের পৃষ্ঠাগুলিতে বাংলার ইতিহাসের যে পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি, সেই পর্বের সামাজিক ইতিহাস, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার মত উপকরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। তাই, অনুমানের সাহায্যে এই সব বিষয় সম্বন্ধে কিছু জল্পনা-কল্পনা করা ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নেই।

মোটের উপর বলা যায়, এই পর্বটি হচ্ছে বাংলায় ইসলামের সম্প্রসারণের যুগ। এ যুগে মুসলমানরা নতুন নতুন এলাকা জয় করে নিজেদের অধিকার সম্প্রসারিত করছিলেন, সেই সঙ্গে এ দেশে ইসলাম ধর্মও বিস্তারলাভ করছিল। বহু মুসলমান "মধ্য প্রাচ্য" থেকে বাংলায় এসে ইসলামধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বর্ধিত করছিলেন (বহিরাগত কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমানের সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধর্ম-প্রচারক, তাঁদের প্রচেষ্টায় এদেশের বহু লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়; অনেককে আবার জোর করে বা লোভ দেখিয়ে মুসলমান করা হয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা নিপীড়িত, তাদের অনেকেই ইসলামের উদার সমাজব্যবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করল; "উচ্চ বর্ণের" হিন্দুদের বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীরাও অনেকেই মুসলমান হতে লাগল, কারণ এই ধর্মে এই জাতীয়া নারীদের পুনর্বিবাহের সুযোগ আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান হয়ে গেল, বাকীরা (চট্টগ্রামের কিছু লোক এর ব্যতিক্রম) হিন্দু-সমাজের মধ্যে চলে এল। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লুপ্ত হল। এই শতকে এদেশে এক "পরম সৌগত' রাজা মধুসেন ভিন্ন আর কোন বিশিষ্ট বৌদ্ধের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

দেশে মসজিদ, খান্‌কাহ্‌, মাদ্রাসাহ্‌ ইত্যাদি স্থাপনের কাজও চলছিল পুরোদমে। এক কথায় এই যুগেই ইসলামের আসন স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

এই যুগের হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না।

স্মৃতিশাস্ত্রে, কুলজীগ্রন্থে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজাদের তাম্রশাসনে তাঁদের সম্বন্ধে অল্পস্বল্প সংবাদ পাওয়া যায়। সেগুলি পড়লে মনে হয়, হিন্দুরা এই সময়ে উট-পাখীর নীতি অনুসরণ করে বাইরের এত বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে চোখ বুজে ছিল এবং প্রাচীন কালের জীবনযাত্রাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দিন যাপন করছিল।

এই যুগের লখনৌতি-রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থ ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই রাজ্য কতকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল ; এই অঞ্চলগুলিকে 'ইক্তা' বলা হত এবং এক একজন আমীর এক একটি 'ইক্তা'র 'মোক্তা' বা 'মুক্তি' অর্থাৎ শাসন-কর্তা নিযুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে অনেকগুলি 'ইক্তা' নিয়ে বৃহত্তর প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করা হয় এবং তার নাম দেওয়া হয় 'ইকলিম' (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য JASP, Vol. III, 1958, pp. 67-68 দ্রষ্টব্য)

তবে একটি ব্যাপার এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আলোচ্য সময়ে উৎকীর্ণ মোট ১২টি শিলালিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সেগুলি হচ্ছে—

(১) গিয়াসুদ্দীন ইওজ শাহের সিয়ান শিলালিপি (৬১৮ হিঃ)

(২) তুগরল তুগান খানের বিহার বড়ী দরগা শিলালিপি (৬৪০ হিঃ)

(৩) জলালুদ্দীন মাসুদ জানীর গঙ্গারামপুর শিলালিপি (৬৪৭ হিঃ)

(৪) মুগীসুদ্দীন ইউজবক শাহের শীতলমঠ শিলালিপি (৬৫২ হিঃ)

(৫) অর্সলান তাতার খানের বরাহদারী শিলালিপি (৬৬৫ হিঃ)

(৬)-(৯) রুকনুদ্দীন কায়কাউসের মহেশ্বর (মুঙ্গের), লক্ষীসরাই, দেবীকোট ও ত্রিবেণী শিলালিপি (৬৯২, ৬৯৭ ও ৬৯৮ হিঃ)

(১০) সুলতানের নামের উল্লেখহীন মহাস্থানগড় (বগুড়া) শিলালিপি (৭০০ হিঃ)

(১১)-(১৩) শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের ত্রিবেণী শিলালিপি এবং বিহারের দু'টি শিলালিপি (৭০৯, ৭১৩ ও ৭১৫ হিঃ)

[প্রথম ও চতুর্থ শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা এই বইয়ে সংশ্লিষ্ট সুলতানদের প্রসঙ্গে পাওয়া যাবে। বাকীগুলি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শামসুদ্দীন আহমদ প্রণীত **Inscriptions of Bengal, Vol. IV** দ্রষ্টব্য]

আমাদের আলোচ্য পর্বের দৈর্ঘ্য ১৩৪ বছর। সময়ের তুলনায় শিলালিপির

সংখ্যা কত কম ! পরবর্তী কালে কেবল আলাউদ্দীনের হোসেন শাহেরই ৬৪টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাছাড়া এ যুগে প্রায় সব শিলালিপিই রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বা বড় শহরে পাওয়া গেছে ; এর থেকে মনে হয় দেশের অভ্যন্তরে মুসলমানদের শাসন খুব পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যদিও তাঁদের সার্বভৌমত্ব সেখানে স্বীকৃত হয়েছিল। দেশের ভিতরে হিন্দু জমিদাররা বোধহয় নিজেদের এলাকায় প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসন চালাতেন এবং লখনৌতি রাজ্যের সুলতান ও শাসনকর্তাদের তাঁরা কখনও কর দিতেন, কখনও দিতেন না।

এই পর্বের বাংলা সম্বন্ধে সমসামযিক বৈদেশিক বিবরণী মাত্র দু'টি পাওয়া গেছে। প্রথমটির লেখক মার্কো পোলো। তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছেন,

"বাঙ্গালা প্রদেশ (চীনের) দক্ষিণে অবস্থিত। মার্কো পোলোর মহান খানের (কুবলাই খানের) সভায় অবস্থানের সময়ে (১২৭৫ থেকে ১২৯৩ খ্রীঃ) এই দেশটি তাঁর অধীনস্থ হয়নি। এই দেশের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর বাহিনী বেশ কিছুকাল ধরে ব্যস্ত ছিল কারণ দেশটি খুব শক্তিশালী এবং তার রাজাও দুর্ধর্ষ।†

"এই দেশটির নিজস্ব ভাষা আছে। (এখানকার) জনসাধারণ মূর্তিপূজক। এখানকার ষাড়েরা প্রায় হাতীর মত, কিন্তু অতটা বড় নয়। (এখানকার) অধিবাসীরা মাংস, দুধ এবং ভাত খায় ; এসব জিনিস তাদের প্রভূত পরিমাণে রয়েছে। এদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় এবং (এর) ব্যবসা খুব ভালই চলে। spikenard, galangal, আদা, চিনি এবং অনেক রকমের ভেষজ (এখানকার) মাটিতে উৎপন্ন হয়, এগুলি ক্রয় করতে ভারতের নানা জায়গা থেকে বণিকরা আসে। তারা খোজাদেরও দাস হিসাবে ক্রয় করে—তারা সংখ্যায় প্রচুর ; যেহেতু প্রত্যেক রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের চায়—বণিকেরা এই সব ক্রীতদাসদের অন্যান্য দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে' প্রচুর লাভ করে। দেশটি (পিকিং থেকে) ত্রিশ দিনের পথ।"

† মার্কো পোলো অন্যত্র লিখেছেন যে কিছুকাল পরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কুবলাই খানের সৈন্যরা বাঙ্গালা এবং মিয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ জয় করে ঐ দুই দেশকে কুবলাই খানের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, মার্কো পোলো যে সময়ে কুবলাই খানের সভায় ছিলেন না, তখনকার ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি লোকমুখে কতকগুলি গুজব শুনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।

এছাড়া, আলোচ্য পর্বে রচিত একটিমাত্র চীনা গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধে যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। বইটি হচ্ছে ছাও-জু-কুআ রচিত ছু-ফ্যান-চে। এতে লেখা আছে,

"পেং-কিএ-লোর [অর্থাৎ বাংলার] রাজধানী ছিল ছা-না-কি (লখনৌতি ?) শহরে এবং শহরটির দেওয়ালের বেষ্টনের পরিমাপ ১২০ লি। এই দেশের লোকেরা সাদা শাঁখের খোলাকে (অর্থাৎ কড়িকে) অর্থ হিসাবে ব্যবহার করে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে আছে তু-লো (তুলো) এবং তুলো থেকে তৈরী সাধারণ বস্ত্র।" (VBA, I, p. 98 দ্রঃ)

নবম পরিচ্ছেদ

বাংলায় অনুপ্রবেশকারী বহিরাগত মুসলমানগণ

দু'টি বিষয় থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বখতিয়াব খলজী কর্তৃক বাংলার অংশবিশেষ অধিকার করার আগে থাকতেই এদেশে মুসলমানরা আসত এবং তাদের অনেকে এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। সে দু'টি বিষয় এই,

(১) উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুব এবং পূর্ববঙ্গের ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফাদের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে, পাহাড়পুরের মুদ্রাটির তারিখ ৭৮৮ খ্রীঃ।

(২) ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বিখ্যাত দরবেশ নূর কুৎব আলমের একটি চিঠির সারাংশ পাওয়া গেছে (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ৩য় সং, পৃঃ ১০৯-১১০ দ্রঃ)। তাতে লেখা আছে, "প্রায় ৩০০ বছর বাদে ঐস্লামিক ভূমি বাংলায় বিশ্বাস (ধর্ম) ধ্বংসকারী কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।" বখতিয়ারেব বাংলায় আগমন ১৪১৫ খ্রীঃ-র ২১০-১১ বছর আগের ঘটনা। সুতরাং তারও ৮০।৯০ বছর আগে থাকতে এ দেশে ইসলাম ধর্ম ছিল বলে এ চিঠি থেকে মনে হয়।

কিন্তু এই দু'টি "প্রমাণ" চূড়ান্ত নয়। প্রথমটি সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম বলেন, "এখনও দেখা যায় যে, বাংলাদেশেব অনেক লোক মুসলমানী আমলের সিক্কা টাকা কবচ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের পরে যে এই মুদ্রা বাংলাদেশে আনীত হয় নাই, এই কথা জোর করিয়া বলা যায় না।" (বা. ই. সু. আ., পৃঃ ৪০) দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে বলতে পারি নূর কুৎব্ আলম যে অতীত ইতিহাসের সাল তারিখ— বিশেষত বখতিয়ারের বাংলায় আগমনের তারিখ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই; তর্কস্থলে যদি ধরে নিই যে ১৪১৫ খ্রীঃ-র ৩০০ বছর আগে থাকতে বাংলায় মুসলমান আসছিল—তা হলেও ১১১৫-১২০৫ খ্রীঃ-র বাংলাকে "ঐস্লামিক ভূমি" বলার সার্থকতা দেখা যায় না। সুতরাং নূর কুৎব্ আলমের এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নয়।

তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বখতিয়ারের আগেই কিছু কিছু মুসলমান পদার্পণ

করেছিলেন বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম বলেন, "চটগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবের মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই,···চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতেও আরবদের যোগাযোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়, চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চটগ্রামে একাধিক 'কদম রছুলের' অস্তিত্ব দেখা যায়। তা' ছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আল-করণ, সুলক বহর, বাকানিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে (বা. ই. সু. আ., পৃঃ ৫৫-৫৬)।

এর সঙ্গে আমরা আরও একটি যুক্তি যোগ করতে পারি। চট্টগ্রাম বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ দুর্গ ; এখনও সেখানে অনেক বাঙালী বৌদ্ধ বাস করেন। সুতরাং মুসলমান বিজয়ের আগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ রাজাদের অধীন ছিল বলে মনে হয়। হিন্দু রাজারা সাধারণত অন্য ধর্মের লোক সম্বন্ধে গোঁড়া হতেন। সুতরাং তাঁদের রাজ্যে মুসলমানদের প্রবেশ ও বসতি স্থাপন সহজসাধ্য ছিল না ; কিন্তু বৌদ্ধ রাজাদের রাজ্যে তা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল, যেহেতু বৌদ্ধ রাজাদের পরধর্ম সম্বন্ধে উদারতার অনেক প্রমাণ মেলে।

যা হোক, একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বখতিয়ারের আগমনের আগে বাংলায় একটু-আধটু মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকলেও এদেশে ব্যাপকভাবে মুসলমানী অনুপ্রবেশ ঘটে বখতিয়ারের আগমনের পরে। আমাদের আলোচ্য পর্বে বাংলায় যে সমস্ত মুসলমান এসেছিলেন অথবা যে সমস্ত অমুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় নীচে দেওয়া হল।

(১) কাজী রুকনুদ্দীন সমরখন্দী ঃ

ইনি একজন বড পণ্ডিত ছিলেন। 'অমৃতকুণ্ড' নামে যোগশাস্ত্রবিষয়ক একটি সংস্কৃত বইকে ইনি ফার্সী ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ করা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। সেটি এই :

মুসলমানরা ভারতের অনেক অঞ্চল জয় করার পরে ভোজর ব্রাহ্মণ নামে একজন যোগী আলী মর্দানের রাজত্বকালে কামরূপ থেকে বাংলায় আসেন এবং কোন এক শুক্রবার একটি মসজিদে প্রবেশ করে মুসলমান দরবেশদের খোঁজ নেন। তাঁকে রুকনুদ্দীন সমরখন্দীর কথা বলা হয়। কাজীর সঙ্গে কিছু আলাপ

আলোচনার পরে ভোজর ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে নিশ্চিত হন যে হজরৎ মুহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ ; অতঃপর ভোজর ব্রাহ্মণ মুসলমান হলেন এবং রুকনুদ্দীন সমরখন্দীকে এক খণ্ড 'অমৃতকুণ্ড' বই উপহার দিলেন। তার পরে সমরখন্দী যোগের চর্চা করে যোগী হলেন এবং ফার্সী ও আরবী ভাষায় 'অমৃতকুণ্ড' অনুবাদ করলেন। বইটি দশটি আখ্যায়ে বিভক্ত।

(২) মৌলানা তকী-উদ্দীন আরবী :

শাহ্ শোআইবের লেখা 'মনাকিব অল-আশাফিয়া' নামক প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় মৌলানা তকী-উদ্দীন মহিস্থনে (মহীসন্তোষ ?) থাকতেন। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম শেখ য়াহিআ—ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত দরবেশ শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির পিতা।

(৩) শেখ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামাহ্ :

ইনি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির গুরু এবং শ্বশুর। ইনি ছিলেন আইনজ্ঞ, হানাফী মতবাদেব অন্যতম বিশিষ্ট প্রবক্তা। এঁর সম্বন্ধে 'মনাকিব অল-আশাফিয়া'তে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তার সারমর্ম এই—

সাবালক হবার পরে আবু তওয়ামাহ্ ধর্মীয় নিবন্ধ রচনা করতে থাকেন এবং তাতে বিপুল দক্ষতার পরিচয় দেন ; আরব, ইরান ও পশ্চিম ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং যাদুবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিদ্বানরা, সাধারণ ব্যক্তিরা, ধনীরা, আমীররা ও মালিকরা—সর্বশ্রেণীর লোকই তাঁর অনুগত ভক্ত ছিলেন। আবু তওয়ামাহ্ কিছু কাল দিল্লীতে ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে দিল্লীর সুলতান বিচলিত হয়ে ভাবতে থাকেন তওয়ামাহ্ বোধহয় তাঁর সিংহাসন অধিকার করে নেবেন। এই ভেবে তিনি তাঁর অধীনস্থ সোনারগাঁও অঞ্চলে যেতে তওয়ামাহ্‌কে অনুরোধ করলেন। তওয়ামাহ্ তাঁর অনুরোধ বুঝতে পেরেও সোনারগাঁও অভিমুখে যাত্রা করলেন। মাঝপথে শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তওয়ামাহ্‌কে সঙ্গে করে সোনারগাঁওয়ে নিয়ে এলেন।

সোনারগাঁওয়ে থেকে আবু তওয়ামাহ্ অনেক বই লেখেন ; বহু শিষ্য তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতেন।

ডঃ আবদুল করিম মনে করেন তওয়ামাহ্ ১২৮২ থেকে ১২৮৭ খ্রীঃ-র মধ্যে সোনারগাঁওয়ে প্রথম আসেন। কিন্তু সোনারগাঁও তখনও সম্ভবত মুসলমানদের

দ্বারা বিজিত হয় নি। আমার মনে হয়, এর কিছু পরে—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে তওয়ামাহ্ সোনারগাঁওতে আসেন। তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন—জলালুদ্দীন বা আলাউদ্দীন খলজী। সোনারগাঁও এঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও সম্ভবত ঐ স্থানকে তাঁরা নিজেদের রাজ্যভুক্ত বলে দাবী করতেন। বাংলার সুলতান তখন ছিলেন সম্ভবত রুকনুদ্দীন কায়কাউস।

(৪) বাবা আদম শহীদ :

ইনি ছিলেন সূফী-মতাবলম্বী দরবেশ। সূফী মতাবলম্বী দরবেশদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলায় আসেন বলে মনে করা হয়। বিক্রমপুরের রামপাল গ্রামে এঁর সমাধি আছে। অবশ্য, ইনি আমাদের আলোচ্য পর্বে বর্তমান ছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

(৫) শাহ দৌলাহ্ শহীদ :

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে এঁর কবর আছে। কিংবদন্তী অনুসারে ইনি বিখ্যাত দরবেশ জলালুদ্দীন বুখারীর (১১৯২-১২৯১ খ্রীঃ) সমসাময়িক।

(৬) শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী :

ইনি একজন অতিবিখ্যাত দরবেশ। এঁর বাড়ি ছিল ইরানের তব্রিজে। বহু গ্রন্থে এঁর জীবনী পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণিক হ'ল তাঁর সমসাময়িক খওয়াজা কুৎবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর উক্তির সংগ্রহ 'ফওয়াইদ অল-সালকীন'। এই বই থেকে (এবং অন্যান্য বই থেকেও) জানা যায় যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী দু'জন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরে ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে (১২১০-৩৬ খ্রীঃ) দিল্লীতে আসেন। তারপর তিনি বাংলায় আসেন। 'শেক শুভোদয়া' (হলায়ুধ মিশ্রের নামাঙ্কিত) নামক বইতে লেখা আছে যে শেখ জলালুদ্দীন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলায় এসেছিলেন ও নানা কেরামতি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু 'শেক শুভোদয়া' জাল বই।

শেখ জলালুদ্দীন বাংলায় আসার পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ইব্ন্ বত্তুতা কামরূপ পর্বতমালায় গিয়ে (তিনি শেষ জীবনে সেখানেই বাস করতেন) তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তার এক বছর পরে, ১৫০ বছর বয়সে শেখ পরলোকগমন করেছিলেন—এই কথা ইব্ন্ বত্তুতা তাঁর ভ্রমণ-বিবরণে লিখেছেন। কারও কারও মতে ইব্ন্ বত্তুতা জলালুদ্দীন তব্রিজীর দেখা পান নি, জলালুদ্দীন কুনিয়াভীর (পরে আলোচনা দ্রঃ) দেখা পেয়েছিলেন। এই মত

আমি স্বীকার করি না (মৎপ্রণীত বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পরিশিষ্ট দ্রঃ)। ইব্‌ন্ বত্তুতা আর একটি কথা লিখেছেন যে শেখ জলালুদ্দীন ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে খলিফা অল-আব্বাসীর হত্যাকাণ্ডের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। বুকাননেব বিবরণীর মতে আলাউদ্দীন আলী শাহ (১৩৪১-৪২ খ্রীঃ) রাজা হবার আগে শেখ জলালুদ্দীনের দেখা পেয়েছিলেন ; শেখকে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন যে রাজা হলে একটি দরগাহ্ তৈরী করবেন, সে প্রতিশ্রুতি তিনি পালনও করেছিলেন।

(৭) শেখ জলালুদ্দীন কুনিয়াযী :

এঁর বাড়ি ছিল আধুনিক তুরস্কের অন্তর্গত কুনিয়া নামক স্থানে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বের অন্তর্গত ৯১১ ও ৯১৮ হিজরার দু'টি শিলালিপিতে এঁর কথা পাওয়া যায়। শিলালিপি দু'টির মতে এঁর পুরো নাম শেখ জলালুদ্দীন মুজাররদ। ৯১৮ হিঃর শিলালিপির মতে তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ এবং তাঁর দয়ায় শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে সিকন্দর খান গাজী শ্রীহট্ট জয় করেছিলেন। শ্রীহট্টবিজেতা সৈন্যদের অন্যতম এবং জলাল মুজাররদের অনুচর নুরুল হুদার বংশধর শেখ আলী শেরের লেখা 'শরহ্-ই-নজ্‌হল উল-আরওয়াহ্' এবং ঐ বই অবলম্বনে রচিত গউসীব 'গুলজার-ই-আব্রার' বইয়ে (রচনাকাল ১৬১৩ খ্রীঃ) এই শেখ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ অনুসারে শেখ তাঁর পীর অর্থাৎ গুরুকে বলেন যে তিনি জেহাদে (ধর্মযুদ্ধ) যোগ দিয়ে গাজী বা শহীদ হতে চান। পীর তাতে রাজী হয়ে তাঁর ৭০০ জন শিষ্যকে সৈন্য হিসাবে তাঁর সঙ্গে দেন। বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে শেখ অবশেষে ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে শ্রীহট্টে পৌছোলেন। এখানকার রাজা ছিলেন গোড়গোবিন্দ, তাঁর এক লক্ষ পদাতিক এবং বহু সহস্র ঘোড়সওয়ার সৈন্য ছিল। শেখের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। তাঁর রাজ্যও শেখের দখলে এল।

(৮) শেখ শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি :

এই সুফী দরবেশের কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। এঁর বাড়ি ছিল বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত মনেরে। তিনি বাংলার অন্তর্গত সোনারগাঁওতেও বহুদিন ছিলেন। সেখানে তিনি মৌলানা আবু তওয়ামাহ্‌র কাছে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। ত্রিশ বছর বয়স অবধি তিনি সোনারগাঁওয়ে ছিলেন। তারপর তিনি বিহারে চলে যান। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ও তাঁর

পুত্র কুৎলুগ খান তাঁর ভক্ত ছিলেন। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর সময়ে তিনি সোনারগাঁওয়ে ছিলেন। (৫ম পরিচ্ছেদ দ্রঃ)।

এঁরা ছাড়াও আরও অনেক মুসলমান পণ্ডিত বা দরবেশ যে এই সময়ে বাংলায় এসেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকজনের সম্বন্ধে গল্প-উপাখ্যান প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রামাণিকভাবে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। উপরে যাঁদের কথা বলা হল—তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্য, সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এঁদের অনেকেই বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের কারও কারও সঙ্গে সুলতান বা শাসকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা এ দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিলেন।

পরিশিষ্ট

(১) ভিন্নমুখী মতের বিচার

'তবকাৎ-ই-নাসিরী'র একমাত্র যে নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে (ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সংস্করণ, ১৯৮৩) তার পরিশিষ্টে অনু-বাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (Zakaria) সাহেব দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণসেনের যে রাজধানী-শহর জয় করেছিলেন তা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া বা নবদ্বীপ নয়, উত্তর বঙ্গের নওদা এবং বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযানের যাত্রাপথ সম্বন্ধে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সিদ্ধান্ত ভুল। আমরা যাকারিয়া সাহেবের শ্রম ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁর ঐ দুই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত নই। এই কারণে, আমরা যাকারিয়া সাহেবের আলোচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি এবং উদ্ধৃতির ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনমত [ ] বন্ধনীর মাঝখানে আমাদের মত ব্যক্ত করছি।

এখন যাকারিয়া সাহেবের লেখা উদ্ধৃত করা যাক্ (দু'একটি শব্দের ক্ষেত্রে বানান-ভুল সংশোধন করা হয়েছে)।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ বিজয়

কাজী মীনহাজ-ই-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থের ২০ তবকতে (২৮—২৯ পৃঃ) মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক 'নওদীহ্' বিজয়ের যে-বর্ণনা আছে তা নিম্নরূপ :

"দ্বিতীয় বৎসরে মোহাম্মদ বখতিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করলেন ও বিহার থেকে নির্গত হলেন। তিনি এমন অতর্কিতে (ও দ্রুতগতিতে) 'নওদীয়াহ্' সহরের দ্বারে উপস্থিত হলেন যে অষ্টাদশ-অশ্বারোহীর অধিক তাঁর সঙ্গে ছিল না ও অবশিষ্ট সৈন্য তাঁর পশ্চাতে আসতেছিল।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন নগর দ্বারে উপস্থিত হলেন তখন কাউকে তিনি কোন উপদ্রব করেননি। তাঁর শান্ত ও শিষ্টভাব দেখে কারো (মনে) এমন কোন সন্দেহ হয়নি যে তিনিই মোহাম্মদ বখতিয়ার। বরং তাদের মনে সম্ভবতঃ এমন ধারণা হয়েছিল যে (তাঁরা) বণিকদল এবং মূল্যবান অশ্ব (বিক্রয়ের জন্য)

এনেছেন। (এভাবে তাদের মনের মধ্যে রইল) যে পর্যন্ত না (তিনি) লখমনিয়ার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে অসি নিষ্কাশন করে আক্রমণ শুরু করলেন।

"এ সময়ে রায় (লখমনিয়াহ্) ভোজনে বসেছিলেন ও তাঁর সম্মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রে ভোজ্য দ্রব্য পরিবেশিত ছিল। এমন সময় রায়ের প্রাসাদ ও নগরের মধ্য থেকে আর্তনাদ (তাঁর কানে) এসে পৌছল। যখন তিনি প্রকৃত অবস্থা কি সে সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন মোহাম্মদ বখতিয়ার রাজপ্রাসাদ ও রাজ অন্তপুরে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন এবং লোকদেরকে তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করছেন।

"রায় নগ্নপদে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে নিজ প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেন ও তাঁর সমুদয় ধনাগার, হেরেমের নারী, দাস-দাসী, (তাঁর) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও (পুর) নারী তাঁর (মোহাম্মদ বখতিয়ারের) করতলগত হয় এবং তিনি অসংখ্য হস্তী অধিকার করেন। মুসলমান সৈন্যদের হস্তে এত লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হয় যে তা বর্ণনা করা যায় না। যখন তাঁর সমুদয় সৈন্য এসে পৌছল তখন তিনি সমস্ত নগর অধিকার করে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন।

"রায় লখমনিয়াহ্ সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌছে গেলেন। তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন (অর্থাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন)। তাঁর বংশধরগণ এ পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করছেন।

"যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ রাজ্য অধিকার করেন (তখন তিনি) 'নওদীয়াহ্' নগর ধ্বংস করেন এবং লখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সেই রাজ্যের (চতুষ্পার্শ্বস্থ) অঞ্চল তিনি অধিকার করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে (তাঁর নামে ?) খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন।"

প্রকৃত ঘটনার প্রায় ৩৮ বছর পরে গ্রন্থকার ৬৪১ হিজরী (১২৪৩ খ্রীঃ) সনে লখনৌতি আগমন করেন এবং খুব সম্ভব তখনই এই ঘটনা লোক মুখে শ্রবণ করেন। তিনি এ কাহিনী তখনই লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। এর প্রায় আরও ১৭ বছর পরে আলোচ্য গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়। কোন বিশেষ সূত্র থেকে মীনহাজ এ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন কিনা, তাও তিনি উল্লেখ করেননি।

মীনহাজের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তা এত অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে এ বর্ণনা

থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ বিজয় ও লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। [আমাদের মতে : মীনহাজের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা মীনহাজের বর্ণনা থেকে ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণেব চেষ্টা করেছি এবং যাকারিয়া সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে "সুস্পষ্ট ধাবণা'য় উপনীত হয়েছি।] কিন্তু এ বিষয়ে আব কোন নির্ভবযোগ্য তথ্য নেই। সুতরাং মীনহাজের বর্ণনাকে ভিত্তি কবে এবং সেটিকে বিজ্ঞানসম্মত উপাযে বিশ্লেষণ কবে একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মীনহাজের বর্ণনার অবান্তর অংশগুলি বাদ দিলে মোটামুটিভাবে যে-বিষয়গুলি দাঁড়ায সেগুলি হচ্ছে এই :

১। লখনৌতি নামক একটি শহর ও রাজ্য ছিল।

২। রায় লখমনিয়াহ্ নামক একজন নৃপতি সেই রাজ্যের অধিকারী ছিলেন।

৩। রায় লখমনিযাহ্ 'নওদীহ্' নামক স্থানে বসবাস রত ছিলেন।

৪। প্রকৃত ঘটনার প্রায় এক বছর আগে নওদীহ্‌তে অবস্থান কালে রায় মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিহার অধিকার ও সেখানে তাঁর অবস্থানের সংবাদ পান।

৫। মোহাম্মদ বখতিয়ার আঠারজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ অতর্কিত নওদীহ্ আক্রমণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যের আগমন ঘটলে তিনি শহর অধিকার করেন।

৬। বৃদ্ধ নৃপতি রায় লখমনিযাহ্ নওদীহ্ পরিত্যাগ করে বঙ্গ ও সকোনাত রাজ্যে পালিয়ে যান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৭। মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্ অধিকার করে অনেক ধনরত্ন ও হস্তী হস্তগত করেন।

৮। মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্‌তে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং সে নগর ধ্বংস করেন।

৯। মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

১০। মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতির চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অধিকার করে সেখানে খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মীনহাজ বর্ণিত 'নওদীহ্' এবং নবদ্বীপ অভিন্ন। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে নওদীহ্ নবদ্বীপ নয় এবং এটি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন স্থান। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটিকে নিম্নলিখিত অংশে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে : (ক) রায় লখমনিয়া ও লখনৌতি, (খ) নওদীহ্ ও নবদ্বীপ, (গ) নওদীহ্ ও নওদা, (ঘ) মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ্ আক্রমণ ও বিজয়।

(ক) রায় লখমনিয়া ও লখনৌতি

সেন রাজবংশের বিভিন্ন লিপি পাঠে জানা যায় যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের অধিবাসী বীরসেনের বংশোদ্ভূত সামন্ত সেন ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং সে অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁর পুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয় সেনের বারাকপুর তাম্রশাসনে তাঁকে মহারাজাধিরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বিজয় সেন অন্যান্যদের মধ্যে গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এবং বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন। এঁদের পরে সেন রাজবংশের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।*

সেন বংশীয় নৃপতিদের বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তাঁদের জয়স্কন্ধবার ও রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। সমসাময়িক কবি ধোয়ী রচিত 'পবন দূত' (৩৬ সূক্ত, J. A. S. B. 1905, p. 48) নামক কাব্য থেকে জানা যায় যে বিজয়পুর নামক স্থানে বিজয় সেনের রাজধানী ছিল। রাজশাহী শহর থেকে আনুমানিক ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ও অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ বিজয়নগর নামক স্থানকে পণ্ডিতেরা বিজয়পুর বলে চিহ্নিত করেন। [আমাদের মতে : এ কথা ভুল। মনোমোহন চক্রবর্তী (M. Chakravarti), রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে বিজয়পুর—নদীয়া বা নবদ্বীপ ; এঁদের মত যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৬ দ্রঃ)।] বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে উল্লিখিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ও

* অত্র গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকায় সেন রাজাদের তালিকা ও রাজত্বকাল দ্রঃ।

দীঘি এ স্থানের নিকটেই অবস্থিত। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ধার্যগ্রাম (?) নামক স্থানের নিকটে অবস্থানকালীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্র অঞ্চলের অধীনে 'দাপুনিয়া পাটক' নামক স্থানে তিনি ভূমি দান করেছিলেন। ধার্যগ্রাম পাঠ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন। তবে এস্থান যে বিক্রমপুর বা নবদ্বীপ নয়, এ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এতে দেখা যাচ্ছে যে বিক্রমপুর, বিজয়পুর ও ধার্যগ্রাম (?) নামক তিনটি স্থান সেন নৃপতিদের প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চল অধিকার করে সেখানে বসবাস রত ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পুত্র বিজয় সেন প্রথমে রাঢ় ও নিকটবর্তী বরেন্দ্র অঞ্চল অধিকার করে তাঁর প্রথম রাজধানী বিজয়পুরে এবং পরে বঙ্গ-সমতট অধিকার করে তাঁর দ্বিতীয় বাজধানী বিক্রমপুরে স্থাপন করেছিলেন, এ ধারণা অসঙ্গত মনে হয় না। তিনি গৌড়রাজকে বিতাড়িত করেছিলেন বলে দেওপাড়া শিলালিপিতে উল্লিখিত হলেও গৌড়ে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এমন বর্ণনা কোথাও নেই। গৌড় থেকে বিজয়পুবের সরাসরি দূরত্ব খুব বেশী নয়—আনুমানিক ৪০ মাইল মাত্র। বিজয়পুরে তাঁর রাজধানী স্থাপনের পর ক্ষয়িষ্ণু পাল নৃপতিরা গৌডে নিরুপদ্রবে রাজত্ব কবতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সে সময় গৌড় নগরী তাঁদেব অধিকারে ছিল কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলাব পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন নিজে গৌড় নগরে কোনকালে অবস্থান রত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সেন নৃপতিদের দলিলপত্রে কোথাও কোন উল্লেখ নেই। অথচ মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে গৌড-লক্ষ্মণাবতী ছিল তাঁর প্রধান শাসন কেন্দ্র। তাঁদেব মতে এটি ছিল একটি বিরাট নগরী এবং সেই নগরীর নামের সাথে সংযুক্ত করে প্রায় সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলকে লখনৌতি রাজ্য বলে অভিহিত করে গেছেন মীনহাজসহ অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক।

লখনৌতি অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতীর প্রাচীন নাম যে গৌড় ছিল তাতে সন্দেহ নেই [আমাদের মতে : সন্দেহ আছে]। খুব সম্ভব মহারাজা লক্ষ্মণসেন সেস্থানে নূতন করে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে সেটিকে লক্ষ্মণাবতী নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রাচীন গৌড় নগরীর বল্লাল বাড়ী

নামক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ একটি স্থানকে মহারাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে জনপ্রবাদ মতে যুক্ত করা হয়। সেখানে মহারাজা লক্ষ্মণসেনসহ কোন সেন নৃপতির রাজধানী বা জয়স্কন্ধবার ছিল বলে তাঁদের দলিল-পত্রে পাওয়া যায় না। আর মীনহাজ তাঁর সমগ্র গ্রন্থে কোথাও গৌড় নামের উল্লেখ করেননি। ফারসী 'গোর' শব্দের অর্থ কবর। কেউ কেউ বলেন যে এ শব্দের প্রতি অনীহা বশতঃ মীনহাজ গৌড় (ফারসীতে গৌড়শব্দও 'গোর' লিখতে হয়) শব্দ ব্যবহার করেননি। কিন্তু মীনহাজ এত বড় ভুল করবেন এবং লখনৌতি নামক কাল্পনিক নাম ব্যবহার করবেন, তা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। লক্ষ্মণাবতী নাম অস্তিত্বশীল ছিল বলেই যে তিনি এ নাম ব্যবহার করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

বাঙলার পালবংশের শেষ নৃপতি মদন পালদেবের মনহলী তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি আট বছর গৌড় অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। ১১৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দকে তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষ বলে ধরা হয়ে থাকে। সে সময়ে বিজয় সেনের (২৩ পৃষ্ঠার, ৩ পাদটিকা দ্রঃ) সঙ্গে যে-গৌডাধিপতির যুদ্ধ হয় এবং বিজয় সেন যাঁকে বিতাড়িত করেন তাঁকে মদন পাল বলে ধরা যেতে পারে। মদন পাল এর পরে বাঙলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গোবিন্দ পাল ও পলপাল নামক পাল উপাধিধারী দু'জন নৃপতি বিহারের একাংশে নামে মাত্র রাজা ছিলেন বলে জানা গেলেও বাঙলায় এঁদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এতে ধারণা করা যায় যে মদন পালকে বিতাড়িত করে বিজয় সেন খুব সম্ভব গৌড় অধিকার করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে তাঁর গৌড় বিজয়কে 'কুমার কেলি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই কুমার কেলি তাঁর পিতামহ বিজয় সেনের সময়ের ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে প্রদত্ত তর্পণদীঘি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি দিনাজপুর অঞ্চলে (গৌড় থেকে আনুমানিক ৩০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত) ভূমিদান করেছিলেন। এতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে যে এ অঞ্চল তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন এবং সেই উত্তরাধিকার তাঁর পিতামহ বা পিতার সময় থেকে হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

পিতা বা পিতামহ যাঁর কাছ থেকেই এ-উত্তরাধিকার হোক না কেন, গৌড়

নগরী বা রাজ্য তিনি তাঁর রাজত্বকালে যে অধিকার করেননি তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন প্রত্নপ্রমাণে জানা যায় যে তিনি সর্বমোট ২৬ কি ২৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন (২৩ পৃ. ৩ পাদটীকা দ্র.)। মীনহাজের বর্ণনা মতে অবশ্য তাঁর রাজত্বকালকে প্রায় ৮০ বছর বলে ধরতে হয় (২৩ পৃ. দ্র.)। এর সমর্থনে মীনহাজের উক্তি ছাড়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন মীনহাজের এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাঙলার উত্তরাঞ্চল অধিকার করার সময় প্রায় সমগ্র বাঙলাদেশ, কামরূপ (ভারত) ও পশ্চিম বঙ্গ (ভারত) সেনদের অধিকারে ছিল বলে প্রত্ন-প্রমাণে জানা যায়। উত্তরবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অর্থাৎ সেকালের বরেন্দ্র ভূমি (আরও প্রাচীনকালের পৌণ্ড্র রাজ্য) খুব সম্ভব গৌড় দেশ নামে অধিক পরিচিত ছিল। দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বিজয় সেন গৌড়াধিপতিকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে খুব শ্লাঘা বোধ করেছিলেন।† তিনি ও তাঁর পুত্র নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেন নি। লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজত্বের একদম শেষ ভাগে নিজেকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেছিলেন। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন গৌড় দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন হয়েও নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন বলে তাঁদের তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রপিতামহ বিজয় সেন ও পিতামহ বল্লাল সেন যাঁরা কোনদিন নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে অভিহিত করেননি, তাঁদেরকে এবং তাঁদের পিতা লক্ষ্মণসেন যিনি জীবনের একদম শেষ প্রান্তে নিজেকে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত করেছিলেন, তাঁকেও এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অথচ সেনদের দলিলপত্রে কোথাও দেখা যায় না যে গৌড় নগরে তাঁদের কোন রাজধানী, জয়স্কন্ধবার অথবা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। [আমাদের মত : 'গৌড়েশ্বর' মানে বাংলার রাজা।] এমন কি, কোন সেন নৃপতি এখানে বসবাসরত ছিলেন, সে উল্লেখও কোথাও নেই। এই নগরীর নাম যে লখনৌতি অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী ছিল সে উল্লেখও তাঁদের দলিলপত্রে কোথাও পাওয়া যায় না।

সে যা হোক, মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন বিহার অধিকার করেন তখন মহা-

† Inscriptions of Bengal, vol III, p 53—N G. Majumdar.

রাজা লক্ষ্মণসেন লখনৌতিতে ছিলেন না বলে মীনহাজ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। 'নওদীহ' নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল।

(খ) নওদীহ্ ও নবদ্বীপ

মীনহাজের বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে মেনে নিতে হয় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক নওদীহ্ বিজয়ের কমপক্ষে এক বছর আগে থেকেই মহারাজা লক্ষ্মণসেন এস্থানে বসবাস রত ছিলেন এবং এ স্থান থেকেই তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের দৈহিক আকার ও অবয়ব সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য চর প্রেরণ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ স্থান কোথায় এবং নবদ্বীপের সঙ্গে এ স্থানের সম্পর্ক কি ?

প্রচলিত মত অনুসারে এ স্থান বর্তমান নদীয়া জেলার (পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) নবদ্বীপ এবং গঙ্গার (ভাগীরথী) তীরে অবস্থিত এ পুণ্য ভূমিতে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন ধর্মকর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে এ স্থান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

নবদ্বীপের নামকরণ নিয়ে বিতর্কের অবধি নেই। এক মতে নয়টি দীপ জ্বালান হত বলে এ স্থানকে নবদীপ বলা হত এবং নবদীপ থেকে নবদ্বীপ নামের সৃষ্টি। অন্য মতে নয়টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত বলে এ স্থানের নাম হয়েছিল নবদ্বীপ। আর এক মতে এ স্থানের উত্তরদিকে প্রথমে একটি দ্বীপের সৃষ্টি হলে সেটিকে অগ্রদ্বীপ বলা হত। পরে আলোচ্য নবদ্বীপের সৃষ্টি হলে নূতন দ্বীপ অর্থে এটিকে নবদ্বীপ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আরও অনেক মতবাদ আছে। কোনটি সত্য তা বলা কঠিন।

শুধু নামকরণ নয়, এ স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। গঙ্গা-ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বলে এ ধরনের আর দশটা স্থানের মত নবদ্বীপও যে হিন্দুদের কাছে বরাবরই পবিত্র ভূমি বলে গণ্য ছিল, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু কবে এ স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল এবং কবে থেকে এখানে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। [আমাদের বক্তব্য : ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (চৈতন্যদেবের বয়স তখন মাত্র আট বছর) রচিত মহাদেব আচার্যসিংহের 'মালতীমাধবটীকা'য় নবদ্বীপকে "ধীরগণাস্পদপুর" বলা হয়েছে এবং এখানে মজিলীশ বার্বক নামে গৌড়রাজের একজন সচিব ছিলেন।

বলা হয়েছে (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ৩য় সং, ৮ম অধ্যায়, পৃ: 122)। এর থেকে বোঝা যায় ১৪৯৪ খ্রীঃর অনেক আগে থেকেই নবদ্বীপে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল।] শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (জন্ম ১৪৮৬ খ্রীঃ) পরে নবদ্বীপ যে পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, এর আগে এ স্থানের সেই পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। [আমাদের বক্তব্য : চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লেখক বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'-এ লেখা আছে যে চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই নবদ্বীপ একটি বিশিষ্ট স্থান বলে গণ্য হত এবং নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির তো কথাই নেই, সুদূর শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম থেকেও হিন্দুরা (বিশেষত ব্রাহ্মণরা) নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রও (চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই) শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। তা ছাড়া নবদ্বীপ শুধু বৈষ্ণবদের কাছে নয়, শাক্তদের কাছেও পবিত্র তীর্থস্থান। শাক্তেরা চৈতন্যদেবকে মানতেন না।]

নদীয়া নামের উৎপত্তি কবে, কেমন করে ও কোন সূত্রে, সে সম্পর্কেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। যদি নবদ্বীপকে নদীয়া না বলা হয় তবে নদীয়া বলে কোন স্থানের নাম এ জেলায় নেই। ইংরেজ আমলে জেলা হিসাবে নদীয়া নাম গৃহীত হয়েছিল। নবদ্বীপ নামের বিকৃত রূপ হিসাবে যদি নদীয়া (<নদীপা<নদীপ<নদ্বীপ<নবদ্বীপ) কে যদি ধরা হয় তবে নদীয়া নামের সূত্র হিসাবে নবদ্বীপকে পাওয়া যায়। আর মুসলমানদের আগমনের আগে ফারসী ভাষার এই নোদীয়হ বা নওদীহ্† (=নূতন+গ্রাম বা শহর) নাম যে বাঙলাদেশে ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নির্মিত মন্দির, বিহার, স্তূপ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ নবদ্বীপে নেই যাতে করে এ স্থানকে সে যুগের কোন নৃপতির প্রশাসনিক কেন্দ্র বলে ধরা যেতে পারে। মুসলমান আমলে নির্মিত মসজিদ, মাজার, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষও সেখানে নেই। এ কারণে ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন :

[আমাদের বক্তব্য : এখানে যাকারিয়া সাহেব বিরাট ভুল করেছেন।

---

† মেজর রেভার্টির মতে এ নামের উচ্চারণ 'নুদীয়হ' বা 'নোদিয়া' (Nudiah)। এ নামই প্রচলিত হয়ে আসছে এ সম্পর্কে পরে আলোচনা দ্রঃ।

History of Bengal, vol. II-র এই অংশ কালিকারঞ্জন কানুনগোর লেখা নয়, যদুনাথ সরকারের লেখা ; ঐ বইয়ের সূচীপত্র দ্রঃ।]

'এমন কোন প্রমাণ নেই যে নবদ্বীপ সেন নৃপতিদের স্থায়ী রাজধানী ছিল। গঙ্গাতীরে অবস্থিত এটি ছিল একটি পুণ্য স্থান মাত্র এবং পবিত্রতার জন্য ধার্মিক ব্যক্তিরা এখানে বসবাস করতেন। সেন নৃপতির আগমনে জনসমৃদ্ধ রাজ-দরবারের প্রয়োজন মিটাবার তাগিদে অসংখ্য বণিক ও রাজকর্মচারির আবির্ভাব হেতু এখানে একটি নগর গড়ে উঠে। নগরটিতে অবশ্য বাঁশ-খড় ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত কাঁচা ঘর ছিল।...কোন দুর্গ বা ইষ্টক নির্মিত কোন প্রাচীর নবদ্বীপের প্রতিরক্ষার্থে তখন বা এর পরে নির্মিত হয়েছিল বলে কোন ঐতিহাসিক বলেননি এবং বারশ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব সেখানে এ ধরনের কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। মেগাস্থিনিস কর্তৃক উল্লিখিত প্রাচীন পাটলিপুত্রের শালবৃক্ষের প্রাচীরের মত কোন বাঁশের প্রাচীর নগরের প্রধান অংশকে পরিবেষ্টিত করত এবং দ্বারে খুব সম্ভব একটি নগর শুল্ক কেন্দ্র ছিল।'†

এ সব যুক্তি কি সত্যই গ্রহণযোগ্য ? [আমাদের মতে : এসব যুক্তি গ্রহণ-যোগ্য নয়।] বাঙলার উত্তরাঞ্চলে সেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হযেছিল তাঁদের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে। অথচ সেই উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে রাজশাহী জেলার উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, অবিভক্ত সমগ্র দিনাজপুর জেলায়, রংপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা।) এবং সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলায় সেন যুগের অসংখ্য প্রাচীন অট্টা-লিকার ধ্বংসাবশেষ ও ভাস্কর্যের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। দিনাজপুর জেলার প্রায় প্রতিটি প্রাচীন গ্রামে সেন যুগের কিছু না কিছু কীর্তি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। সে সব স্থানের সব ক'টিকে অবশ্য সেনদের প্রশাসনিক কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

মীনহাজের বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে নোদীয়হ্ বা নওদীহ্ বিজয়ের কমপক্ষে এক বছর আগে থেকেই লক্ষ্মণসেন যেখানে বসবাসরত ছিলেন। বর্ণনার মর্ম থেকে অনুমিত হয় যে তিনি বেশ দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বাস কর-

† হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, ভলিয়ুম টু, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ৫ পৃ.। তাঁর ইংরেজী বক্তব্যের অনুবাদ উপরে দেওয়া হল।

ছিলেন। কারণ, মীনহাজেব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সেখানে তাঁর রাজধানী (দার-উল-মুল্‌ক্) ছিল। সেখানে একটি নগরী ছিল, সেই নগরীর তোরণ ছিল, সেই নগরীতে রাজার প্রাসাদ ছিল এবং সেই প্রাসাদে রাজার ধনাগার, হেরেমের দাসদাসী পুরনারী প্রভৃতি ছিল (২৬ ও ২৭ পৃঃ)। সেই রাজধানীতে রাজাব অসংখ্য সৈন্য ও হস্তী ছিল। মোহাম্মদ শিরান খলজী একাই ১৮টি হস্তী অধিকার করেছিলেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন (৪৬ পৃঃ)।

এসব বর্ণনা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে মহারাজা লক্ষ্মণসেন যেখানে অবস্থানরত ছিলেন সেটি শুধু ধর্মকর্মের আস্তানা ছিল না, বরং সেখানে প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত সর্বপ্রকাব উপকরণাদিব ব্যবস্থা ছিল। [আমাদের মতে: নদীয়া বা নবদ্বীপ লক্ষ্মণসেনেব পূর্ণাঙ্গ রাজধানী ছিল।] সেক্ষেত্রে রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে বহু দেব-মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায়। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দেব-দ্বীজে ভক্তির কথা সুবিদিত। মীনহাজও তাঁকে সে জন্য অনেক প্রশংসা করে গেছেন। তিনি পূজা-অর্চনার জন্য তাঁর রাজধানীতে কোন মন্দির নির্মাণ করেন নি, একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা যায় না।

মহারাজা, তাঁর অমাত্য ও কর্মচারীদের বাসগৃহ কাঁচা থাকা বিচিত্র নয়। সেকালে অনেক নৃপতি কাঁচা গৃহে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু মন্দিরের বেলায় একথা খাটে না। এদেশের নৃপতিদের পাকা বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত অসংখ্য দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এদেশের সর্বত্র আছে। তখনকার দিনের নৃপতিরা নিজের বাসগৃহের চেয়ে মন্দিরের প্রাধান্য দিতেন অনেক বেশী। মহারাজা লক্ষ্মণসেনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়, বিশেষ করে তিনি যখন একজন অতি ধার্মিক নৃপতি ছিলেন। তাঁর প্রজাদের নির্মিত অসংখ্য দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তাঁর সারারাজ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মত একজন ধার্মিক নৃপতি তাঁর রাজধানীতে কোন পাকা মন্দিরাদি নির্মাণ করবেন না, তা কল্পনারও বাইরে। এ প্রসঙ্গে আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমগ্র নবদ্বীপ শহরে সেন আমলের কোন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। [আমাদের বক্তব্য: সেন আমল কেন, চৈতন্যদেবের

আমলেরও কোন মন্দির প্রভৃতি নবদ্বীপে খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের বাড়ি কোথায় ছিল, তা'ও জানা যায় না। আসলে ভাগীরথী নদীর গতিপথ বার বার পরিবর্তিত হওয়ার ফলে নবদ্বীপের সমস্ত প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখনকার নবদ্বীপ শহরই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, তা জোর করে বলা যায় না। ভাগীরথীর পূর্ব তীরের মায়াপুর গ্রামও নিজেকে আসল নবদ্বীপ বলে দাবী করে, মায়াপুরে বিশাল "বল্লালসেনের ঢিবি" আছে যা সেন আমলের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ।]

খুঁজে পাওয়া যায়নি কোন দুর্গ, ইষ্টক, বা মৃত্তিকা নির্মিত কোন প্রতিরক্ষা-প্রাচীর অথবা সেই প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত কোন পরিখা। ডক্টর কানুনগো বলতে চেয়েছেন যে সেখানে একটি বাঁশের বেড়া ছিল। এদেশে দুর্গ নির্মাণে মাটির তৈরী দেয়াল ছিল চিরাচরিত প্রথা। কালেভদ্রে দু চারটি পাকা দেয়াল যে না হত, তা নয়। সেগুলি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এদেশের বেশীর ভাগ দুর্গের চারদিকে নির্মিত হত সুউচ্চ মাটির প্রাচীর। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের শত শত মাটির দুর্গ আজও বাঙলার সর্বত্রই দেখা যায়। একমাত্র দিনাজ-পুর জেলাতেই সে যুগের ৫০টিরও অধিক মাটির দুর্গ আজও টিকে আছে। মাটির দুর্গ নির্মাণ ছিল অতি সহজ এবং সবচেয়ে কম খরচে তা করা যেত। সে তুলনায় পাকা দুর্গ বা বাঁশের বেড়া নির্মাণ ছিল অধিক ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বাঁশের বেড়া ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। সুষ্ঠু পরিখাবেষ্টিত মাটির দেয়াল তখনকার দিনে ছিল দুর্ভেদ্য। এ সমস্ত কারণে ডক্টর কানুনগো কর্তৃক উল্লিখিত বাঁশের বেড়ার কথাটিকে কেউ যদি হাস্যকর বলে তবে সেটিকে খুব দূষণীয় বলা যায় না।

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিহার অধিকারের সংবাদ পাওয়ার পর মহারাজা লক্ষ্মণসেন, তাঁর অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ এবং তাঁর প্রজা সাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে অবস্থায় মহারাজা যে-নগরীতে তাঁর পরিবার-পরিজন, ধনরত্ন, সৈন্যবাহিনী, হস্তীবাহিনী প্রভৃতি নিয়ে বাস করছিলেন, সে নগরীতে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করবেন না, তা কল্পনাতীত। আর কিছু না করলেও সেই নগরীর চারদিকে একটি পরিখা অন্তত খনন করার কথা। অথচ সারা নবদ্বীপ শহরে কোথাও কোন পরিখার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। [আমাদের বক্তব্য : নবদ্বীপে পুরোনো জলের খাত

বা নালা এখন দেখা যায়। তবে সেগুলি পরিখা না ভাগীরথীর পুরোনো খাত তা বলা যায় না।] তর্ক ও কোন বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার খাতিরে অনেক যুক্তিরই অবতারণা করা যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপার কি সত্যই সম্ভব ?

এইতো গেল একদিক। অন্যদিক থেকে বিচার করে দেখা গেল যে সমগ্র নবদ্বীপে এমন কোন প্রত্নকীর্তির চিহ্ন নেই যাতে করে ধারণা করা যেতে পারে যে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের মত প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতির শাসনকেন্দ্র বা কয়েক বছরের অবস্থান সেখানে ছিল। তদুপরি সেন বংশের দলিল-পত্রের মধ্যেও নবদ্বীপে তাঁর রাজধানী বা জয় স্কন্ধবার ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। [আমাদের বক্তব্য : এ যুক্তি জোরালো নয়, কারণ সেন আমলের দলিলপত্র খুব কমই পাওয়া গেছে। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়ায় ছিল (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৬ দ্র.)।] এখন দেখা যেতে পারে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে নবদ্বীপে আগমন আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা।

মোহাম্মদ বখতিয়ার যে বিহার শরীফ থেকে বঙ্গ বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। সেখান থেকে নবদ্বীপে সোজাসুজি আসতে গেলে ছোট নাগপুর অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্ধমান জেলার পূর্ব সীমানায় ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপে আসার কথা। 'হিষ্ট্রি অব বেঙ্গলে' (দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ ও ৬ পৃঃ) এই সমগ্র অঞ্চলকে ঝাড়খণ্ড এবং বসতিহীন ও জঙ্গলাকীর্ণ বলা হয়েছে। সেখানে চলাচলের কোন রাস্তা ছিল না এবং খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে সে স্থান দিয়ে কোন বড় রকমের অভিযান চালান সম্ভবপর ছিল না বলেও বলা হয়েছে। তবে স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় অল্পসংখ্যক দুঃসাহসী অশ্বারোহীর পক্ষে সে-স্থান দিয়ে আসা সম্ভবপর ছিল, একথাও সেখানে আছে। ঐ অভিমত গ্রহণযোগ্য।

সেখানে আরও বলা হয়েছে যে বিহার থেকে বাঙলায় আগমনের একমাত্র পথ ছিল রাজমহলের নিকটে অবস্থিত তেলিয়াগাড়ি গিরিপথের ভিতর ও তার উত্তরাঞ্চল দিয়ে। ডক্টর কানুনগো অনুমান করেন যে মহারাজা লক্ষ্মণসেন খুব সম্ভব সেখানে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে শত্রুর আগমন সম্ভবপর ছিল না বলে নবদ্বীপে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেননি।

মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর অষ্টাদশ সঙ্গীর অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর কানুনগো বলেছেন যে এ ধরনের অশ্ববিক্রেতার আগমন নবদ্বীপে প্রায়ই ঘটত বলে কেউ তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখেনি। সেখানে আছে :

'He (Md. Bakhtyar) rode through the city slowly and silently in an unostentations style without molesting any people, so that this small party was naturally taken for a band of foreign traders, who had brought horses for sale. That they did not excite the people's curiosity is a proof that caravans of Turkish horse-dealers had visited Nadia before and no doubt spied out the secret of the place.'[১]

এই মত যদি মানতে হয় তবে সেই সঙ্গে এও মেনে নিতে হয় যে নদীয়া (নবদ্বীপ) ছিল মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রায় স্থায়ী রাজধানী এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক এ স্থান অধিকার করার বহু বছর আগে থেকেই লক্ষ্মণ সেন সেখানে বসবাস রত ছিলেন এবং সে কারণেই তুর্কী অশ্ববিক্রেতাগণ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করত। অথচ একই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তিনি বলেছেন যে এটি সেনদের স্থায়ী রাজধানী ছিল না।[২] পরস্পরবিরোধী এই দুই উক্তির মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পশ্চিম দেশীয় অশ্ববিক্রেতার দল মুসলমান অধিকারদের অনেক আগে থেকেই বাঙলায় আসত বলে ধারণা করা যায়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, কর্ণসুবর্ণ, কোটিবর্ষ (দেবকোট), পঞ্চনগরী, পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান), সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট নগরীতে তাদের আগমনের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করা যায়। বিভিন্ন রাজা ও রাজপুরুষের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সেসব স্থান। এ সমস্ত স্থানে যাতায়াতের জন্য সুবিধাজনক রাস্তা ছিল বলে অনুমান করা যায়।

১। H. B. vol. II p. 7.

২। H. B. vol II p. 5. সেখানে আছে : "There is no evidence that Navadivp was ever the permanen capital of the Sena kings. It was merely a holy place on the bank of the Ganges, where pious people took their residence out of their regard for its sanctity.'

নবদ্বীপ কি কোন কালে এই গৌরবের অধিকারী ছিল ? নবদ্বীপ যে কোন কালে কোন রাজার রাজধানী বা কোন রাজপুরুষের শাসনকেন্দ্র ছিল, এমন প্রমাণ তো দূরের কথা, এ সম্পর্কে কোন জনপ্রবাদও নেই। [আমাদের বক্তব্য : জনপ্রবাদ যে যথেষ্ট ছিল, কুলজীগ্রন্থগুলিই তার প্রমাণ।] সেখানে যে সে সময়ে কোন নগরের অস্তিত্ব ছিলনা, সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। [আমাদের বক্তব্য : অস্তিত্ব যে ছিল তাতে সন্দেহের কারণ কম। লক্ষ্মণসেনের সম্ভাব্য রাজধানী ও চৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত স্থান হিসাবেই কেবল নবদ্বীপ বিখ্যাত ছিল না, প্রাচীন কাল থেকেই এই স্থান ছিল বিদ্যাচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। সুতরাং এখানে প্রাচীন কাল থেকেই নগর গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা যায়।] তদুপবি নবদ্বীপে যাতায়াতের কোন সুগম স্থলপথ ছিল কি ? এক দিকে বিশাল ভাগীরথী নদী ও অপরদিকে দুরতিক্রম্য ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলাকীর্ণ ও বসতিহীন স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত এ দ্বীপকার স্থানকে স্থলপথে অত্যন্ত দুর্গম বললে মোটেই অতিরঞ্জন হয়না। সেকালে সম্ভবত একমাত্র জল-পথেই ছিল সেখানে গমনাগমনের প্রধান ও সহজ উপায়।

এহেন দুর্গম ও অখ্যাত স্থানে পশ্চিমদেশীয় অশ্ববিক্রেতাদের আগমনকে এক অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা বলেই ধরা যেতে পারে। পশ্চিমদেশীয় অশ্ববিক্রেতাদের দলের পক্ষে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। কারণ, সেখানে কোন পথ ঘাট ছিল না। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে প্রয়োজনের তাগিদে মোহাম্মদ বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের ভিতর দিয়েই এসেছিলেন কিন্তু পশ্চিমদেশীয় অশ্ববিক্রেতারা সেই দুরতিক্রম্য ও বিপদসঙ্কুল এলাকা দিয়ে আসবে কোন দুখে ? তাদের তো সুগম পথ দিয়ে তেজারতি করতে আসার কথা। অথচ কোন সুগম পথ সেখানে ছিল না। যদি সে রকম কোন পথের অস্তিত্বই থাকত, তবে মহারাজা লক্ষ্মণসেন সে পথটিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেননি, তা কি করে ভাবা যায়। [আমাদের বক্তব্য : এ পথ দিয়ে যে বিদেশী আক্রমণ-কারীরা আসবে তা হয়ত লক্ষ্মণসেন ভাবতে পারেন নি।] তদুপরি নবদ্বীপে অশ্ব-বিক্রেতাদের আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল কি ? [আমাদের বক্তব্য : নবদ্বীপ যদি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী হয়, তা হলে নিশ্চয়ই অশ্ববিক্রেতাদের সেখানে আসার প্রয়োজন থাকবে।] এ সব কারণে নবদ্বীপে অশ্ববিক্রেতাদের আগমনের কাহিনীটিকে অলীক কল্পনা বলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ অশ্ববিক্রেতারা

যেখানে যাতায়াত করত সে স্থান নবদ্বীপ ছিল না।

এখন মোহাম্মদ বখতিয়ারের নোদীয়হ্ বা নওদীহ্ অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ডক্টর আহমদ হাসান দানী যথেষ্ট যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেছেন যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযান ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে (অর্থাৎ মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক কুতুব-উদ্দীন আইবকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক বছর পরে) হতে পারেনা। এর পরে মুইজ-উদ্দীন মোহাম্মদ সাম ওরফে মোহাম্মদ ঘোরীর একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ৬০১ হিজরী সনের ১৯শে রমজান তারিখে ১০ই মে ১২০৫ খ্রীঃ প্রচলিত এ মুদ্রায় গৌড় বিজয়ের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে। এ মুদ্রা প্রকাশে এখন সঠিকভাবে জানা গেছে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে গৌড় অধিকার করে-ছিলেন।

মাত্র ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার উদন্ত পুর বিহার অধিকার করেছিলেন। গোবিন্দপাল বা পলপাল নামক কোন পালবংশীয় নৃপতি তখন বিহার অঞ্চলে নামে মাত্র রাজা ছিলেন। সে স্থান প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় এই অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে তা অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল। বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল অধিকারের সময় তাঁর সৈন্য সংখ্যা কত ছিল তা মীনহাজ উল্লেখ করেননি। কিন্তু সে অঞ্চল অধিকারের পর পরই তিনি বঙ্গাভিযানে অগ্রসর হননি। মীনহাজের বর্ণনা (২৬ পৃঃ) ও উপরে উল্লিখিত গৌড় বিজয়ের উপলক্ষে প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিহার অধিকারের প্রায় দু'বছর পরে তিনি বঙ্গাভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁর সৈন্য সংখ্যা কত ছিল মীনহাজ উল্লেখ করেননি। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের মত এক বিরাট নৃপতির বিরুদ্ধে যে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হননি তা সহজেই অনুমেয়। লখনৌতি অধিকারের আনুমানিক সাত-আট মাস পরে তিনি তিব্বত অভিযানে গিয়ে-ছিলেন। সে সময়ে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ১০,০০০ ছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন্ (৩০ পৃঃ)। এসব সৈন্যের বেশীর ভাগ যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযানের সময় তাঁর সঙ্গে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। প্রায় দু'বছরের প্রস্তুতির পরে ও মালিক কুতব-উদ্-দীনের সমর্থন পুষ্ট এ অভিযানে যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্য সংখ্যা কয়েক হাজার ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

কারণ, মাত্র কয়েকশ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে তিনি বঙ্গাভিযানের জন্য প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করতেন না এবং মহারাজা লক্ষণ সেনের মত এক বিরাট রাজ্যের অধিপতির বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক শ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সমীচীন ছিল বলেও মনে হয় না। অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ্ বা নোদীয়হ্ বিজয় করেছিলেন বলে যে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে তার পিছনে যে কোন সত্য নেই তা বলাই বাহুল্য। সঠিকভাবে বলা না গেলেও তাঁর সৈন্য সংখ্যা যে কয়েক সহস্র ছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

এত বড় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলাকীর্ণ, বসতহীন ও দুর্গম অঞ্চল দিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে নবদ্বীপে আসা সম্ভবপর ছিল না বলে ডক্টর কানুনগো ঠিকই বলেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি কোন পথে নবদ্বীপ এসেছিলেন ? অথবা তিনি কি সত্যিই নবদ্বীপে এসেছিলেন ?

এ প্রশ্নের সমাধানের আগে মোহাম্মদ বখতিয়ারের বঙ্গাভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে এটি ছিল একটি লুণ্ঠনের অভিযান মাত্র এবং মহারাজা লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গেলে দৈবক্রমে মোহাম্মদ বখতিয়ার উত্তর বঙ্গের অধিকারী হয়ে বসেন। একথা সত্য যে তিনি প্রথম দিকে লুণ্ঠন ব্যবসায়েই লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু বিহারে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু আগে থেকেই যে তিনি রাজ্য স্থাপনে অধিক সচেষ্ট ছিলেন তা মীনহাজের বর্ণনা থেকে বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়। যদি বঙ্গাভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য লুণ্ঠনই হত তবে তাঁর পক্ষে দু'বছর অপেক্ষা করে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিহার অধিকারের পর পরই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে লুণ্ঠন অভিযানে অগ্রসর হতেন। না করে তিনি প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করেছিলেন একারণে যে সে সময়ে তিনি উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে অভিযানের পথ-ঘাট, বঙ্গ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, রাজার অবস্থান স্থল, প্রধান প্রধান শহর-বন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতির পর তিনি সুপরিকল্পিতভাবে অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রস্তুতি ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের পরবর্তী কালের কার্যক্রম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে তিনি একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্গাভিযানে এসেছিলেন, শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়।

[আমাদের বক্তব্য : এ মত আমরা সমর্থন করি।]

তাই যদি হয় এবং নোদীয়হ্ বা নওদীহ্-কে যদি আমরা নবদ্বীপ বলে মেনে নেই (যেমন অনেক পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন) তবে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপে এসেছিলেন ? যদি শুধু লণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি এসে থাকতেন তবে সে স্থানে অভিযানের ফলে বেশুমার ধনরত্ন, হস্তী, রমণী প্রভৃতি হস্তগত করে (২৭-২৮ পৃঃ) দলবল সহ তাঁর বিহারে প্রত্যাবর্তন করার কথা। কিন্তু তা না করে নবদ্বীপ থেকে প্রায় ১০৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত লখনৌতি শহরে গিয়ে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁকে যে সেখানে স্থলপথে যেতে হত তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা এবং সেখানে যেতে হলে তাঁকে অসংখ্য নদী-নালা ও খালবিল অতিক্রম করে অপরিচিত রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাবার কথা। তদুপবি অজয় ও সুবিশাল গঙ্গা (পদ্মা) নদী অতিক্রম করার প্রশ্ন তো ছিলই। এতসব বাধা অতিক্রম করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের দৃষ্টান্ত অতি সহজেই প্রমাণ করে যে তিনি রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই বঙ্গাভিযানে এসেছিলেন, শুধু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নয়।

যদি রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ বখতিয়ার বঙ্গাভিযানে এসে থাকেন তবে এত সহজে নওদীহ্ অধিকার করার পরও তিনি সে স্থান স্বীয় অধিকারে রাখেননি কেন ? মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে নওদীহ্ অধিকার করে মোহাম্মদ বখতিয়ার সে স্থান 'ধ্বংস করেন' এবং 'লখনৌতি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন' (২৯ পৃঃ)। তিনি নবদ্বীপ শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তাঁর অধিকারে রেখেছিলেন এমন কোন উক্তি মীনহাজের বর্ণনায় নেই। এ অঞ্চল যে তাঁর অধিকারে ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মীনহাজের পরবর্তী বর্ণনা থেকে। যেখানে শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে :

'মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন কামরূপ ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালনা[করেন (তখন) মোহাম্মদ শিরানকে তাঁর ভ্রাতাসহ সৈন্যবাহিনীর একাংশ দিয়ে তিনি লাখনোর ও জাজনগরের দিকে প্রেরণ করেন' (৪৪ পৃঃ)।

জাজনগর (বর্তমান জাজপুর) উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। লাখ-নৌরকে বীরভূম জেলার (পশ্চিম বঙ্গ, ভারত) বর্তমান নাগর নামক স্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাজনগর পর্যন্ত মোহাম্মদ বখতিয়ারের অধিকার প্রসারিত হয়েছিল কিনা তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। লাখনৌরের বেলায়ও একই প্রশ্ন

জড়িত। তথাকথিত নবদ্বীপ বিজয়ের মাত্র সাত-আট মাস পরেই মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি শিরানকে সৈন্য-বাহিনীর একাংশ দিয়ে সেখানে প্রেরণ করার দৃষ্টান্ত থেকে অতি সহজেই ধরা যায় যে সেখানে তার অধিকার বা প্রতিনিধি ছিল না।

লাখনৌর-জাজনগর অঞ্চল নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। সাধারণভাবে রাঢ় নামে পরিচিত এ অঞ্চল সেন রাজাদের রাজ্যভুক্ত ছিল বলে ধরা যায় এবং মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের বঙ্গে পালিয়ে যাবার পরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী এ ভূভাগ খুব সম্ভব তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছিল। তখন উড়িষ্যার শক্তিশালী গঙ্গা নৃপতিদের দৃষ্টি এ অঞ্চলের উপর পতিত হয়েছিল বলে ধারণা হয় এবং সেই সঙ্গে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দৃষ্টিও। সে কারণেই তিনি মোহাম্মদ শিরানকে পাঠিয়েছিলেন সে অঞ্চল অধিকার করতে। যদি এ অঞ্চলে তাঁর পূর্ব অধিকারই থাকত তবে প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ মোহাম্মদ শিরানকে তথা-কথিত নবদ্বীপ অধিকারের মাত্র সাত মাস পরে লাখনৌরে প্রেরণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। [আমাদের বক্তব্য : এই বই, পৃঃ ২২-২৩ দ্রঃ।]

এতে অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে তথাকথিত নবদ্বীপ অধিকার ও ধ্বংস করার পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার সে স্থান পরিত্যাগ করে, সেখানে প্রশাসন বা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে, এমনকি সেখানে কোন প্রতিনিধিও না রেখে লখনৌতি গিয়ে আস্তানা গাড়েন। রাজ্য বিস্তারে এসেও এত সহজে বিজিত ও অধিকৃত এ স্থানকে তিনি অবহেলায় পরিত্যাগ করে গেলেন কেন? এ অঞ্চল কি তবে সত্যই অবহেলার বস্তু ছিল?

রাঢ় নামে পরিচিত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে তুর্কী অভিযানকারীদের কাছে প্রথম থেকেই মোটেই অবহেলার বস্তু ছিল না এবং তাঁরা যে এ স্থান অধিকার করার জন্য একদম গোড়া থেকেই উদগ্রীব ছিলেন মীনহাজের বর্ণনায় তা অতি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক লখনৌতি অধিকারের মাত্র সাত-আট মাস পরে লাখনৌর-জাজনগর অঞ্চলে শিরান খলজীকে পাঠাবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেনদের অনুপস্থিতিতে তিনি খুব সম্ভব লাখনৌরে তুর্কী অধিকার সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর পরে খলজি আমিরদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে সে অধিকার খুব সম্ভব অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন

ইওয়াজ খলজী ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন বলে মীনহাজ উল্লেখ করেছেন (৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠার পাঠ ও ৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।[১] এর পরে লখনৌতির তুর্কী শাসনকর্তাগণ ও উড়িষ্যার রাজাদের মধ্যে এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। সুলতান মুঘীস-উদ-দীন তুঘরীল ইউজবক ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ় অঞ্চল অধিকার করে উড়িষ্যার সীমানা পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এতেও বিরোধের সমাপ্তি ঘটেনি। পরে বহুকাল ধরে রাঢ় অঞ্চলের অধিকার নিয়ে গৌড়ের মুসলমান শক্তি ও উড়িষ্যারাজ্যের মধ্যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাঢ় অঞ্চল মো'হাম্মদ বখতিয়ারের কাছে মোটেই অবহেলার বস্তু ছিল না। [আমাদের বক্তব্য : সঙ্গত কথা।] তা-ই যদি হয় এবং নবদ্বীপ যদি নওদীহ্ হয় তবে মোহাম্মদ বখতিয়ার একরকম বিনা বাধায় এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে অবহেলাভরে নবদ্বীপ ত্যাগ করে প্রায় ১৫০ মাইল দুর্গম পথ এবং অজয় ও গঙ্গার মত দু'টি বিশাল নদী অতিক্রম করে সুদূর লখনৌতিতে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করবেন কেন এবং নবদ্বীপ ত্যাগ করার আগে সেখানে কোন প্রতিনিধি রেখে যাবেন না কেন ? আবার মাত্র সাত-আট মাস পরে একই অঞ্চল অধিকার করার জন্য তিনি সৈন্যসহ শিরান খলজীকে পাঠাবেন কেন ? যদি নওদীহ্ সত্যই নবদ্বীপ হয়ে থাকত তবে এরকমটি ঘটা মোটেই সম্ভব ছিল না। [আমাদের বক্তব্য : এ সম্বন্ধে আমাদের মতের জন্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২১-২৩ দ্রষ্টব্য।]

নবদ্বীপ যদি সত্যই মীনহাজের নওদীহ্ হত তবে মহারাজা লক্ষ্মণসেন কর্তৃক সে স্থান পরিত্যাগ করার পর রাঢ অঞ্চলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। তিনি নবদ্বীপ, নাগর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের মধ্যে যে কোন একটিতে রাজধানী স্থাপন করতে পারতেন। ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম তখন হিন্দু রাজাদের অধিকারে ছিল। এই দুই স্থান মুসলমানরা জয় করেন আলোচ্য সময়ের প্রায় একশো বছর পরে। মহারাজা

১। এ সম্পর্কে ডক্টর আহমদ হাসান দানী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। এটি হচ্ছে : **The First Muslim Conquest of Lakhnor—I. H. Q. vol. XXX. No. 1, March 1959, p. 11.**

লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত সমগ্র রাঢ় অঞ্চল আপনা আপনি মোহাম্মদ বখতিয়ারের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ত। [আমাদের মত: নবদ্বীপকে কেন্দ্র করেই তিনি রাঢ় অঞ্চল দখলের চেষ্টা করেছিলেন; বর্তমান গ্রন্থ পৃঃ ২১-২৩ দ্রঃ।] সে রাজ্য লাখনৌতি রাজ্য থেকে আয়তনে অনেক বড়ও হত। এ রাজ্যে তাঁর শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি সুবিধামত লখনৌতি ও কামরূপ রাজ্যে স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য অগ্রসর হতেন। যদি নবদ্বীপ সত্য সত্যই নওদীহ্ হত, তবে এটিই হত মোহম্মদ বখতিয়ারের স্বাভাবিক কর্মপন্থা।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার উড়িষ্যা রাজের ভয়ে ভীত ছিলেন বলে খুব তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন এবং লখনৌতির নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই যদি হয় তবে এ ঘটনার মাত্র সাত-আট মাস পরে তিনি শিরান খলজীকে রাঢ অঞ্চল অধিকার করতে পাঠিয়েছিলেন কেন? তখন কি উড়িষ্যা রাজের ভীতি ছিল না?

কোন কোন পণ্ডিত এ রকমও বলেছেন যে মোহাম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপে এসেছিলেন শুধু লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে এবং তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি তা করেছিলেন। মহানন্দা, গঙ্গা ও করতোয়া নদীত্রয় পরিবেষ্টিত মীনহাজের ভাষায় লখনৌতি নামে পরিচিত রাজ্যে তিনি যে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায়। গঙ্গার দক্ষিণে তাঁর কোন অধিকার যে ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। [আমাদের বক্তব্য: গঙ্গার দক্ষিণে যে তাঁর অধিকার ছিল, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।] সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথমে নবদ্বীপে আসার কি প্রয়োজন ছিল?

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর কানুনগো এবং আরও অনেক পণ্ডিতের মতে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে অবস্থানরত ছিলেন। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল গৌড়-লক্ষণাবতী অধিকার করে সেখানে তাঁর শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে সুযোগমত নবদ্বীপে গিয়ে রাজাকে বিতাড়িত করা। [আমাদের বক্তব্য: এ কাজ সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন। বিহার থেকে অভিযান করে গৌড়-লক্ষণাবতী অধিকার করতে হলে তেলিয়াগড়ি গিরিপথ ও গঙ্গা নদী, না হয় কোশী প্রভৃতি খরস্রোতা নদী ও গঙ্গা নদী অতিক্রম করতে হত। জলযুদ্ধে অনভিজ্ঞ এবং নৌবহরহীন বখতিয়ারের বাহিনীর পক্ষে তা করা

প্রায় অসম্ভব। আগে নবদ্বীপ দখল করে পশ্চিম বঙ্গ থেকে লক্ষ্মণ সেনের আধিপত্য নির্মূল করে নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার হয়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করার চেষ্টাই তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত কাজ এবং তা'ই তিনি করেছিলেন বলে আমরা মনে করি।] মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং সেই রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তিনি অধিকার করেন (২৯ পৃ)। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি কোন যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা, সে বর্ণনা মীনহাজের গ্রন্থে নেই। তেমন উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে থাকলে মীনহাজের বর্ণনায় তা স্থান পাবার কথা। যদি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে থাকতেন তবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে এ স্থান অধিকার করার মাত্র সাত-আট মাস পরে তিব্বত অভিযানে যাওয়া সম্ভবপর হত না। এতে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে একরকম বিনা বাধায় তিনি লখনৌতি নগর ও রাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং সেখানে লক্ষ্মণ সেনের বিশেষ কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না।

সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপে প্রথমে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে তা বোধগম্যতার বাইরে। এর সমর্থনে বলা হয়ে থাকে যে নবদ্বীপে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের অবস্থানের কথা অবগত হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার সেখানে গিয়েছিলেন রাজাকে নিহত, বন্দী অথবা বিতাড়িত করে জনগণের মনে ত্রাস সঞ্চারের জন্য এবং তাতে করে নির্বিঘ্নে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব করার জন্য। এ যুক্তি মেনে নিয়েও বলা যায় যে এমন একটি ভীতি সঞ্চার করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য থাকত তবে লখনৌতিতে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করেও তিনি একাজে অগ্রসর হতে পারতেন। লখনৌতির মত বিরাট নগর ও রাজ্য অরক্ষিত অবস্থায় আছে জেনেও মোহাম্মদ বখতিয়ার সে স্থান অধিকারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে দুর্গম ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে শুধু জনমনে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নবদ্বীপে যুদ্ধ করতে যাবেন, তা বিশ্বাস যোগ্য ঘটনাই বটে। এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত এমন কি নিহতও হতে পারতেন । সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে তিনি বঙ্গাভিযানে এসেছিলেন শুধু যুদ্ধ করার খাহেশে এবং নিরাপত্তা জ্ঞানের সাধারণ বুদ্ধি বিবর্জিত ছিলেন তিনি।

নবদ্বীপ যে নওদীহ ছিল না এবং হতে পারে না, তা নবদ্বীপের ভৌগোলিক

অবস্থানের কথা বিশ্লেষণ করলেও ধরা পড়ে। এ দুটি যদি একই স্থান হয় তবে কোন পথে বৃদ্ধ রাজা বঙ্গ ও সকোনাতে পলায়ন করেছিলেন ?

নবদ্বীপের পূর্বদিক ঘেঁষেই ছিল সুবৃহৎ ভাগীরথী নদী এবং সেই নদী এই দ্বীপাকার স্থানকে দক্ষিণ ও উত্তরদিকেও বেষ্টন করে ছিল। পালাতে গেলে বৃদ্ধ রাজাকে নদী অতিক্রম করে অথবা নদীর উজান বেয়ে নৌকাযোগে যেতে হয়েছিল। শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মীনহাজ বলেন যে 'মোহাম্মদ বখতিয়ার যে-সময়ে নওদীযাহ্ নগব লুণ্ঠন করেন ও রায় লখমনিয়াহ্‌কে পলায়ন করতে হয় এবং তাঁব সৈন্য ও হস্তীর দল বিক্ষিপ্ত হযে পড়ে এবং মুসলমান সৈন্যগণ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে (তখন) এই মোহাম্মদ শিরান তিনদিন ধরে সৈন্যদল থেকে নিখোঁজ হযে পড়েন (এবং) তাতে সমুদয় আমির তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে মোহাম্মদ শিরান মাহুতসহ আঠারটি কি তারও বেশী হস্তী কোন এক জঙ্গল অধিকার করে সেগুলিকে (সেখানে) রক্ষা করছেন এবং তিনি একাকী আছেন' (৪৫, ৪৬ পৃ:)।

এ কাহিনীতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন থাকতে পারে বিশেষ করে শিরান কর্তৃক 'একাকী' মাহুতসহ আঠারটি হস্তী 'তিনদিন' আটক করে রাখার কাহিনীতে। তবে ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে অসত্য বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব শিরান একাকী ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে তাঁর সীমিত সংখ্যক অনুচর বর্গও ছিল। 'তিনদিন' কথাটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বব্যঞ্জক। এই কথা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তুর্কী সৈন্যরা রাজার পলায়নপর সৈন্যদের পিছনে পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হযেছিল এবং শিরান যেখানে হস্তীগুলি আটক করে রেখেছিলেন সে স্থান নবদ্বীপ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। কারণ, এ স্থান যদি নবদ্বীপের কাছা-কাছি স্থানে হত তবে শিরানের পক্ষে তিনদিন ধরে নিখোঁজ হয়ে থাকা সম্ভবপর ছিল না। কোন না কোন প্রকারে একদিনের মধ্যেই তাঁর অবস্থানের কথা দলের কাছে পৌঁছে যাবার কথা।

রাজার সৈন্যদের পক্ষে পূর্বদিকে এত দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, নবদ্বীপের লাগ পূর্বদিকেই ছিল ভাগীরথী নদী। উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছিল একই সমস্যা। [আমাদের বক্তব্য : দক্ষিণ দিকে যাওয়ার কী সমস্যা ছিল ? সেখানে কোন বড় নদী বা বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনী—কিছুই তো ছিল না।] পশ্চিম-দিকে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ, শত্রুসৈন্য সেদিক থেকেই আক্রমণ

করেছিল এবং সেদিকেই তারা অবস্থানরত ছিল। এস্থান নবদ্বীপ হলে রাজা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর পূর্বদিকে গিয়ে নদী অতিক্রম করা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোন উপায় ছিল না। সেক্ষেত্রে রাজার সৈন্যদের পক্ষে শিরান খলজীর বর্ণনায় যে দূরত্বের কথা আছে, সেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করার প্রশ্নই উঠে না এবং নবদ্বীপ থেকে রাজার সৈন্যদের মধ্যে কেউ স্থলপথে পালিয়ে যেতেও পারত না। নৌকা-যোগে কেউ কেউ হয়ত পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু তাদের সংখ্যা হত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন কেমন করে নবদ্বীপ থেকে পালাতে পারতেন সে প্রশ্নটিও এখানে অতি সঙ্গত কারণেই তোলা যেতে পারে। ভাগীরথী পার হয়ে বৃদ্ধরাজা পদব্রজে বঙ্গ ও 'সকোনাত' রাজ্যে গিয়েছিলেন তা সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। প্রায় ৮০ বছর বয়স্ক নৃপতিকে খুব সম্ভব নৌকাযোগেই পালাতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁকে ভাগীরথীর উজান বয়ে রাজশাহীর নিকট পদ্মাতে পড়ে বঙ্গে যেতে হয়েছিল। [আমাদের বক্তব্য : তা কেন ? নবদ্বীপের ঠিক অপর পারেই জলঙ্গী নদী ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। কাজেই লক্ষ্মণসেন নৌকায় চড়ে জলঙ্গী বেয়ে প্রথমে 'সঙ্কনৎ' ও পরে (পূর্ব) বঙ্গে যেতে পারেন খুব সহজে। 'সঙ্কনৎ'কে 'সমতট' (মধ্য বঙ্গ, আধুনিক কালের প্রেসিডেন্সী বিভাগ)-এর অপভ্রংশ বলে আমরা মনে করি।] এটি সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয় না। কারণ, তাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল পদে পদে।

এ সমস্ত কারণে মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্‌কে নবদ্বীপ বলে মেনে নেওয়া কঠিন। [আমাদের বক্তব্য : কারণগুলি ইতিপূর্বেই আমরা খণ্ডন করেছি]

(গ) নওদীহ্ ও নওদা

নবদ্বীপ যদি মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ না হয় এ স্থান তবে কোথায় ? হাবিবী কর্তৃক অনুসৃত আদর্শ পুথিতে এ স্থানের নাম সর্বত্রই 'নওদনাহ' লিখিত আছে বলে তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। তিনি এ স্থানের নাম পরিবর্তন করে 'নওদীহ' লিখেছেন এবং তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি মেজর রেভার্টিকে অনুসরণ করে এই পরিবর্তন করেছেন। কারণ রেভার্টি সর্বত্রই 'নোদিয়হ্' বা নুদীয়হ্[১] (Nudiah) নাম ব্যবহার করেছেন এবং হাবিবী

১। রেভার্টি এ স্থানের ফারসী নাম দেননি কিন্তু পাদটীকায় (৫৫৭ পৃঃ ৪ পাদটীকা) বলেছেন।

পাদটীকায় বলেছেন যে রেভার্টি 'নওদীহ' নাম ব্যবহার করেছেন।[১] এই ফারসী শব্দ সাধারণতঃ 'নওদীহ্' (=নও+দীহ্) হিসাবে উচ্চারিত হয়, রেভার্টির বানান মতে 'নুদীয়হ্' (nudiah) হিসাবে নয়। এই শব্দের (নও) অর্থ নব বা নূতন। ফারসী শব্দ-এর অর্থ গ্রাম বা শহর। এর স্বাভাবিক উচ্চারণ দীহ্, দিয়াহ্ নয়। একই অর্থে এ শব্দ দীহা রূপে উচ্চারিত হতে পারে ··· অবশ্য অন্য কয়েকটি অক্ষরের অন্তে থাকলে এটির উচ্চারণ আলিফ (।)-এর মত হয়। সুতরাং শব্দের উচ্চারণ হবে নওদীহ্, রেভার্টি কতক উচ্চারিত নুদীয়হ (nudiah) নয়। কিন্তু যেহেতু এদেশে আমরা প্রায় সকলেই রেভার্টির অনুবাদের মাধ্যমে এ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেহেতু এ স্থান নুদীয়হ, নোদীয়হ বা নোদিয়া নামে সর্বত্র পরিচিত হয়েছে।

এই ফারসী শব্দের অর্থ যে নতুন শহর বা গ্রাম সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে এদেশের কোন স্থানের ফারসী অর্থসহ এই ফারসী নাম যে ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেন নৃপতিদের কোন রাজধানীর এই ফারসী নাম ছিল, তা কল্পনারও বাইরে। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটির কোন একটি কারণে মীনহাজ এ নাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন: প্রথমত, এমন হতে পারে যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন কোন একটি নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ধার্যগ্রাম (?) বা ফল্গু গ্রামের মত সে স্থানের নাম এত কঠিন ছিল যে মীনহাজ ফারসী ভাষায় তা আয়ত্তে আনতে অক্ষম হয়ে এটিকে নওদীহ্ অর্থাৎ নূতন শহর বলে অভিহিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এমনও হতে পারে যে সে স্থানের 'নওদীহ'-র মতই একটি নাম ছিল এবং সামান্য পরিবর্তন করে মীনহাজ এটিকে নওদীহ্ বলেছেন।

সাধারণতঃ কোন মানুষ বা স্থানের নামের ক্ষেত্রে মীনহাজ খুব বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেননি। কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙলা ভাষার মত ফারসী ভাষায় যুক্তাক্ষরের প্রচলন ও উচ্চারণ নেই বলে বাধ্য হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লখমনিয়হ লক্ষ্মণ (সেন), লখনৌতি (লক্ষ্মণাবতী), দেওকোট (দেবকোট), কামরূদ (কামরূপ), বঙ (বঙ্গ), তিবত (তিব্বত) গঙ্ (গঙ্গা), বরধন কোট (বর্ধন কোট) ইত্যাদি ইত্যাদি

১। হাবিবী, ৪২৪ পৃঃ পাদটীকা।

দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু ব্যতিক্রমও অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। উপরে যেসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল তাতে ফারসী পাঠ পড়েও পাঠক এ স্থানগুলির আদি নামগুলি কি তা অনুধাবন করতে পারেন।

আলোচ্য নওদীহ্, নোদীয়হ্ বা নোদিয়ার বেলায় মীনহাজ যদি তাঁর সাধারণ নীতি অনুসরণ করে থাকেন এবং এ স্থানের আদি নাম যদি নবদ্বীপ হত তবে ফারসী ভাষায় এর রূপান্তরিত নাম হত সম্ভবতঃ নওদীপ বা নওদীব। এ স্থানকে 'নওদনাহ', নুদীয়হ ও নওদীহ, নওদীযা বা নোদিয়া বলার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ তাঁর ছিল না। ফারসী ভাষায় রূপান্তরে কিছু পরিবর্তনের কথা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু দ্বীপ শব্দ 'দীহ্' অথবা 'দিয়া'-তে রূপান্তরের কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। সংস্কৃত 'নব' শব্দ অতি সহজেই 'নও' বা 'নব' ফারসী শব্দে রূপান্তরিত বলে ধরা যায়। কিন্তু ফারসী দীহ্ বা দিয়া শব্দের অর্থ ও উচ্চারণগত সাদৃশ্যবিশিষ্ট কোন বাঙলা প্রতিশব্দ এ অঞ্চলে পাওয়া দুষ্কর।

অবশ্য ঢাকা জেলার নরসিংদি মহকুমায় দি অন্তক স্থানের নাম যথা, মাধবদি, গোপালদি, জিনারদি, কুমডাদি ইত্যাদি নামের অস্তিত্ব দেখা যায়। আর কুষ্টিয়া জেলায় পোড়াদহ, ঝিনাইদহ প্রভৃতি দহ অন্তক নামের সন্ধান পাওয়া যায়। দহঅন্তক অন্ততঃ একটি দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের 'মালদহ' নামে। দি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু দহ শব্দ যে হ্রদ শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাতে বিশেষ কোন দ্বিমত নেই।

এমন হতে পারে কি যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন নবদি অথবা নবদিয়াহ নামে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মীনহাজ ফারসী ভাষায় সেটিকে 'নওদীহ্' বা 'নুদীয়হ্' বা নোদীয়হ্'-তে রূপান্তরিত করেছিলেন? এটি অনুমান মাত্র এবং সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

মীনহাজের 'নওদীহ্' 'নুদীয়হ' বা 'নোদীয়হ' শব্দের সঙ্গে 'নবদ্বীপ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত কষ্টকল্পিত তো বটেই, প্রায় অসম্ভবও বলা যায় যদিও 'নদীয়া' শব্দের সঙ্গে এ সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক বলেই ধরা যায়। [আমাদের বক্তব্য : এই স্বীকারোক্তির জন্য যাকারিয়া সাহেবকে ধন্যবাদ। তবে প্রশ্ন এই—'কামরূপ' যদি মীনহাজের হাতে পড়ে 'কামরুদ' হতে পারে, তবে 'নবদ্বীপ' 'নওদীহ্' হতে পারবে না কেন?] কিন্তু নদীয়া নামের অস্তিত্ব সে সময়ে ছিল

বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যদিও নবদ্বীপের অস্তিত্ব বেশ ভালভাবেই ছিল বলে ধরা যায়। [আমাদের বক্তব্য : 'নদীয়া' ও 'নবদ্বীপ' দুটি শব্দের মধ্যে কোনটি পুরোনো রূপ, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' এই শহরটির 'নবদ্বীপ' ও 'নদীয়া' দুই নামই পাওয়া যায়।] এতে ধারণা করা যায় যে মীনহাজ বর্ণিত 'নওদীহ্' বা 'নুদীয়হ' নবদ্বীপ হতে পারে না।

. মীনহাজ বর্ণিত এ নওদীহ্ বা নুদীয়হ তা হলে কোথায়? আমরা আগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে মোহাম্মদ বখতিয়ার আদৌ নবদ্বীপ বা রাঢ় অঞ্চলে যাননি। মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে নওদীহ্ বা নুদীয়হ্ শহর ছিল লখনৌতি নগরের কাছেই এবং সেখান থেকে লখনৌতি নগরে যাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। সে কারণেই তিনি নওদীহ্ নগর অধিকার ও ধ্বংস করে লখনৌতিতে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

লখনৌতি নগরী ও রাজ্য অধিকার করতে তাঁকে যে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোন যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে তা নওদীহ্তেই হয়েছিল এবং সেখানেই তার সমাপ্তি ঘটেছিল। মোহাম্মদ বখতি-যার লখনৌতি নগর বিনা বাধায় অধিকার করেছিলেন। নওদীহ্ বিজয় ও লখনৌতিতে বসতি স্থাপনের ঘটনাবলী সম্পর্কে মীনহাজ যে বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করা হয় তবে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে নওদীহ্ শহর মীনহাজ বর্ণিত লখনৌতি রাজ্যের মধ্যেই অর্থাৎ মহানন্দা, গঙ্গা ও করতোয়া নদীত্রয়ের বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত বরেন্দ্র ভূমিতেই ছিল। খুব সম্ভব এ স্থান ছিল মালদহ, রাজশাহী বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় কোথাও।

এস্থান যে দেবকোট বা লখনৌতিতে ছিল না এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়ো-জন। কারণ, এ দুটি স্থানে মোহাম্মদ বখতিয়ারের প্রথম ও দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। মালদহ জেলার পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া), রাজশাহী জেলার ঘাটনগর, জগদল, আগ্রাদ্বিগুণ, আমৈর, বিজয়নগর, গোদাগাড়ি, নওদা অথবা রাজশাহী বা পার্শ্ববর্তী জেলা সমুহের এ ধরনের কোন প্রাচীন স্থানে এটির অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। এসব স্থানে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কিন্তু এগুলির মধ্যে একমাত্র নওদা ছাড়া অন্যকোন স্থানের নামের সঙ্গে নওদীহ নামের কোন সাদৃশ্যই নেই। নওদা ছাড়া অন্য

কোন স্থানে যদি নওদিহ্‌র অস্তিত্ব থাকত তবে মেনে নিতে হবে যে তুর্কী অধিকারের পরে সে স্থানের নাম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল।

কিন্তু তা খুব সম্ভব ঘটেনি। কারণ ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (৬৫৩হিঃ) সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন তুঘরীল ইউজবক কর্তৃক প্রচলিত যে মুদ্রাটি পাওয়া গেছে সেটি 'উরমবদন ও নদিয়া'-র খেরাজ থেকে প্রদত্ত হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে রাজশাহী জেলার নওদা এবং মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্‌ বা নুদীয়হ্‌ অভিন্ন।[১] [আমাদের বক্তব্য : তা কী করে হওয়া সম্ভব—তা আমরা বুঝতে পারছি না। বিহার থেকে নওদায় অভিযান করতে হলে বখতিয়ারকে হয় তেলিয়াগড়ি গিরিপথ ও গঙ্গা নদী, না হয় কোশী প্রভৃতি একাধিক খরস্রোতা নদী ও গঙ্গা নদী অতিক্রম করতে হত। বখতিয়ারের নৌবহর ছিল না, তাঁর বাহিনী নৌযুদ্ধ জানত না; কেবল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বখতিয়ার "নওদীহ" জয় করেছিলেন, তা কখনই পারতেন না, যদি এ স্থান নওদার সঙ্গে অভিন্ন হত।] এ স্থান গৌড়-লক্ষ্মণাবতী থেকে আনুমানিক ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে পুনর্ভবা নদীর বামতীরে অবস্থিত। পুনর্ভবা নদী এ স্থানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রহনপুর রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় দু মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে নওদা গ্রাম অবস্থিত এবং এ স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এককালে পুনর্ভবা নদী নওদার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত, এখন প্রায় এক মাইল পশ্চিমদিকে সরে গেছে এবং এর প্রাচীন খাত এখন (১৯৭৮ খ্রীঃ) নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছে।

এককালে নওদা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে একটি বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। নওদা, মীরাপুর, পীরপুর, রহনপুর, ভাগলপুর, পুনার, প্রসাদপুর, কসবা প্রভৃতি গ্রাম যেখানে অবস্থিত সেখানে ছিল এই প্রাচীন জনপদ এবং এটি ছিল প্রায় ১৫।১৬ বর্গমাইল আয়তনের। এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে একটি বিরাট নগরী ছিল। এ স্থানের সব

১। 'রাজশাহী ইতিহাস' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা জনাব কে. এম. মিছের এই মতবাদ সম্পর্কে রাজশাহীর ইতিহাসে (২য় খণ্ড) তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন কীর্তিই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এখন এ স্থানের অতীত গৌরবের নীরব সাক্ষী হিসাবে এখানে দেখা যায়। আর দেখা যায় মজে যাওয়া অসংখ্য প্রাচীন দীঘি-পুষ্করিণী। রহনপুর শহর ও বাজার এলাকা যে একটি প্রাচীন নগরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ স্থানের প্রায় সর্বত্রই মাটির নীচে প্রাচীন দেয়ালের ভিত্তি এবং অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।

নওদা গ্রামের উত্তরদিকে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বহনকারী কয়েকটি ঢিবি দেখা যায়। ঢিবিগুলি যেখানে আছে, সে স্থানটি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু। এ স্থান উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০০ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৮০০ ফুট প্রশস্ত। এ স্থানের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে একটি গ্রাম্য রাস্তা উত্তর পূর্বদিকে চলে গেছে। এ স্থানের উত্তর ও পূর্বদিকে প্রায় মজে যাওয়া পরিখা আছে। দক্ষিণদিকে আছে প্রশস্ত ও গভীর নিম্নভূমি। এ ধরনের নিম্নভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রায়ই উঁচু ভূমির পাশে দেখা যায়। পশ্চিমদিকে পুনর্ভবার পরিত্যক্ত খাত নিম্নভূমি সৃষ্টি করেছে।

এ স্থানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি বিরাট ঢিবি আছে। আজও (১৯৭৮ খ্রীঃ) এর উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট এবং এর নিম্নদেশ প্রায় ২ বিঘা ভূমি জুড়ে আছে। ঢিবিটি দেখে মনে হয় যে একটি প্রাচীন অট্টালিকার (খুব সম্ভব কোন মন্দিরের) ধ্বংসাবশেষ এতে লুকিয়ে আছে। এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি ছোট ঢিবি আছে। এককালে এটিও ছিল বিরাট। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে এটি বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর দক্ষিণে আছে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিবি। ইট হরণকারীরা এটিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ঢিবির উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটি অনুচ্চ সমতল ঢিবি আছে। ঢিবিটি দেখে মনে হয় যে দুর্গাকারে তৈরী একটি চকমিলান অট্টালিকা এখানে ছিল এবং মাঝখানে ছিল একটি ছোট উন্মুক্ত অঙ্গন। প্রশস্ত দেয়ালের অংশ বিশেষ সহ সেই অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চারপাশে আজও (১৯৭৮ খ্রীঃ) টিকে আছে যদিও ইট হরণকারীরা এর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে। মাঝখানের আঙ্গিনার চিহ্নও স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। সমতল ঢিবিটি প্রায় ৪ ফুট উঁচু।

চকমিলান ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে এটি

ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। কিন্তু এ স্থান থেকে যত প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি সবই বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মূর্তি এবং এখান থেকে কোন বৌদ্ধ মূর্তি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। পরিকল্পিতভাবে খনন না করে এ স্থানের সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে হিন্দু দেবতার মূর্তি দেখে মনে হয় যে সে সময়ে এস্থান হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এমনও হতে পারে তার অনেক আগে এ স্থান বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

বড় ঢিবি থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত আছে। অষ্টকোণাকারের আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর এই ছোট ইমারতটি খুব সম্ভব কোন মুসলমানের কবরের উপর নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন (১৯৭৮খ্রীঃ) সেই কবরের কোন চিহ্ন নেই। উম্মুক্ত উঁচু মাঠের মধ্যে এটি একাকী দাঁড়িয়ে আছে। সেই মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। সেগুলি সরিয়ে সেই উঁচু মাঠকে ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এসব দেখে মনে হয় এককালে এই মঠে অতীতে অসংখ্য ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল। স্থানীয় বৃদ্ধলোকেরা এই গ্রন্থকারকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন যে উত্তরদিকে অবস্থিত বড় ঢিবি বরাবর দক্ষিণদিকের নিম্নভূমিতে চাষ করার সময় তাঁরা ইষ্টক নির্মিত একটি পথের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সে পথ বড় ঢিবি থেকে অষ্টকোণাকৃতির এই ইমারতের নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই পাকা পথের কোন চিহ্নও এখন (১৯৭৮ খ্রীঃ) নেই। খুব সম্ভব দুটি স্থানের ইমারতাদি একই সময়ে অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে নির্মিত হয়েছিল এবং অষ্ট-কোণাকৃতির ইমারতটি অনেক পরবর্তীকালে নিমিত হয়েছিল।

এ স্থান দেখে ধারণা হয় যে ঢিবিগুলি যেখানে আছে সেটি ছিল মন্দিরাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং অনেক ছোট বড় মন্দির সেখানে নির্মাণ করা হয়েছিল। আর অষ্টকোণাকার ইমারতটি যেখানে অবস্থিত সেখানে ছিল নগরের আবাসিক ও অন্যান্য এলাকা। এই নগর যে এককালে নওদা-রহনপুর থেকে প্রায় ৪।৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রসাদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী হবার মত বড় শহর এটি ছিল। [আমাদের বক্তব্য : এ-সব অনুমান-ভিত্তিক আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব নেই।]

এই নওদা নামের সঙ্গে মীনহাজ বর্ণিত নুদীয়হ বা নওদিহ্ নামের কিছুটা

পার্থক্য থাকলেও যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। বাহ্যতঃ এই নওদা নাম ফারসী বলে মনে হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে কোন ফারসী নাম নয়। এই নামের প্রথম অংশ 'নও' ফার্সী শব্দ বলে মনে হলেও এটিকে সংস্কৃত নব শব্দের ফারসী রূপান্তর বলে সহজেই ধরা যায়। এর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'দা'-র সঙ্গে ফারসী ভাষার কোন সম্পর্কই স্থাপন করা যায় না। ফারসী ভাষায় দা শব্দের দুটি রূপ আছে: একটি হচ্ছে 'দা' (ইমারতের ভিত্তি) এবং অপরটি হচ্ছে 'দাহ' (দশ, ভৃত্য, ভিক্ষুক ইত্যাদি)। অতএব নওদা বা নওদাহ শব্দকে ফারসী বলে ধরা যেতে পারে না।

এ স্থান যদি সত্যই মীনহাজ বর্ণিত নুদীয়হ বা নওদীহ হয়ে থাকে তবে কালক্রমে নুদীয়হ বা নওদীহ থেকে নওদা-তে রূপান্তর খুব সম্ভাব্য ব্যাপার বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এদেশে ফারসী নুদীয়হ বা নওদীহ নামের অস্তিত্ব বাংলায় তুর্কী অধিকারের পূর্বে কি করে মেনে নেওয়া যায়? উত্তরে বলা যেতে পারে যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন সে সময়ে যে-স্থানে বসবাস রত ছিলেন সে স্থানের নাম ছিল খুব সম্ভব নবগ্রাম বা সে ধরনের কোন নাম যার প্রথম অংশে নব শব্দ ছিল। 'নব' শব্দকে ফারসী 'নও' শব্দে রূপান্তরিত করতে মীনহাজ বা তাঁর বর্ণনাকারীর কোন অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু 'গ্রাম' বা যুক্তাক্ষর সংবলিত কঠিন উচ্চারণের সে ধরনের কোন নাম নিয়ে তাঁদের অসুবিধার যে সীমা ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। সে কারণে খুব সম্ভব তিনি বা তাঁর বর্ণনাকারী সে স্থানের শেষ শব্দকে 'দীহ' তে রূপান্তরিত করে এস্থানকে নওদীহ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কালক্রমে তা নওদাতে রূপান্তরিত হয়েছে। [আমাদের বক্তব্য: এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নওদাতে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসস্তূপ বা স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের বা সেনবংশের সঙ্গে এর সম্পর্কের কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায় নি। তা যতক্ষণ পাওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত "অজ্ঞাতকুলশীল" নওদাকে মীনহাজ বর্ণিত লক্ষ্মণসেনের রাজধানী মনে করার কোন উপায় নেই; বিশেষত, এ ব্যাপারে নবদ্বীপ-নদীয়ার দাবী যখন কোনমতেই, নস্যাৎ হচ্ছে না।]

'শ্রাবণ মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে' ('১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট') প্রদত্ত মাধাইনগর তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে ধার্যগ্রাম' (?) নামক স্থানের নিকট অবস্থান কালীন 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির' 'বরেন্দ্র ভুমির' অন্তর্গত 'কান্তাপুরের' দিকে 'রাবণ হ্রদের' (নিকট ?) 'দাপুনিয়া পাটক' নামক স্থানে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন

'ঐন্দ্রী মহাশান্তি' অনুষ্ঠান পালন উপলক্ষে গোবিন্দ দেববর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।[১] পণ্ডিতদের মতে এই অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য ছিল কোন আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং তাঁদের মতে সেই আসন্ন বিপদ ছিল মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য আক্রমণের আশঙ্কা।

ধার্যগ্রাম পাঠ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ নন। তবে সে স্থানের নাম যা-ই হোক না কেন এই তাম্রশাসন পাঠে বোঝা যায় যে এ স্থানে বসবাসকালীন মহারাজা লক্ষ্মণ সেন মোহাম্মদ বখতিয়ারের আগমন বার্তা অবগত হয়েছিলেন। অপরদিকে মীনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ে (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে) মোহাম্মদ বখতিয়ার বিহারে অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত করে বঙ্গাভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (২১ ও ২৪ পৃঃ) এবং তাঁর 'বীরত্ব, শৌর্য ও বিজয়ের খ্যাতি যখন রায় লখমনিয়ার নিকট পৌঁছে তখন তাঁর রাজধানী "নওদীয়াহ" সহরে ছিল।' (২২পৃঃ)। এবং সে স্থান থেকেই মোহাম্মদ বখতিয়ারের শারীরিক গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য তিনি গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন (২৫ পৃঃ)। এ দুটি বর্ণনার তুলনামূলক বিচারে যে-অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তা হচ্ছে এই যে এ দুটি স্থান এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল তাম্রশাসনে বর্ণিত ধার্যগ্রাম (?)-এর নিকটবর্তী কোন একটি স্থান। মীনহাজের বর্ণনায় যে-নওদীহ নাম পাওয়া যাচ্ছে, তা ছিল খুব সম্ভব তাম্রশাসনে উল্লিখিত নামেরই ফারসীতে রূপান্তরিত রূপ। মীনহাজের বর্ণনামতে এ স্থান থেকেই মহারাজা লক্ষ্মণ সেন বঙ্গ ও সকোনাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত এ স্থান যে বিক্রমপুর, গৌড়-লক্ষ্মণাবতী অথবা নবদ্বীপ ছিল না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মীনহাজ বর্ণিত স্থানটিও এ তিন স্থানের কোন একটি হতে পারে না। সে স্থানটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্র অঞ্চলের কোথাও এবং সে স্থান গৌড়-লক্ষ্মণাবতী থেকে খুব দূরে অবস্থিত ছিল না। তাম্রশাসনের পাঠ থেকে সঠিক নাম উদ্ধার করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। নামের পাঠ একটু কঠিন বলেই মনে হয়। একজন বিদেশীর পক্ষে সেই কঠিন নামের উচ্চারণ খুব সহজ ছিল বলে

১। Inscriptions of Bengal, vol. III pp. 112 and 115.—N. G. Majumdar.

মনে হয় না। সে কারণেই খুব সম্ভব মীনহাজ নামটিকে যথা সম্ভব সহজ করতে চেয়েছিলেন এবং কিছু সাদৃশ্য বজায় রেখে এটিকে নওদীহ্ বলে পরিচিতি দিয়েছিলেন। এসব কারণে নওদার সঙ্গে এর সম্পর্ক অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। [আমাদের বক্তব্য : লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজ্যের সব জায়গাতেই যেতে পারেন। রাজধানী নবদ্বীপে হলেও যজ্ঞ করবার জন্য তিনি ধার্যগ্রামে যেতে পারেন।]

এখানে সুলতান মুঘীস উদ দীন ইউজবক তুঘরীল ৬৫৩ হিঃ (১২৫৫ খ্রীঃ) সনে যে মুদ্রাটি লখনৌতি থেকে প্রচলন করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। মুদ্রার যে সংশোধিত পাঠ ডক্টর আবদুল করিম দিয়েছেন[১] তা [থেকে দেখা যায়] ৬৫৫ (হিজরী) সনের রমজান মাসে লখনৌতি টাঁকশালে উরমর্দন বা উজমবদন ও নোদীযা র বাজস্ব থেকে (প্রচলিত)। উরমর্দন, আবমর্দন বা উজমর্দন এর সাবেক পাঠোদ্ধার ছিল আরজবদন।

এখানকার নোদীয়া পাঠ ও মীনহাজের নওদীহ বা নোদীযহ পাঠের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে প্রথমটিতে আছে শেষ অক্ষর "আলিফ" এবং দ্বিতীয়টির শেষ অক্ষর হা। কিন্তু বানানের এই সামান্য প্রভেদের উচ্চারণগত কোন প্রভেদ তখনকার দিনে ছিল কিনা তা সঠিভাবে বলা যায় না। তবে চিহ্ন বলেই ধারণা হয়। কারণ ইয়া অক্ষরের পরে হা অক্ষরের উচ্চারণ নীরব, আলিফ অক্ষরের মত নয় আর মীনহাজ এ স্থানকে (নওদীহ্) বলেই লিখেছেন, নওদীযা রূপে নয়।

সুলতান ইউজবক তুঘরীলের (১৭০ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকা দ্রঃ) শীতল মঠ শিলালিপির বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে তিনি ৬৫২ হিঃ (১২৫৪ খ্রীঃ) সনের আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং এতে ধারণা করা যায় যে দিল্লীর সাহায্যপুষ্ট জাজনগরের রাজার বিরুদ্ধে তাঁর চতুর্থ ও শেষ অভিযান এর অন্ততঃ এক বছর আগে অর্থাৎ ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হয়েছিল। সেই অভিযানে জাজনগরের রাজার রাজধানী উমরদন অধিকার করার কথা আছে। রেভার্টির মতে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে এ স্থানের নাম উমরদন এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে আরমরদন বা উরমর্দন, আজমরদন বা উজমরদন পাঠ আছে।[২] খুব সম্ভব এর

১। Corpus of the Muslim Coins of Bengal, p 22 —Dr. A. Karim.

২। রেভার্টি, ৭৬৩ পৃঃ ও ৪ পাদটীকা এবং বর্তমান গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা দ্রঃ।

সঠিক পাঠ উমরদনই কারণ, ফারসী লিপিতে সামান্য বেখেয়ালের জন্য (রে) এবং (ওয়া) প্রায় একই রকমে লিপিবদ্ধ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। উমরদনকে পণ্ডিতেরা হুগলী জেলার মান্দারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

উমরদন বা উরমদন নিয়ে আমাদের বিশেষ কোন সমস্যা নেই। [আমাদের বক্তব্য : এটা নিয়েই আমাদের সমস্যা বেশি এবং এই সমস্যার সমাধানও এ পর্যন্ত করা যায় নি (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৬৪-৬৫ দ্রঃ)।] সমস্যা হচ্ছে 'নোদীয়া' বা 'নওদীয়া' নিয়ে। শেষোক্ত এ স্থান ও মীনহাজ বর্ণিত 'নওদীহ' বা 'নোদীয়হ' কি এক ও অভিন্ন ? বানান ও উচ্চারণগত দিক থেকে বিচার করলে এ দুটি স্থানকে এক ও অভিন্ন বলা যায় না। তবে এই দুই নামের মধ্যে বানানগত যেটুকু সাদৃশ্য আছে তাতে এ দুটিকে ভিন্ন স্থান বলতেও অনেক সংকোচ হয়। কারণ, বানান ও উচ্চারণের সামান্য প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এদুটি স্থানকে বোধহয় অভিন্নই ধরা যায়। মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে বাঙলায় প্রায় একই নামের দুটি স্থানের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া খুব যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না। সুতরাং মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ এবং ইউজবকের মুদ্রায় উল্লিখিত নোদীয়া বা নওদীয়াকে এক ও অভিন্ন বলে ধরা যেতে পারে। [আমাদের বক্তব্য : যাকারিয়া সাহেবকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি 'নওদীহ' এবং 'নোদীয়া' বা 'নওদীয়া'কে অভিন্ন বলার জন্য। 'নওদীহ' যখন নোদীয়া নওদীয়ার সঙ্গে অভিন্ন, তখন তাকে নবদ্বীপের সঙ্গে অভিন্ন বললেই তো ঝামেলা চুকে যায়। খামকা 'নওদা'-কে টেনে আনার দরকার কি ?] সেক্ষেত্রে নওদীয়া বা নোদীয়া বলে একটি স্থান ছিল বলে মেনে নিতে হয়।

এ স্থান তা হলে কোথায় ছিল ? জাজনগর রাজ্যের রাজধানী (?) উমরদনের কাছাকাছি কি এ স্থানের অবস্থান ছিল ? সেক্ষেত্রে নবদ্বীপ-নদীয়ার সঙ্গে এ স্থানের অভিন্নতার প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, উমরদন ও নোদীয়া নামক দুটি নিকটবর্তী স্থানের রাজস্ব থেকে এ মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে।

কিন্তু দুটি স্থানকে কাছাকাছি বলে ধরার পিছনেও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। মুদ্রার পাঠ থেকে ধারণা হয় যে দুটি অঞ্চলের রাজস্ব থেকে মুদ্রাটি প্রচলিত হয়েছিল। সে দুটি অঞ্চলের মধ্যে একটিকে পাওয়া যাচ্ছে জাজনগর রাজ্যের অংশ হিসাবে। সম্পূর্ণ জাজনগর রাজ্য খুব সম্ভব তোঘরিল

অধিকার করতে পারেননি। এ রাজ্যে উমরদন অঞ্চল জয় করে সেখানকার রাজস্ব এবং নোদীয়া নামক আর একটি অঞ্চলের রাজস্ব যোগ করে তিনি মুদ্রাটির প্রচলন করেছিলেন। নবদ্বীপ অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল তখন খুব সম্ভব জাজনগর রাজ্যের অধীনেই ছিল। কারণ তুঘরীল তোঘানের পরে এবং ইউজবকের আগে এ স্থানে তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই মীনহাজের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে উমরদান-এর সঙ্গে একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নোদীয়া অর্থাৎ নবদ্বীপের নাম জুড়ে দেওয়ার কোন অর্থই থাকতে পারে না। [আমাদের বক্তব্য : কেন অর্থ থাকবে না ? দুটি স্থানই গুরুত্বপূর্ণ—দুটিই জাজ-নগর রাজের কাছ থেকে জয় করা, তাই ইউজবক নিজের গৌরব জাহির করার জন্য দুই স্থানের নাম এক সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ধরা যায়।]

এই নোদীয়া ছিল জাজনগর অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের বাইরে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অঞ্চল। এবং সে কারণেই খুব সম্ভব ইউজবক উমরদনের সঙ্গে নোদীয়ার নাম সংযোজন করেছিলেন। এ স্থান কি তবে পূর্বে উল্লিখিত নওদা ? হওয়া বিচিত্র নয়। গৌড়-লক্ষ্মণাবতী থেকে আনুমানিক মাত্র ২০।২৫ মাইল দূরবর্তী হলেও মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকেই পুনর্ভবা-মহানন্দার পূর্বতীরবর্তী এই অঞ্চলের একটি ভিন্ন পরিচয় ছিল এবং ইউজবকের আমলেও সেই পরিচয় টিকেই ছিল এবং সে কারণেই হয়ত আলোচ্য মুদ্রাতে এই স্থানের বিশেষ উল্লেখ ছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বর্তমান বিহার প্রদেশের অনেক অঞ্চল তখনও ইউজবকের শাসনাধীন ছিল। খুব সম্ভব গৌড় লক্ষ্মণাবতী থেকে বিহার অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করা হত। আর মহানন্দা-পুনর্ভবার পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল খুব সম্ভব নোদীয়ার অধীনে ছিল।

এই নোদীয়া যে নবদ্বীপ ছিল না এবং হতে পারে না এ সম্পর্কে উপরে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। [আমাদের বক্তব্য : যাকারিয়া সাহেবের আলোচনা পড়ার পরেও আমরা বলছি—এই নোদীয়া নবদ্বীপই। এখানে যুক্তির পুনরা-বৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।] তবে এখানে এটুকু আবারও বলা যেতে পারে যে সে স্থান নবদ্বীপ তো নয়ই, সে স্থান রাঢ় অঞ্চলেও ছিল না।

আমরা নওদার সঙ্গে এ স্থানের অভিন্নতার কথা বলেছি। তা হতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলার পিছনে যুক্তিসঙ্গত অনুমান ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণই নেই। তাই নওদাই যে মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ বা

নোদীয়াহ, তা আমরা জোর করে বলতে পারি না। এ স্থান নওদা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে যুক্তির উপর নির্ভর করে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্ ছিল খুব সম্ভব রাজশাহী বা মালদহ জেলার কোন স্থানে অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে, রাঢ় অঞ্চলে নয়।

(ঘ) মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ আক্রমণ ও বিজয়

মোহাম্মদ বখতিয়ারের নওদীহ আক্রমণ ও বিজয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে অশ্ববিক্রেতাব ছদ্মবেশে মোহাম্মদ বখতিয়ার বিনাবাধায় নওদীহ্ শহরে প্রবেশ করে রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন এবং এই অতর্কিত আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে রায় লখমনিযা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পরিবেশিত অন্ন ফেলে রেখে নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন এবং সমুদয় সৈন্য এসে পৌছলে মোহাম্মদ বখতিয়ার শহর অধিকার করেন (২৬ ২৮ পৃঃ)।

একটি বিবাট ঘটনার বর্ণনা এত সংক্ষেপে এবং এমন নাটকীয়ভাবে মীনহাজ দিয়েছেন যে তাতে পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করা কঠিন ব্যাপার। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী এক পরাক্রান্ত নৃপতি। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। অন্যান্য সৈন্যের কথা তর্কের খাতিরে বাদ দিলেও রাজার দেহরক্ষী বাহিনী, প্রাসাদ রক্ষী বাহিনী, শহরের কোতোয়ালের বাহিনী ও দ্বারী প্রহরীরা যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তারা সবাই নাকে তেল দিয়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করবে আর যাঁর ভয়ে সারা রাজ্য আতঙ্কিত সেই মোহাম্মদ বখতিয়ার মাত্র আঠারজন সঙ্গী নিয়ে বিনাবাধায় রাজপ্রাসাদ অধিকার করে নিবেন তা বিশ্বাস-যোগ্য ঘটনাই বটে! [আমাদের বক্তব্য : এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমতের জন্য এই বইয়ের ৬-৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

মীনহাজের বর্ণনায় যদি কোন সত্য থাকে তবে মেনে নিতে হয় নওদীহ্ আক্রমণের অন্তত এক বছর আগেই লক্ষ্মণ সেন মোহাম্মদ বখতিয়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্বস্ত চর পাঠিয়েছিলেন বিহার অঞ্চলে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পরেই শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং রাজার পাত্রমিত্রদের মধ্যে অনেকে প্রাণ-ভয়ে নওদীহ্ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ রাজা রাজধানী

পরিত্যাগ করা অসমীচীন মনে করে সেখানেই রয়ে গেলেন। অথচ মোহাম্মদ বখতিযার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের ভিতর দিযে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন, আর রাজা, প্রজা, সৈন্য-সামন্ত, চব, সীমান্ত বক্ষী বাহিনী প্রভৃতি সবাই কোন সংবাদ না রেখে পরম আলস্যে গা ভাসিযে দিয়েছেন, মীনহাজের এ বর্ণনা রূপকথার গল্পের মতই মনে হয়। মীনহাজের অনেক বর্ণনায একটি নাটকীযভাব দেখা যায। এখানেও সেই নাটকীয় ভাবই বিদ্যমান।

কিন্তু সত্যই কি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন সোনার থালে পরিবেশিত অন্ন ফেলে রেখে এমন নাটকীযভাবে পলাযন করেছিলেন? বিতর্কিত মাধব সেনের কথা বাদ দিলেও বিশ্বরূপ ও কেশব সেন নামক তাঁর দুই পুত্র যে অন্তত ১২২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরে বাজত্ব কবেছিলেন, তা তাঁদের বিভিন্ন তাম্রশাসনই প্রমাণ করে। [আমাদেব বক্তব্য: ডঃ দীনেশচন্দ্র সবকার প্রমুখ বিশেষজ্ঞদেব মতে কেশবসেনের কোন তাম্রশাসন পাওযা যায নি।] ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব কবেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় (২৮ পৃ)। নওদীহ্ ও লখনৌতি রাজ্য হস্তচ্যুত হবাব পরেও মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর পুত্রদ্বয বেশ গৌববের সঙ্গেই রাজত্ব কবেছিলেন বলে তাদেব তাম্রশাসনগুলি প্রমাণ করে। সে যুগের সেনদের বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও এর পিছনে সমর্থন জোগায। এতে ধারণা হয যে সেনেরা সবকিছু হারিযে 'রিফিউজি'-র মত 'বঙ্গে' আশ্রয় গ্রহণ করতে আসেননি। [আমাদের বক্তব্য কে বললে তাঁরা 'রিফিউজি'ব মত বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন? বাংলার উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব—চার অঞ্চলই লক্ষ্মণ-সেনের অধীন ছিল, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ হাতছাডা হলেও মধ্যবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ তাঁর অধীনই রইল এবং এখানে তিনি ও তাঁর বংশধররা "গৌরবের সঙ্গেই" রাজত্ব করতে লাগলেন।]

বিশ্বরূপ ও কেশব সেন যে সে সময়ে প্রাপ্তবযস্ক ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আসন্ন তুর্কী আক্রমণে ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ও বণিক সম্প্রদায় রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে গেলেও বৃদ্ধ নৃপতি কর্তব্যের অনুরোধে সেখানে থেকে গেলেন অথচ তুর্কী আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করার শক্তি তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। দৈবজ্ঞরা পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায়

অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে যবনের হাতে অনিবার্য মৃত্যু বা বন্দীদশার মুখে ফেলে রেখে উপযুক্ত পুত্ররা পূর্ববঙ্গের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাসরত থাকবেন তা আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না। তখনকার দিনের হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে সেনদের মত ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে এহেন কুলাঙ্গার পুত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। [আমাদের বক্তব্য : পুত্রেরা বোধ হয় পিতার প্রতিনিধি রূপে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করছিলেন।]

অথচ মীনহাজের নাটকীয় বর্ণনাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে মেনে নিতে হয় যে লক্ষ্মণ সেন যখন পালিয়ে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে আসেননি। কারণ, তিনি একাই নগ্নপদে পিছনদ্বার দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বা পুত্র কেউ মোহাম্মদ বখতিয়ারের হস্তে বন্দী হয়েছিলেন, এমন কোন উল্লেখও মীনহাজের বর্ণনায় নেই। যদি এমনটি ঘটে থাকত, তবে এর উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা। মীনহাজের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে রাজার পুত্রদের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। সম্ভাবনার দিক থেকে সমূহ বিপদের মুখে পতিত এই অতি বৃদ্ধ নৃপতির এই নিঃসঙ্গ অবস্থান আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না। মনে হয়, সমস্ত বর্ণনার মধ্যে কোথায় যেন একটি বিরাট ফাঁক আছে এবং তা সমুদয় বর্ণনাকে রহস্যময় ও প্রায় অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। [আমাদের বক্তব্য : লক্ষ্মণসেনের নারীদের বখতিয়ারের হাতে পড়ার কথা মীনহাজ লিখেছেন। পুত্রদের কথা লেখার কী দরকার ছিল, বুঝতে পারলাম না।]

পাঁজি-পুঁথির দোহাই : মীনহাজের বর্ণনার এ সম্বন্ধে যে-মুখরোচক গল্পটি আছে, তা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজা নিজে যে এতে পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করেননি, তা বোঝা যায় বিশ্বস্ত চর পাঠিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অবয়ব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্ণনাকে যাচাই করার দৃষ্টান্ত থেকে। এর পরেও পণ্ডিতদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তিনি খুব বেশী বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, বণিক ও ব্রাহ্মণগণ রাজধানী পরিত্যাগ করে গেলেও রাজা নিজে সেখানে থেকেই যান।

মীনহাজ এ বর্ণনা কেন দিয়েছেন এবং এতে কতখানি সত্য আছে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যদি পণ্ডিতদের কথা মত রাজা 'নওদীহ্' পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতেন, তবে এ বর্ণনার সার্থকতা সম্বন্ধে

অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যেত। একমাত্র মনোবল নষ্ট হওয়া ছাড়া রাজা ও তাঁর সৈন্য-সামন্তের বেলায় এই তথাকথিত ভবিষ্যৎ বাণী অন্য কোন কাজে লেগেছিল বলে মনে হয় না।

তবে মীনহাজের এই কাহিনীর মধ্যে যদি কোন সত্য আদৌ থাকে, তাহলে সে সময়ের সেন বংশীয় নৃপতিদের শাসিত বাঙলার আভ্যন্তরীণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কিছুটা ইঙ্গিতের সন্ধান এতে করা যেতে পারে। পাল রাজত্ব অবসানের আগে থেকেই বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এ ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হতে হতে আদি ধর্মের উপর অনেক প্রলেপ পড়ে এ ধর্ম নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সহজযান তান্ত্রিকবাদ ছিল সেই ধর্মের একটি রূপ। এই সহজযান থেকে আর একটি ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠে। নাথ ধর্ম নামে পরিচিত এ ধর্ম এদেশে ভাবের বন্যা বইয়ে দেয়। এ ধর্মের অভ্যুদয় খুব সম্ভব পাল রাজত্বের অবসানের আগেই ঘটে। [আমাদের বক্তব্য : নাথ ধর্ম খুবই আধুনিক ধর্ম ; ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাংলায় এই ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। পাল আমলে যে এই ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না, তা খুব সহজেই দেখানো যায় ; নাথেরা জালন্ধরি-পা বা হাড়ি-পা, কানু-পা ও মীননাথকে তাঁদের গুরু বলেছেন এবং তাঁদের সাহিত্যে এই তিনজনের সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই তিনজনই ঐতিহাসিক ব্যক্তি, মহাযানপন্থী বৌদ্ধ এবং পাল আমলের লোক। জালন্ধরি-পা কাহ্ন-পার গুরু হিসাবে চর্যাগীতিতে উল্লিখিত ; কাহ্ন-পা (কানু-পা) ও মীননাথ চর্যাগীতির রচয়িতা। এর থেকে বোঝা যায়, নাথ ধর্মের অভ্যুদয় অনেক পরবর্তী কালে হয়েছে, যখন পাল আমলের এই তিন ব্যক্তির নামে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হয়েছে এবং নাথেরাও তাঁদের দলে টেনে তাঁদের গুরু বানিয়েছেন।]

পালদের পরে এদেশে বর্মন ও সেনদের আবির্ভাব ঘটে। এই উভয় রাজবংশই যে ঘোর বৌদ্ধধর্ম বিরোধী ছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নেই। এঁদের রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। উদন্তপুর ও বিক্রমশীল বিহারের অস্তিত্ব থেকে বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তখনও টিকে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বর্মন-সেনদের অধিকার তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে কিছু কিছু

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের অস্তিত্ব সেখানে ছিল বলে জানা যায়। এখানে ওখানে ছিটে ফোঁটো কিছুসংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের কথা বাদ দিলে গোটা বাঙলায় এদের সংখ্যা যে অতি নগণ্য ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধধর্মের এহেন শোচনীয় অবস্থা হলেও নাথ ধর্ম বাঙলায় বেশ ভাল-ভাবেই অস্তিত্ববান ছিল। ব্রাহ্মণ্য, লোকায়ত ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এ ধর্মের উপর রাজরোষের কিছুটা প্রকোপ পড়লেও হিন্দুধর্ম ঘেঁষা এই নবধর্ম যে কিছুটা রেহাই পেয়েছিল তা অনুমান করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে নাথ ধর্ম টিকে থাকলেও নাথেরা ছিল গোটা হিন্দু সমাজের কাছে অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য। সাবেক বৌদ্ধদের অনেকেই এই নূতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বলে ধারণা হয়।

এহেন অবস্থায় রাজানুগ্রহ বঞ্চিত, রাজরোষে পতিত ও গোটা হিন্দু সমাজের কাছে অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই যে গোঁড়া হিন্দু রাজা ও গোটা হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যাদের অত্যাচারের ফলে তারা স্বধর্ম বঞ্চিত ও নির্যাতিত, তাদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থায় তারা তৎপর হয়ে উঠবে, তা অস্বাভাবিক কথা নয়।

বৌদ্ধ ও নাথদের মধ্যে তখনও খুব সম্ভব পণ্ডিতের অভাব ছিল না। জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে বৌদ্ধ বিহারগুলির খ্যাতি সর্বজনবিদিত এবং নাথদের মধ্যেও সে যুগের অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ করে আগম ও নির্গম শাস্ত্রের ক্ষেত্রে নাথ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ছিলেন একজন বিদগ্ধ নৃপতি এবং পণ্ডিতদের কদর যে তাঁর রাজ-সভায় ছিল সে প্রমাণের অভাব নেই। প্রাক্তন বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ অথবা তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ পাণ্ডিত্যের খাতিরে রাজ-দরবারে আসন পেয়ে থাকবেন, এ অনুমান যুক্তিসহ বলে ধরা যেতে পারে।

সুলতান মাহমুদের সতের বার ভারত আক্রমণ সমুদয় ভারতবাসীর হৃদয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পরেই এলেন অপরাজেয় যোদ্ধা সুলতান মু'ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম (মোহাম্মদ ঘোরী)। তিনি ও তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি কুতব-উদ-দীন আইবাক সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে উত্তর প্রদেশের

পূর্বসীমা পর্যন্ত তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন প্রমাদ গুণলেন। বিহার প্রদেশ অতিক্রম করলেই তাঁর গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্য অধিকারের পালা। এমন সময়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার বিহার অধিকার করলেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

অধিকৃত বিহার অঞ্চল থেকে বহু শরণার্থী যে সে সময়ে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এ অনুমান যুক্তিসহ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে স্বচক্ষে দেখে থাকবে এবং অনেকে তাঁর অবয়ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়ে থাকবে, তা খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার। লক্ষ্মণ সেনের শত্রু-পক্ষীয়রা যে এসব শরণার্থীর কাছ থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেহাকৃতি সম্বন্ধে সংবাদ পেয়ে থাকবে তাও সম্ভাবনার দিক থেকে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

এই শত্রুপক্ষীয়দের মধ্যে বৌদ্ধ ও নাথদেরকে অতি সহজেই ধরা যায়। প্রতিহিংসাপরায়ণ এই বৌদ্ধ ও নাথেরা খুব সম্ভব বিহারে অবস্থানরত ইখতিয়ার-উদ-দীন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিনি যে বঙ্গাভিযানে স্থানীয় লোকের সাহায্য পেয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। সুদূর তুরস্ক থেকে আগত ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী, তাঁর ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর অবস্থান স্থল, রাজ্যের বিভিন্ন পথ-ঘাট, নদীনালা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক সন্ধান যে স্থানীয় লোকের সাহায্য ছাড়া পাওয়া সম্ভব ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্থানীয় লোকেরা যে নিপীড়িত ও নির্যাতিত বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বীরা ছিল এই অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায়। কোন হিন্দুর পক্ষেও হয়ত এ ধরনের যোগসাজশ সম্ভবপর ছিল। তবে সেটা হত নিতান্ত ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে এবং সেক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীর সংখ্যা হত অতীব সীমাবদ্ধ। আর বৌদ্ধ ও নাথদের বেলায় সেই যোগ সাজশের সম্ভাবনা ছিল প্রায় গোটা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। [আমাদের বক্তব্য : যাকারিয়া সাহেব বোধ হয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতের (বর্তমানে যা বাতিল) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাথ ধর্মকে পাল আমলের ধর্ম বলেছেন। আমরা আবার বলছি, পাল বা সেন যুগে নাথ ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল বলে বিন্দুমাত্রও প্রমাণ মেলে না।]

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ইখতিয়ার-উদ-দীন কর্তৃক উদন্তপুর বিহার অধিকার এবং সেখানকার সকল ভিক্ষুদের হত্যা করার পরে (১৯ পৃঃ) বাঙলার বৌদ্ধদের বখতিয়ারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সম্ভাবনাকে খুব যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায় না। সেই বিহারের সকল অধিবাসীকে যে তিনি হত্যা করেছিলেন, মীনহাজের 'হামাহ কুশতাহ্ শুদান্দ' (তারা সকলেই নিহত হয়েছিল) উক্তি (১৯ পৃঃ) থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মীনহাজ এদেরকে 'ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করলেও এঁরা যে প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন মীনহাজের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিহত করার ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে ইখতিয়ার-উদ-দীনের প্রতি ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক।

তবে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি তাঁর পরবর্তী ব্যবহারের উপর তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব যে নির্ভরশীল ছিল এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। এ সম্পর্কে মীনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কোন সুস্পষ্ট উক্তি নেই। তবে উদন্তপুর বিহার অধিকারের পর স্থানীয় অধিবাসীদের ডেকে এনে বিহারে প্রাপ্তপুস্তকাদির পাঠোদ্ধারের দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের প্রতি তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেননি।

দুর্ব্যবহারের প্রশ্নও স্বাভাবিক বলে ধরা যায় না। প্রথমদিকে লুণ্ঠন কার্যে লিপ্ত থাকলেও বিহার অধিকারের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করলেও প্রজাদের উপর উৎপীড়ন থেকে যে একজন নূতন রাজ্য জয়কারী বিরত থাকবেন, তা ধারণা করা যায়। তদুপরি মীনহাজের বর্ণনায় এমন কোন উল্লেখ তো দূরের কথা, এমন কোন ইঙ্গিতও নেই যে ইখতিয়ার-উদ-দীন প্রজা সাধারণকে উৎপীড়ন করেছেন। পরবর্তীকালে আলী মেচকে ধর্মান্তরিত করা এবং ধর্মান্তরিত আলীমেচ ও তাঁর দলবলের ইখতিয়ার-উদ দীনের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যের দৃষ্টান্ত (অষ্টম অধ্যায়ে আলী মেচ দ্রঃ) থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে প্রজাসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধু সুলভ।

বিহার অধিকারকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভুলক্রমে নিহত করলেও পরবর্তীকালে প্রকৃত বিষয় অবগত হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব বৌদ্ধদের সঙ্গে একটি আপসমূলক সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন [আমাদের বক্তব্য : এর প্রমাণ কী ?] বৌদ্ধদেরও এ বিষয়ে আগ্রহ থাকার কথা। হিন্দু লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে বৌদ্ধদের

কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। [আমাদের বক্তব্য : এরই বা প্রমাণ কি ? লক্ষণসেনের আমলে বৌদ্ধদের অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করার উপকরণ পাওয়া যায় নি।] তারা সেখানে বহু নিগ্রহ ভোগ করে স্বধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই তাঁর প্রতি তাদের অফুরন্ত আক্রোশ ও প্রতিহিংসা থাকার কথা। বিজয়ী মুসলমানদের হাতে তাদের নূতন করে কিছু হারাবার আশঙ্কা নেই কারণ, তাদের যা হারাবার, সেই ধর্ম তারা হারিয়েই ফেলেছে। বরং ইসলাম ধর্মের যে রূপ তারা ইতিমধ্যেই হয়ত দেখেছে, তাতে নূতন করে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই জেনে তারা মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে।, তদুপরি তাদের প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করতে খুব সম্ভব তারা ইখতিয়ার-উদ-দীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

এই যোগসাজশের ভিত্তিতে খুব সম্ভব বৌদ্ধ ও সেই সঙ্গে নাথেরা মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিজয়ের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। খুব সম্ভব তাঁর অবয়বের পূর্ণ বিবরণ যোগসাজশকারীরা বঙ্গের বৌদ্ধ ও নাথদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই খুব সম্ভব বৌদ্ধ ও নাথ পণ্ডিতেরা তাদের পরম শত্রু লক্ষ্মণ সেনের ধ্বংস সাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থাদির দোহাই দিয়ে রাজাকে রাজ্য ছেড়ে যেতে পরামর্শ দেন। রাজা যে তাঁদের কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেননি সে সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু চরের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী যে মনোবল হারিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

পণ্ডিতদের তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাঁদের প্রাচীন পুস্তকে মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেহাবয়বের নিখুঁত বর্ণনা ও তাঁর নওদীহ্ অধিকারের সময়কাল ইত্যাদি দেওয়া থাকবে, এমন আষাঢ়ে গল্প কোন যুক্তিবাদী মানুষ বিশ্বাস করতে পারে কিনা জানা নেই। তবে সত্যের খাতিরে না হয়ে কোন সিদ্ধান্তকে জোর করে প্রমাণ করার তাগিদে কেউ যদি এই গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করেন, তা হবে স্বতন্ত্র কথা।

মীনহাজ বর্ণিত পণ্ডিতদের এ কাহিনীতে যদি কোন সত্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে নাথ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারাই এটি সংঘটিত হয়েছিল, তা অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। [আমাদের বক্তব্য : আমরা এটি অমূলকই বলতে চাই।] এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না

থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই। বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বীরা যে বাঙলার উত্তরাঞ্চলে অধিক সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সেই অঞ্চলের 'জোলা' মুসলমানদের আধিক্যই তা প্রমাণ করে। [আমাদের বক্তব্য: জোলারা যে আদিতে বৌদ্ধ ও নাথ ছিল, তার প্রমাণ কী? তারা হিন্দু ছিল বলেই তো মনে হয়। যাকারিয়া সাহেব মনে করেন যে লক্ষ্মণসেন বৌদ্ধ ও নাথদের ধর্মে আঘাত দিয়েছিলেন বলে তারা বখতিয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল; এর পর তারা নিজের ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে বন্ধুর ধর্মকে গ্রহণ করল—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?] এদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, এমন ধারণা অমূলক। যদি তাই হত, তবে হিন্দু অধিবাসীরাও বাদ পড়ার কথা নয়। [আমাদের বক্তব্য: হিন্দুরা যে বাদ পড়েছিল, তা যাকারিয়া সাহেব মনে করেছেন কেন? অবশ্য সব হিন্দুকে মুসলমান করা বাংলার মুসলিম বিজেতাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।] এবং উত্তর ও মধ্যভারতে যেখানে মুসলমান রাজশক্তি অধিক কাল ধরে এবং অধিক দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে সেখানেই মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কথা। তা হয়নি। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়েছে বাঙলায় এবং তন্তুবায়ী নাথ ও বৌদ্ধদের থেকে ধর্মান্তরিত 'জোলা' মুসলমানের আধিক্য হয়েছে উত্তর বঙ্গে। উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধ ও নাথেরা খুব সম্ভব নানা কারণে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এর মূলে প্রথম বঙ্গবিজয়ী তুর্কী মুসলমান মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে তাদের যোগসাজশের কথা খুবই সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয়। [আমাদের বক্তব্য: তা মনে হয় না]

নওদীহ অধিকার: মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক মহারাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ অধিকার ও তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা থাকলেও এতে যে কিছু সত্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে মীনহাজ যত সহজে ও সংক্ষেপে এ ঘটনা করেছেন এত সংক্ষেপে ও সহজে যে তা ঘটেনি তা মীনহাজের বর্ণনা থেকেই ধরা পড়ে। মোহাম্মদ শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তাতে দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যরা লক্ষ্মণসেনের সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল (৪৫ পৃ:)। তা-ই যদি হয় তবে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

যুদ্ধ যে হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় মীনহাজের বর্ণনা থেকেই। মোহাম্মদ বখতিয়ার নওদীহ শহর ধ্বংস করেছিলেন বলে মীনহাজ বলেছেন,

(২৯ পৃঃ)। যদি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর সৈন্যরা বিনা বাধায় শহর পরিত্যাগ করতেন অথবা শহর অধিকারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করতেন তা হলে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে এ শহর ধ্বংস করার কোন কারণই ছিল না। তিনি লখনৌতি বা অন্য কোন শহর ধ্বংস করেননি। নওদীহ্ শহর ধ্বংস করার প্রধান কারণ খুব সম্ভব ছিল ঐ শহর অধিকারে তিনি প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ হেরে গেলেও তিনি ক্রোধের বসে বোধ হয় এটি ধ্বংস করে ছেড়েছিলেন। [আমাদের বক্তব্য : লুঠপাট করে ধ্বংস করেছিলেন, এমনও হতে পারে এবং তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।] উভয় পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধটি হয়েছিল তাতে মোহাম্মদ বখতিয়ার বিজয় লাভ করলেও সে যুদ্ধ এক তরফা ছিল না।

[আমাদের বক্তব্য : এর পর যাকারিয়া সাহেব বখতিয়ার খলজীর তিব্বত-অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ নীচে উদ্ধৃত হল।]

মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান

মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান সম্পর্কে মীনহাজ বলেন যে ৬৪২ হিজরী (১২৪৪ খ্রীঃ) সনে দেবকোট ও বনগাউন নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী একস্থানে বসবাসকারী মোহাম্মদ বখতিয়ারের এক বিশ্বস্ত অনুচর মো'তামাদ-উদ দৌলার গৃহে এক রাতে অবস্থানকালে তিনি তাঁর নিকট থেকে তিব্বত অভিযানের বর্ণনা পান। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

"(এর পরে) যখন কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল এবং তুর্কীস্তান ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল ও লাখনৌতি নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল হলেন তখন তুর্কীস্তান ও তিব্বত অভিযানের বাসনা তাঁর মনকে পীড়ন করতে লাগল—২৯ পৃঃ।

"তিনি সৈন্য প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন ও আনুমানিক দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একদল প্রস্তুত করেন।—৩০পৃঃ।

• • • • •

"কোচ ও মেচ জাতির প্রধানদের মধ্যে একজন—যিনি আলী মেচ নামে (পরে) পরিচিত হন—মোহাম্মদ বখতিয়ারের হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন

এবং তিনি (মোহাম্মদ বখতিয়ারকে) ঐ পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া ও পথ প্রদর্শন করতে সম্মত হন। ·

"মোহাম্মদ বখতিয়ারকে (তিনি) একস্থানে নিয়ে আসেন, সেখানে মর্দান কোট (বর্ধন কোট ?) নামক এক নগর ছিল। কথিত আছে বহু প্রাচীনকালে শাহ গর্‌শ আস্‌প (যখন) চীনদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ও কামরূপের দিকে আগমন করেন (তখন তিনি) এ নগর স্থাপন করেন।—৩১ পৃঃ।

"এ নগরের সম্মুখ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। অসাধারণ বিশালতার দরুন এ নদীকে বাঁকমতী নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দুস্তানের মাটিতে যখন এটি প্রবেশ করে তখন এটিকে হিন্দুস্তানী ভাষায় 'সমুন্দর' (সমুদ্র) বলা হয়ে থাকে। বিরাটত্ব, আয়তন (ও গভীরতায়) এটি 'গঙ্গ' (গঙ্গা) নদীর চেয়ে তিন গুণ (বৃহৎ)।—৩২ পৃঃ।

মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ (নদীর) তীরে উপস্থিত হলেন এবং আলী মেচ মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। (তিনি) দশদিন ধরে নদীর ঊর্ধ্বমুখে সৈন্যদের চালিয়ে নিয়ে গেলেন ও পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে (অগ্রসর হয়ে) যে স্থানে (এসে) উপস্থিত হলেন সেখানে প্রাচীনকাল থেকে একটি সেতু বিদ্যমান ছিল। প্রস্তর কেটে এ সেতু নির্মিত হয়েছিল এবং তাতে ২০ কি আনুমানিক সেই সংখ্যার খিলান ছিল।—৩২পৃঃ

"তাঁর সৈন্য সেতু অতিক্রম করার পর (মোহাম্মদ বখতিয়ার) তাঁর দু'জন আমিরকে প্রচুর সৈন্যসহ সেতু প্রহরার কাজে নিযুক্ত করলেন যাতে তাঁর প্রত্যাগমন পর্যন্ত সেতু রক্ষিত হতে পারে। এ দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন তুর্কীদাস ও অপরজন খলজী আমির। মোহাম্মদ বখতিয়ার অবশিষ্ট (সমুদয়) সৈন্যসহ সেতু অতিক্রম করলেন।—৩২ পৃঃ

"মুসলমান সৈন্যদের সেতু অতিক্রম করার সংবাদ যখন কামরুদের রায়ের শ্রুতিগোচর হল (তখন তিনি) বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ প্রেরণ করলেন ও (তাদের মাধ্যমে) বলে পাঠালেন, 'তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। এ সময়ে প্রত্যাবর্তন করা ও (অভিযানের) পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করাই সমীচীন। অমি অঙ্গীকার করছি যে আগামী বৎসর আমার নিজস্ব বাহিনী প্রস্তুত করব ও মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে থাকব এবং ঐ (তিব্বত) রাজ্য অধিকার করব।

—৩২ ও ৩৩ পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন অজুহাতেই ঐ পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং তিব্বতের পর্বতাভিমুখে যাত্রা করেন॥ —৩৩ পৃঃ।

"...(মোহাম্মদ বখতিয়ার) সেতু অতিক্রম করে পঞ্চদশ দিবস ধরে উঁচু মালভূমি, উঁচু পর্বত, সংকীর্ণ গিরিপথ এবং অনেক স্থান ও জনপথ অতিক্রম করে ষোড়শ দিবসে তিব্বতের উন্মুক্ত (সম) ভূমিতে পদার্পণ করেন।—৩৪ পৃঃ

"ঐ (সমুদয়) অঞ্চলে (শস্য) ক্ষেত্র ছিল ও লোকের বসতিপূর্ণ জনপদ ছিল। (তারা) প্রথমে যে স্থানে উপস্থিত হয় সেখানে একটি দুর্গ ছিল। যখন মুসলমান সৈন্যগণ লুটতরাজ আরম্ভ করল (তখন ঐ) দুর্গের অধিবাসী ও পার্শ্ববর্তী স্থানের জনগণ লুটতরাজের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসলে যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যার নামাজের সময় পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চলল। মুসলমান সৈন্যদের মধ্য থেকে বহু (লোক) নিহত ও আহত হল।—৩৪ পৃঃ

"যুদ্ধক্ষেত্রে যখন রাত্রি নেমে এল এবং যুদ্ধে (শত্রু পক্ষের) যারা বন্দী হয়েছিল তাদের একদলকে সম্মুখে আনা হল এবং (তাদের নিকট থেকে) অনুসন্ধান করা হল (তখন) তারা বলল, 'এ স্থান থেকে পাঁচ ফার্সাং দূরে একটি শহর আছে। এটিকে করমবত্তন বলা হয়ে থাকে। সেখানে প্রায় ৫০ হাজার তুর্কী বীর ও তীরন্দাজ আছে। মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যদল এ স্থানে আসার সঙ্গে সঙ্গে দূতগণ সেখানে এক আবেদন পত্রসহ সংবাদ নিয়ে চলে গেছে যাতে (আগামীকাল) প্রাতঃকালে সে সমস্ত অশ্বারোহী সেনাদল এখানে এসে উপস্থিত হয়।"—৩৪ ও ৩৫পৃঃ।

"...মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন ঐ দেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন এবং (দেখলেন) যে মুসলিম বাহিনী পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং প্রথম দিনের যুদ্ধে (ই) অত্যধিক সৈন্য নিহত ও আহত (তখন তিনি) স্বীয় আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রত্যাবর্তন করাই সমীচীন যাতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এ রাজ্যে ফিরে আসা যেতে পারে।—৩৬পৃঃ

"প্রত্যাবর্তনের কালে সমগ্র পথে একটি তৃণপত্র বা একখানি বৃক্ষশাখারও অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত কিছু অগ্নিতে পুড়িয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই (সমুদয়) মালভূমি ও গিরিপথের পার্শ্বের সকল অধিবাসীদেরকে রাস্তার নিকট থেকে (অনেক দূরে) সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পনের দিনের মধ্যে এক সের

খাদ্য অথবা একখণ্ড তৃণও পশু (ও অশ্বদের) ভাগ্যে জুটেনি। কামরূদের পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে সেতুর মাথায় না পৌঁছা পর্যন্ত (তারা) সকলে অশ্বগুলি জবেহ্ করে খেতে লাগল।—৩৬ ও ৩৭ পৃঃ।

(সেতুর মুখে এসে তারা) দেখল যে সেতুর দুটি খিলান বিনষ্ট (করা হয়েছে)।—৩৭ পৃঃ

"যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার সৈন্যসহ এস্থানে এসে উপস্থিত হলেন (তখন নদী) অতিক্রম করার কোন পথ তিনি পেলেন না। সেখানে কোন নৌকা (ও) বিদ্যমান ছিল না। তিনি হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। (তাঁরা সকলেই) একমত হলেন যে কোন স্থানে অবস্থান করে নৌকা সংগ্রহ ও নদী অতিক্রম করার উপায় উদ্ভাবন করা সমীচীন (হবে)।—৩৮ পৃঃ।

"এ স্থানের নিকটবর্তী স্থানে একটি দেব মন্দিরের অস্তিত্বের কথা তাদেরকে বলা হল।···মোহাম্মদ বখতিয়ার ও অবশিষ্ট সৈন্যদল সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং নদী ও পানি অতিক্রম করার জন্য কাঠ ও দড়ি সংগ্রহের চেষ্টা এমনভাবে করতে লাগলেন যাতে মুসলমান সৈন্যদের বিপর্যয় ও অসহায় অবস্থা সম্পর্কে কামরূদের রায়ের প্রতীতি হল। তিনি রাজ্যের সমুদয় হিন্দুদের আদেশ দিলেন (এবং তারা) দলে দলে আসতে লাগল। তারা চোখা চোখা বাঁশের টুকরা মাটিতে পুঁততে লাগল এবং এগুলিকে একত্রে বাঁধতে লাগল এবং এগুলি শিকলের প্রাচীরের মত দেখাতে লাগল।—৩৯ পৃঃ।

"মুসলমান সৈন্যগণ এ অবস্থা অবলোকন (ও উপলব্ধি) করে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে বলল, 'যদি এমত (অবস্থায়) থাকি (তবে আমরা) সকলে বিধর্মীদের জালে (কয়েদীর মত) আবদ্ধ হয়ে পড়ব। মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করা (আশু)' কর্তব্য।—৩৯ পৃঃ।

"তাঁরা সকলে মিলে একযোগে আক্রমণ করল ও সেখান থেকে একসঙ্গে নির্গত হয়ে আসল এবং একস্থানে আক্রমণ করে রাস্তা করে দিল : এবং (সেই সংকীর্ণ স্থান থেকে) উন্মুক্ত স্থানে এসে উপস্থিত হল এবং হিন্দুগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। নদী তীরে এসে তারা থামল এবং প্রত্যেকে নদী অতিক্রম করার জন্য প্রাণপণে উপায় (উদ্ভাবনের) চেষ্টা করতে লাগল। সৈনিকদের মধ্যে একজন হঠাৎ তার অশ্বকে পানির দিকে ধাবিত করল। আনুমানিক এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত (নদীর গভীরতা) পার হবার মত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে

কলরব উঠল "চরা পাওয়া গেছে।"—৪০ পৃঃ।

"সকলে পানির দিকে অগ্রসর হল এবং হিন্দুগণ তাদের পশ্চাতে এসে নদীর তীর অধিকার করল। নদীর মধ্যপথে তারা যখন এসে পৌঁছল (তখন দেখা গেল) নদীর পানি গভীর। সকলে প্রাণ হারাল।—৪০ পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার সীমিত সংখ্যক অশ্বারোহীসহ—সংখ্যায় একশ কি কমবেশী—অতি চেষ্টায় নদী অতিক্রম করলেন। অন্যেরা সকলে জলে নিমজ্জিত হল।—৪১ পৃঃ।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন পানি থেকে বের হয়ে আসলেন তখন কোচ ও মেচদের একদলের মধ্যে সংবাদ পৌঁছে গেল। পথপ্রদর্শক আলী মেচ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পথে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা উপস্থিত হয়ে অনেক সাহায্য ও সেবা করলেন।—৪১ পৃঃ।

"(মোহাম্মদ বখতিয়ার) দেওকোটে পৌঁছে অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।"—৪১ পৃঃ

মীনহাজ কর্তৃক প্রদত্ত এ বর্ণনার অনেকাংশ এত সংক্ষিপ্ত ও এত অসামঞ্জস্য-পূর্ণ যে অভিযানের গতিপথ, মীনহাজ বর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অপরাজেয় (?) মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের জন্য যে প্রকৃতিই (এখানে নদীর গভীরতা) মূলতঃ দায়ী ছিল, তা মীনহাজের বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এতে অতি সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে সমগ্র ঘটনাটি যে-ভাবে ঘটেছিল, ঠিক সেভাবেই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন কিনা অথবা সঠিক তথ্যের সন্ধান তিনি আদৌ পেয়েছিলেন কিনা।

মীনহাজের বর্ণনা যতই সন্দেহব্যঞ্জক হোক না কেন, এ অভিযান সম্পর্কে এটি ছাড়া সে যুগের আর কোন বর্ণনাই নেই। এ ঘটনার শতবর্ষের মধ্যেও এমন কোন বর্ণনা নেই যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এ ঘটনার উপর যা লিখা হয়েছে, তা মীনহাজের বর্ণনারই চর্বিত চর্বণ মাত্র অথবা কমবেশী কোন কাল্পনিক বর্ণনা। এসব কারণে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে মীনহাজের বর্ণনাই একমাত্র অবলম্বন এবং এ বর্ণনাকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে যাচাই করে সত্যের সন্ধান করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মীনহাজ কয়েকটি স্থান, কিছু মানুষ ও মনুষ্য জাতি, কয়েকটি ভৌগোলিক

অবস্থান ও নদার উল্লেখ করেছেন। যদি এগুলিকে সমসাময়িক ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে সংযুক্ত করা যায়, তবে সম্ভবতঃ এই দুরূহ সমস্যা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি কোচ, মেচ ও থারো সম্প্রদায়, আলী মেচ, কামরূপের রায়, হিন্দু অধিবাসী প্রভৃতি মানুষ, লখনৌতি, দেবকোট, মর্দন বা বর্ধন কোট, কামরূদ, করম পত্তন বা করমবত্তন প্রভৃতি স্থান, বাঁকমতি, বাঁগমতি বা বেঁগমতি ও গঙ্গ প্রভৃতি নদী, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, গিরিপথ, টাঙ্গন ঘোড়া, প্রস্তর সেতু ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। এ সব বিষয় এ ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়ক হতে পারে।

মোহাম্মদ বখতিয়ার কোন স্থান থেকে অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই বলে এ সম্বন্ধে বিতর্কের অবশেষ নেই। 'নওদীহ' ধ্বংস করার পরে তিনি লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনায় উল্লেখ আছে (২৯ পৃঃ)। এতে সাধারণভাবে অনুমান করা হয় যে তিনি লখনৌতি থেকেই অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু বিপর্যয়ের পরে তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তন না করে দেবকোটে গিয়েছিলেন এবং অভিযানে অংশ গ্রহণকারী নিহত সৈনিকদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেবকোটেই (লখনৌতিতে নয়) মোহাম্মদ বখতিয়ারের সাক্ষাৎ ঘটে। তারা সংখ্যায় যে খুব বেশী ছিল, তা বোঝা যায় তাদের অভিশাপ ও গালাগালির ভয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে তাঁর গৃহ থেকে নির্গত না হবার দৃষ্টান্ত থেকে (৪১ ও ৪২ পৃঃ)। এসব কারণে সহজেই ধারণা হয় যে তিনি দেবকোট থেকেই অভিযান শুরু করেছিলেন এবং সেখানেই যে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এ ধারণাও অমূলক বলে মনে হয় না। [আমাদের বক্তব্য : এ সম্বন্ধে আমাদের মতের জন্য এই বই, পৃঃ ২৫-২৬ দ্রঃ।] তাঁর পরবর্তী কয়েকজন খলজী শাসনকর্তা যে দেবকোটেই শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, তা মীনহাজের বর্ণনায়ই আছে। এসব কারণে দেবকোটকেই অভিযানের যাত্রাস্থল বলে ধরে নেওয়া অধিক যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে নেপালের কাটমণ্ডু শহর ও নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত 'বাগমাত্তো' নদীই হচ্ছে মীনহাজ বর্ণিত যথাক্রমে করম-বত্তন বা করমপত্তন শহর ও বাঁকমতি বা বেগমতি নদী। কাটমণ্ডু লখনৌতি

থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পাটনা (বিহার) থেকে প্রায় ১৫০ মাইল সোজা উত্তরে অবস্থিত। যদি কাটমণ্ডুই মোহাম্মদ বখতিয়ারের গন্তব্যস্থল হত, তবে তাঁর পক্ষে লাখনৌতি বা দেবকোট থেকে যাত্রা করার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণই ছিল না। সেক্ষেত্রে তাঁর যাত্রা স্থল হত বিহার এবং সে স্থানে অনেক আগেই তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর প্রত্যাবর্তনের স্থানও বিহার হবার কথা। কাঠমণ্ডু থেকে প্রায় ৩২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত দেবকোটে ফিরে আসার তাঁর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। বিপর্যয়ের স্থান.থেকে নিকটতম ও সহজগম্য স্থান দেবকোট ছিল বলে তিনি সেখানেই ফিরে এসেছিলেন। অতএব কাটমণ্ডু ও নেপালের বাগমাতো নদীর প্রশ্ন এখানে অবান্তর বলে ধরা যেতে পারে। [আমাদের বক্তব্য : এ মত আমরা সর্বতো-ভাবে সমর্থন করি।]

অভিযানের গতিপথ সম্পর্কে আলোচনার আগে বাঙলার উত্তরাঞ্চল ও আসামের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত তৎকালীন নদীগুলি সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। এই আলোচনা মীনহাজ বর্ণিত বাঁকমতি বা বেগমতি নদীর পরিচয় নিরূপণে সহায়ক হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাঁকমতি বা বেগমতি নামের কোন নদীর পরিচয় তৎকালে ছিল বলে জানা যায় না এবং বর্তমানকালেও পাওয়া যায় না।

দেবকোটকে কেন্দ্র হিসাবে ধরলে দেখা যায় যে এর পশ্চিমের নদীগুলির মধ্যে পুনর্ভবা, টাঙ্গন ও মহানন্দা ছিল উল্লেখযোগ্য। আর পূর্বদিকের নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আত্রাই, যমুনা (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নয়), করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র।

মহানন্দা নদী তখনও বেশ বড় ছিল এবং এখনও মোটামুটি বড়ই আছে। কিন্তু বিহার ও বাঙলার সীমানা নির্দেশক এ নদীকে দেবকোট কেন্দ্রিক অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা যায় না। টাঙ্গন তেমন কোন বড় নদী ছিল না। অতএব এ নদী সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পুনর্ভবা নদীর বাম (পূর্ব) তীরে দেবকোট অবস্থিত। সুতরাং এ নদী আলোচ্য বাঁকমতি বা বেগমতি হতে পারে না।

দেবকোটের পূর্বদিকে অবস্থিত নদীগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে প্রাচীনকালের কোন মানচিত্র বা এমন কোন

নির্ভরযোগ্য দলিলপত্র নেই যার উপর নির্ভর করে বাঙলার উত্তরাঞ্চল ও আসামের পশ্চিমাঞ্চলের তৎকালীন নদীগুলি সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা যেতে পারে। রেনেলের মানচিত্র (১৭৬৪-৮১ খ্রীঃ) মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার অনেক পরবর্তীকালের এই মানচিত্রের নদীগুলিকে প্রাচীনকালের অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবাহ বলে ধরে নেওয়া খুবই অবাস্তব হবে। ভানডেন ব্রুকের মানচিত্রে (১৬৬০ খ্রীঃ) এ অঞ্চলের যে-সামান্য উল্লেখ আছে তা অকিঞ্চিৎকর এবং মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। সে যুগের অন্যান্য মানচিত্রের বেলায়ও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

এ অঞ্চলের নদীগুলির পরিত্যক্ত খাত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়তা করতে পারে। এ সব প্রাচীন ও পরিত্যক্ত খাতের অনেকগুলি আজও ধরা পড়ে। সেগুলির সঙ্গে জড়িত অনেক জনশ্রুতির কথাও জানা যায়। আমরা এ সমস্ত পরিত্যক্ত খাত অনেক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সংশ্লিষ্ট জনশ্রুতি সংগ্রহ করেছি। সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি বর্ণনা দিবার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

[আমাদের বক্তব্য : এই বর্ণনার প্রথমাংশ আমরা বাদ দিলাম, কারণ সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। শেষাংশ নীচে উদ্ধৃত হল]

করতোয়া ছিল বাঙলার উত্তরাঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী। আজ করতোয়া শুধু মৃত প্রায় নয়, মধ্য দেশে এর ধারাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা থেকে এ নদীর উৎপত্তি ছিল এবং নেপাল ও ভুটানের সীমারেখা চিহ্নিত করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী গতি ধারণ করে ভজনপুর নামক স্থানের কিছু উত্তরে সঙ্গো ও জোড়াপানি নামক দুটি ছোট পার্বত্য নদীর সঙ্গে এর মিলন ঘটে। এ স্থানের নাম সন্ন্যাসী কাটা। ভজনপুর থেকে করতোয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে 'চাও' নামক একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। চাও নদী এখন মৃত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চাও নদী যেখানে করতোয়াতে পড়েছিল সে স্থানের মাইলখানেক নীচে এককালে পুনর্ভবা করতোয়া থেকে নির্গত হত এবং রেনেলের মানচিত্রেও তা-ই আছে।

করতোয়া তার পূর্বমুখী গতিতে মুসলমান আমলের মীরগড়কে ডানপাশে ও

পঞ্চগড় শহরকে বামপাশে রেখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তালমা নামক একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর সঙ্গে মিশেছে। এর পরে করতোয়া কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতি ধারণ করে পূর্বে উল্লিখিত ঘোড়ামারা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় ২ মাইল ব্যাপী স্থানে ঘোড়ামারা নামে পরিচিত হয়ে পুনর্বার করতোয়া নাম ধারণ করে দক্ষিণ-মুখী হয়ে শালডাঙ্গা নামক একটি প্রাচীন বন্দরকে ডান পাশে ও দেবীগঞ্জ শহরকে বাম পাশে রেখে আলোক ঝারিতে গিয়ে পূর্বে উল্লিখিত আত্রাই নাম ধারণ করেছে। এর পরে এর দক্ষিণমুখী ধারায় করতোয়ার কোন উল্লেখ নেই। এটি পূর্বে বর্ণিত আত্রাই নদী।

আলোক ঝারি থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ থানার নিকট করতোয়ার সন্ধান আবার পাওয়া যাচ্ছে। করতোয়া সেখানে মৃত। এই মৃত নদীর উভয় তীরে বিশেষ করে ডান তীরে, অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ এবং প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট থানা এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর থানায় অনেকগুলি বিরাট আকারের বিল ও জলাভূমি দেখে সহজেই বোঝা যায় যে বিশালকায়া করতোয়ার পরিত্যক্ত খাতেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। নওয়াবগঞ্জ থানার আশুবার বিল ও পরগঞ্জ থানার বড় বিলার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

করতোয়ার যে-মৃত প্রায় ধারাটি নওয়াবগঞ্জ থানায় দেখা যায় তা-ই এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে দারিয়া নামক স্থানে রংপুর জেলার উত্তরাঞ্চল থেকে আগত যবুনেশ্বরী নামক একটি নদীর সঙ্গে মিশে কিছুটা সজীব হয়েছে।

এই বর্তমান করতোয়ার প্রধান উৎস এখন রংপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা চলে। দেওনাই (দেব নদী?) নামক একটি ক্ষুদ্র নদী জলপাইগুড়ি জেলার নিম্নদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে (এ নদী এককালে তিস্তার একটি শাখা ছিল বলে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়) দক্ষিণমুখী গতিতে ডোমারের পূর্বদিক ও ধর্মগড় নামক একটি প্রাচীন দুর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, ডোমারের কিছু পশ্চিমে উৎপন্ন একটি স্থানীয় নদীর সঙ্গে সৈয়দপুর-রংপুর পাকা সড়কের কিছু উত্তরে মিলিত হয়। সোনাহার নামক স্থানের নিকটবর্তী নিম্নভূমি থেকে উৎপন্ন একটি ছোট নদী দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে বদরগঞ্জ রেল ষ্টেশনের নিকট পূর্বে উল্লিখিত দেওনাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত স্রোত যবুনেশ্বরী নাম

ধারণ করে আঁকাবাঁকা গতিতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পূর্বে উল্লিখিত দারিয়ার নিকট প্রাচীন করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

যে-প্রাচীন করতোয়ার কথা আগে বলা হয়েছে, তার বর্তমান উৎস দেখা যায় সৈয়দপুরের কিছু উত্তর-পশ্চিমে নিম্নভূমি থেকে উৎপন্ন তিলাই নামক একটি অতি ক্ষুদ্র নদী। সৈয়দপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বেলাইচণ্ডী নামক একটি প্রাচীন স্থানের নিকট তিলাই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তিলাই দক্ষিণবাহী হয়ে পার্বতীপুরের পশ্চিমে যমুনা নাম ধারণ করে ফুলবাড়ি, চরকাই, বিরামপুর ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অনেক দক্ষিণে আত্রাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে

বেলাইচণ্ডীর নিকট তিলাই নদীর দ্বিতীয় ধারাটি ঘুণাই নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে খোলাহাটি রেল ষ্টেশনের পূর্বদিকে রেল লাইন অতিক্রম করে রংপুর-দিনাজপুর জেলাদ্বয়ের সীমানা নির্দেশ করে নওয়াবগঞ্জ থানার কিছু উত্তরে করতোয়া নামে পরিচিত হয়েছে। এই নদী বর্তমানে মৃত প্রায়।

করতোয়া ও যবুনেশ্বরীর মিলিত স্রোত দারিয়ার নিকট করতোয়া নামেই পরিচিত হয়ে রংপুর-দিনাজপুর জেলার সীমা নির্দেশ করে ঘোড়াঘাটের উত্তরে মইলা বা মহিলা নদী নামক একটি শাখা নদী সৃষ্টি করে দক্ষিণবাহী হয়ে কাটা-দুয়ারকে বাম এবং ঘোড়াঘাটকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতি ধারণ করে প্রাচীন বোগদহকে ডান পাশে রেখে অনেক দক্ষিণে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার নিকট নাগর নামক একটি ক্ষুদ্র শাখানদী সৃষ্টি করে বিখ্যাত মহাস্থান (প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন) গড়কে উত্তর ও পূর্বদিক দিয়ে বেষ্টন করে, বগুড়া শহরকে ডান পাশে রেখে দক্ষিণে শেরপুরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে পাবনা জেলার শাহজাদপুরকে ডান তীরে রেখে দক্ষিণে আত্রাই-বড়ালের মিলিত স্রোতে পতিত হয়েছে।

এতে দেখা যাচ্ছে যে আলোকঝারির নিকট উল্লিখিত করতোয়া এবং নওয়াবগঞ্জের নিকট প্রাপ্ত করতোয়ার মধ্যে বর্তমানে কোন সংযোগ নেই। করতোয়ার প্রাচীন ধারা যে এরকম বিচ্ছিন্ন ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই হারিয়ে যাওয়া ধারাটি তবে কোথায় ?

আপাতদৃষ্টিতে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বন্যাকেই এর জন্য দায়ী করা হয়। বন্যার

ফলে পুনর্ভবা উর্ধ্বভাগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং করতোয়া তার উর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। আত্রাই তার উর্ধ্বভাগের জলস্রোত হারিয়ে করতোয়ার জলরাশি দ্বারা কোন রকমে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে।

রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে দেবীডোবার নিকট পশ্চিম দিক থেকে আগত করতোয়া তিস্তা-আত্রাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে এবং সে স্থান থেকে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে সেই মিলিত ধারা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে এবং একটি ক্ষীণ ধারা করতোয়া নামে পরিচিত হয়ে পূর্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সোনাহারকে ডান তীরে ও ডোমারকে (মানচিত্রে ডোমার নেই) বাম তীরে রেখে দারোয়ানির পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে খোলাহাটির নিকট রেল লাইন (খোলাহাটি ও রেললাইন মানচিত্রে নেই) অতিক্রম করে নওয়াবগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্বদিকে যবুনেশ্বরী ও অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব বর্ণিত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

করতোয়ার এ গতি অনেক পরবর্তীকালের অর্থাৎ রেনেলের সময়ের কিছুকাল আগের ঘটনা এবং এককালের বিরাট করতোয়ার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এর আগে করতোয়া যে বহুবার গতি পরিবর্তন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, খানসামা, পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী এবং রংপুর জেলার চিলাহাটি, ডিমলা, ডোমার, নিলফামারী, সৈয়দপুর, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ থানাসমূহে অবস্থিত অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত এই উক্তির পিছনে সমর্থন জোগায়। প্রাচীন করতোয়ার গতির সন্ধানে আমরা এ সমস্ত ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু বছর ধরে অনুসন্ধান করেছি। প্রাচীন মানচিত্র, জনশ্রুতি সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল মিলিয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মাঝপথে হারিয়ে যাওয়ার আগে করতোয়া বহুবার তার গতি পরিবর্তন করেছিল।

প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসে করতোয়াকে এক বিশালনদী বলে অভিহিত করা হয়েছে।] আমাদের বক্তব্য : কোন্ সাহিত্যে ? কোন্ ইতিহাসে ? সেগুলি কত প্রাচীন ? আমরা এইরকম কোন পুরোনো ইতিহাস বা সাহিত্যের কথা জানি না।] এই বিশালতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার পরিত্যক্ত খাতগুলি থেকে। পঞ্চগড় শহরের নিকট করতোয়া অপেক্ষাকৃত একটি ছোট নদী। কিন্তু এ স্থানে ও ধারে কাছে এ নদীর খাত যা দেখা যায় তা সুবিশাল। এর উপরিভাগেও করতোয়ার সুবিশাল পরিত্যক্ত খাতের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ

ভজনপুরের নিকট করতোয়ার প্রাচীন খাতের কথা ধরা যায়। সেখানে শীতকালে করতোয়ার প্রশস্ততা ১০০ ফুটের বেশী নয়। কিন্তু এ স্থানে এ নদীর প্রাচীন খাত প্রায় অর্ধ মাইল প্রশস্ত। ভজনপুরের উর্ধ্বেও করতোয়ার প্রাচীন খাতের প্রশস্ততা অনেক স্থানে প্রায় অনুরূপ আয়তনের।

পঞ্চগড়ের নিকট করতোয়ার প্রশস্ততা খুব বেশী ছিল বলে ধারণা হয়। চাও, তালমা, ঘোড়ামারা-আত্রাই প্রভৃতি নদী করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হবার ফলে এর পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তবকাৎ-ই-নাসিরীতে বর্ণিত 'সমুন্দর' বলতে মীনহাজ খুব সম্ভব এ স্থানকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ এস্থানেই তখনকার দিনের 'হিন্দুস্তান'-এর আরম্ভ বলে ধরা যেতে পারে।

পঞ্চগড়ের পরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব মুখে করতোয়া বহুবার তার গতি পরিবর্তন করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চগড়-বোদা-দেবীগঞ্জ অঞ্চলের পূর্বভাগে যে-সমস্ত পরিত্যক্ত খাত দেখা যায়, এগুলি খুব সম্ভব করতোয়ার (আর পশ্চিম ভাগের খাতগুলি আত্রাই নদীর এবং এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে)। তবে এখানে উল্লেখ্য যে করতোয়ার যে-সব খাতের কথা এখানে বলা হল সেগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অর্থাৎ রেনেলের কিছুকাল আগের ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে।

করতোয়ার প্রাচীনতর ধারা পূর্বোক্ত অঞ্চলের আরও উত্তরদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং পঞ্চগড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে পূর্ববাহী হয়ে এ নদী বোদেশ্বরী দুর্গ ও মন্দিরের কিছু পশ্চিমে ঘোড়ামারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বমুখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আত্রাই নদীর সৃষ্টি করে চিলাহাটির কিছু দক্ষিণে বর্তমান দেবীগঞ্জ-চিলাহাটি রাস্তা অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে বর্তমান ভাওলাগঞ্জ হাটের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে আবার দক্ষিণমুখী হয়ে বর্তমান দেবীগঞ্জের পূর্বদিক অথবা দেবীগঞ্জের উপর দিয়ে গিয়ে ডোমারের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এর পরে এ নদী নীলফামারীর পশ্চিম ও সৈয়দপুরের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণে গিয়ে পূর্বে উল্লিখিত ঘুণাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নওয়াবগঞ্জের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দারিয়ার নিকট যমুনেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

চিলাহাটি, ভাওলাগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, ডোমার প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত দেখা যায়। আকারে ও আয়তনে এগুলি সুবিশাল। এই বিশাল খাতগুলি

যে করতোয়ার তাতে সন্দেহ নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে এগুলি তিস্তা-আত্রাইয়ের পরিত্যক্ত খাত। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ভাওলাগঞ্জের দক্ষিণে বর্তমান তিস্তা-আত্রাই নদীর গতিপথ রেনেলের মানচিত্রে দেখান গতিপথের প্রায় অনুরূপ। এ ধারাকে আরও পূর্বদিকে ঠেলে দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তা ছাড়া, রেনেলের মানচিত্রে বর্ণিত তিস্তা-আত্রাইয়ের ধারাটি অনেক পরবর্তীকালের অর্থাৎ করতোয়া যখন, যে কোন কারণে হোক, তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে তিস্তা-আত্রাই নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে তখনকার।

করতোয়া নদীর প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে উপসংহারে বলা যেতে পারে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানকালে করতোয়া ছিল এক সুবিশাল নদী। [আমাদের বক্তব্য : কত "সুবিশাল" নদী ছিল ? কোন পুরোনো মানচিত্র ও সমসাময়িক লিখিত বর্ণনা যখন নেই, তখন "অর্ধ মাইল প্রশস্ত" খাত থেকে করতোয়া বখতিয়ারের আমলে "গঙ্গার চেয়ে তিনগুণ বড়" নদী ছিল বলে সিদ্ধান্ত করলে তা বেপরোয়া সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পড়বে।] এবং হিমালয় থেকে অজস্র জলরাশি বহন করে ভজনপুর-পঞ্চগড়ের মধ্যবর্তী একস্থানে পুনর্ভবা নদীর সৃষ্টি করে পূর্ববাহী হয়ে তালমা ও ঘোড়ামারা-আত্রাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে, আত্রাই নদী সৃষ্টি করে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বোদেশ্বরী দুর্গ ও মন্দিরের দক্ষিণ-দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলাহাটির দক্ষিণে বর্তমান দেবীগঞ্জ-চিলাহাটি সড়ক ও রেললাইন অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে দেবীগঞ্জের উপর অথবা পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এর পর এ নদী কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বমুখী গতি ধারণ করে ডোমার ও নীল ফামারীকে বাম পাশে ও সৈয়দপুরকে ডান পাশে রেখে এবং চৌধুরী ডাঙ্গা নামক প্রাচীন স্থানকে (ভীমের লাঙল-জোয়াল) ডান পাশে রেখে তার দক্ষিণে ঘুণাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে খোলাহাটির পূর্বদিকে বর্তমান রেল লাইন অতিক্রম করে দক্ষিণবাহী হয়ে নওয়াবগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যবুনেশ্বরীর সঙ্গে মিশে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত ছিল।

করতোয়ার এই গতিপথই প্রাচীন কামরূপ ও গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের সীমা রেখা ছিল। নদীর গতি পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে এই দুই রাজ্যের মধ্যে সীমারেখার সাময়িক পরিবর্তন হলেও মোটামুটিভাবে করতোয়া নদীই উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করত। মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযান কালে করতোয়ার এই ধারাই যে কামরূপ ও লখনৌতি রাজ্যের সীমা-

রেখা ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

[আমাদের বক্তব্য : করতোয়াই যদি কামরূপ-রাজের রাজ্যের সীমানা হয়, তা হলে বখতিয়ার সেই সীমানা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপরাজ সুদূর কামরূপে বসে কী করে সীমানা পার হবার খবর জানলেন ও বখতিয়ারকে খবর পাঠালেন ? তখন তো টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন ছিল না। কাজেই বুঝতে হবে, বখতিয়ার যে জায়গায় "সীমানা" পার হয়েছিলেন, সেটা খাস কামরূপের কাছাকাছিই ছিল ; ডঃ ভট্টশালীর (এবং আমাদেরও) মত তাই-ই।

আর একটি কথা। এ কথা ঠিক যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত ফ্রান্সিস বুকাননের বিবরণীতে (জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের বিবরণ দেবার সময়ে) কামরূপকে করতোয়া নদীর ওপারে অবস্থিত দেশ বলা হয়েছে (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ৩য় সং, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ১৬৬)। যে বই অবলম্বনে বুকাননন এই কথা লিখেছেন—তাতে ১৬শ শতক অবধি সময়ের কথা লেখা আছে। সুতরাং এটি ১৬শ শতকের আগে রচিত হয়নি। ১৬শ শতকে করতোয়া নদী বাংলা ও কামরূপ রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করত বলে যদি ধরা যায়, তা হলেও বখতিয়ারের আমলে এই নদীই "উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করত" বলার কারণ নেই। এইটুকু মাত্র ধরা যায় যে ঐ সময়ে কামরূপরাজের রাজ্য কামরূপ অঞ্চলে (যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রাচান ও বিখ্যাত কামাখ্যা তীর্থ) অবস্থিত ছিল। এর কত দূরে ঐ রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখা ছিল, তা বলার মত কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া বখতিয়ার যে নদী পার হয়েছিলেন, তা যে দুই রাজ্যের সীমানা ছিল —এ কথাও কোথাও লেখা নেই। বখতিয়ার সীমানা মানতেন না। তিনি কামরূপ রাজ্যের ভিতরে ঢুকেও ঐ নদী পার হতে পারেন।]

বাঁকমতি নদী

মীনহাজ বর্ণিত বাঁকমতি, বেগমতি বা বাগমতি যে করতোয়া নদী তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মীনহাজ তাঁর বর্ণনায় করতোয়া নদীর নাম উল্লেখ করেননি। সেকালে করতোয়া বাঁকমতি বেগমতি প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল, এ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য গ্রন্থের ২০ তবকতে মীনহাজ বাঁকমতি নদীর যে বর্ণনা (৩২ পৃঃ) দিয়েছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ নদী করতোয়া ছাড়া অন্য কোন নদী হতে পারে না। পরবর্তী ২২

তবকতে তিনি একই নদী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও উপরের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাওয়া যায়।[১] সেখানে বর্ণনা আছে যে মালিক তুঘরীল ইউজবক কামরূপ অধিকারের প্রয়াসে বেগমতি বা বাঁকমতি নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতানুসারে বাঁগমতিকে যদি ব্রহ্মপুত্র নদী বলে ধরা হয়, তবে এ নদীর অপর তীরবর্তী ভূমি হবে গোয়ালপাড়া ও তুরা জেলাদ্বয় এবং গারো পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল। এ অঞ্চল অধিকারের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে গেলে ধরে নিতে হবে যে, সমুদয় রংপুর, কোচবিহার ও ধুবড়ী জেলা ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তোঘরীল ইউজবকের অধিকারে ছিল। [আমাদের বক্তব্য : তা কেন? কামরূপ অধিকারের আগে ইউজবক এসব অঞ্চল অধিকার করেছিলেন ধরা যায়।] মীনহাজ লিখেছেন যে বেগমতী বা বাঁকমতী নদী পার হবার পর ইউজবক কামরূদ (কামরূপ) নগর দখল করলেন। কামরূপ নগর কামরূপ অঞ্চলেই অর্থাৎ গৌহাটির কাছেই অবস্থিত ছিল। মীনহাজের ভাষা থেকে মনে হয় ঐ নগর বেগমতী বা বাঁকমতী নদীর অদূরে অবস্থিত ছিল। তখন পর্যন্ত এসব অঞ্চলে তুর্কীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না এবং মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে ইউজবক যে 'কামরূদ' রাজ্য অধিকার করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল পশ্চিম কামরূপ অর্থাৎ রংপুর, কোচবিহার ও ধুবড়ী জেলাসমূহ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এ সমস্ত কারণে ধারণা করতে কষ্ট হয় না যে কামরূপ ও গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যদ্বয়ের সীমা নির্দেশক করতোয়া নদীকেই মীনহাজ বাঁকমতি বা বেগমতি নদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মোহাম্মদ বখতিয়ার যে দেবকোট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি মর্দান বা বর্ধনকোট নামক স্থানে পৌছেন। এ স্থান কোথায় এবং এর পরিচয় কি? এখান থেকে মোহাম্মদ বখতিয়ার কোথায় গিয়েছিলেন? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিবার পূর্বে ডক্টর ভট্টশালী মোহাম্মদ বখতিয়ারের অভিযানের গতিপথ সম্বন্ধে সবিশেষ জোর দিয়ে যে-অভিমত প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে।[২] তাঁর

১। রেভার্টি ৭৬৪ পৃঃ, হাবিবী ৩২পৃঃ (দ্বিতীয় খণ্ড) ও বর্তমান গ্রন্থের ১৬৬ পৃঃ ও ৭ পাদটীকা দ্রঃ

২। Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet.—Dr. N. K Bhattasali, I. H, Q. Vol,. IX, 1933. p. 49.

মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার লখনৌতি থেকে অগ্রসর হয়ে 'বর্ধন কুঠী' নামক এক প্রাচীন স্থানে আগমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি রাঙ্গামাটি নামক আর এক প্রাচীন স্থানে উপস্থিত হন। রংপুর জেলার পূর্বভাগে অবস্থিত এই রাঙ্গামাটিকে তাঁর অভিমতের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উদ্দেশ্যে তবকাতের মূল ফারসী পাঠকে পরিবর্তন করে সেখানে নূতন পাঠ দিবার প্রস্তাব তিনি করেন।[১]

ডক্টর ভট্টশালী 'বাঁকমতি' শব্দের 'বে' অথবা 'মাঙ্গামাটি' শব্দের 'নূন'-কে 'রে' অক্ষরে রূপান্তরিত করে 'রাঙ্গামাটি' পাঠ পেতে চান। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

'With the name read as Rangamati, before which the Brahmaputra flows even this day and to which all the roads previously described which lead to Kamrupa converge, we at once land upon the solution. The author is speaking of Rangamati on the gate of Kamrupa and of the broad river flowing in its front, without actually naming the river. This amendment at once solves all difficulties.···The broad river actually flows before Rangamati and not before Bardhan Kuthi on rhe eastern bank of Karatoya. It is by the northern (right) bank of the Brahmaputra that Muhammad (Bakhtyar) marched towards Kamrupa starting from Rangamati and not along the right bank of Karatoya to Darjeeling or Shikkim as Blochman erroneously supposed.'—P. 56 of I. H. Q. vol. IX 1933.

এধারণার বশবর্তী হয়ে ডক্টর ভট্টশালী তবকাতের মূল পাঠের যে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

'Following that route Muhammad came to a place called Rangámati, In front of which place flows a river of vast magnitude···three times more that the river Gang.'[২]

১। অত্র গ্রন্থের ফারসী পাঠের ৯ পৃষ্ঠা এবং বাঙলা অনুবাদ ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।
২। ইংরেজীতে অনূদিত মূল পাঠ রেভার্টির গ্রন্থে ৫৬১ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

তার এ পাঠ যে নিছক মন গড়া এবং মূল ফারসী পাঠের (৯ পৃঃ দ্রঃ) সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন তা বলাই বাহুল্য। মেজর হ্যানের বর্ণনার উপর নির্ভর করে তিনি বলেন :

'...That the Muslim army met the Brahmaputra at Rangamati and then marched forward along the northern bank of the river. The distanee from Rangamati to Shilhako is about 100 miles and considering the number of rivers to be crossed on the way, it is not unlikely that it took the Muslim army 10 days to cover the distance. Bardhankot to Rangamati is about 85 miles and it is also not impossible that the period may refer to the time taken by the army to reach Shilhako from Bardhankot.

পরবর্তী ১৫ দিনের অভিযান সম্বন্ধে ডক্টর ভট্টশালী বলেন,

'Muhammad during the 15 days of his march to Tibet from Shilhako over difficult defiles and passes could hardly have covered more than 50 miles. That is, he possibly crossed the first line of mountains into Bhutan. Tibet was still far off. It is interesting to note that modern maps show a track actually proceeding straight north from the region of Shilhako and entering Bhutan by Rangla and Tambalpur. After crossing the first line of mountains and reaching the valley, we meet with a place ealled Kuree-Gumpa. This may be the Karapattan or Karabattan of the Tabakat. Kuree-Gumpa is about 60 miles north of Shilhako.'—P. 62.

মেজর হ্যানের বর্ণনাকে ভিত্তি করে ডক্টর ভট্টশালী 'শিলহাকো' (শিল= পাথর+হাকো=সাঁকো) নামক একটি প্রস্তর সেতুর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মতে মোহাম্মদ বখতিয়ার এ সেতুই অতিক্রম করেছিলেন এবং এর দুটি খিলান বিনষ্ট হওয়ার ফলেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাচীন কামরূপের কীর্তির নিদর্শন এ সেতু, তাঁদের মতে, উত্তর গৌহাটি শহর থেকে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে

অবস্থিত ছিল। প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপের মধ্যে যে-প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল, এ সেতু সে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বড় নদীর কোন প্রাচীন খাত বা ব্রহ্মপুত্র নদীর কোন শাখার উপর এ সেতুর অবস্থান ছিল। মেজর হ্যানে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এ প্রস্তর সেতু সম্পর্কে বলেন,

'...is built across what may have been a former bed of the Bara Nadi, or at one particular season of Brahmaputra, appearances now indicating a well defined water-course, through which, judging from marks at the bridge, a considerable body of waters must pass in the rains, and at that season, from native accounts, the waters of the Brahmaputra still find access to it.'—P. 58.

মেজর হ্যানের বর্ণনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর ভট্টশালী বলেন, বাঙলাদেশ ও আসামে প্রস্তর সেতুর অস্তিত্ব কালজামের মত প্রচুর নয়। প্রকৃতপক্ষে সম আয়তনের অন্য কোন প্রস্তর সেতু বাঙলাদেশ ও আসামে আছে বলে জানা যায় না। শিলহাকোর সেতুটিতে ২১টি জল নিষ্কাশনের পথ ছিল। তবকাতের বর্ণনায় দেখা যায় যে মোহাম্মদ যে-সেতু অতিক্রম করেছিলেন, তাতে ২০-এর অধিক খিলান ছিল। হ্যানে অত্যন্ত সঙ্গতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাঙ্গামাটিতে মুসলিম বাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদীর সম্মুখীন হয়। রেভার্টি বা ব্লকম্যানের নিকট মোটেই ধরা পড়েনি যে এস্থানই তবকাতের রাঙ্গামাটি বা নাঙ্গামাটি। শিলহাকোর ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কানাইবড়শি গিরিলিপির আবিষ্কার এখন প্রায় নিঃসন্দেহ করেছে যে ঐ (শিলহাকো) সেতুর উপর দিয়েই মোহাম্মদ (বখতিয়ার) অতিক্রম করেছিলেন।'[১]

ডক্টর ভট্টশালী তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করার জন্য অনেক জোরাল যুক্তির অবতারণা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়টা আলোচনা করতে গিয়ে এ ঘটনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকে তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। মেজর হ্যানের শিলহাকোর বিবরণ ও কানাই বড়শি শিলালিপির আবিষ্কারে তিনি এমনভাবে অভিভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয় যে মীনহাজ

১। ডক্টর ভট্টশালার উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের ৫৯ পৃষ্ঠার পাঠের বাঙলা অনুবাদ। গ্রঃ

অভিযানের পথের যে সব ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি তাঁর নজরেই পড়েনি বলে ধরে নিতে হয়।

মীনহাজের বর্ণনায় আছে যে মর্দন বা বর্ধনকোট 'নগরের সম্মুখ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত ছিল' এবং 'বিরাটত্ব, আয়তন (ও গভীরতায়) এটি "গঙ্গ" (গঙ্গা) নদীর চেয়ে তিন গুণ (বৃহৎ) ছিল। নগরের পূর্বদিকে যে এ নদী ছিল তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না [আমাদের বক্তব্য : মীনহাজ কোন দিকের উল্লেখ করেন নি, তিনি শুধু লিখেছেন, নগরটির সামনে দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হচ্ছে।] এবং মীনহাজের বিবরণীতে দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ার এ নদী অতিক্রম করেননি। বর্ধনকুঠী বর্তমানে করতোয়া নদী থেকে প্রায় ৪ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত এবং এ নদী কোন কালেই বর্ধন-কুঠীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল না।

[আমাদের বক্তব্য : অতএব এ নদী করতোয়া নয়, এ সিদ্ধান্তও করা যায়। আসলে, এ নদী যে ব্রহ্মপুত্র, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। বদাওনী স্পষ্টই লিখেছেন যে এই নদী "ব্রহ্মণপুত্র" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র। যদি বলা যায়, বদাওনী আন্দাজে লিখেছিলেন—তা হলেও প্রমাণ হয় যে বদাওনীর আমলে করতোয়া এমন কিছু বিশাল নদী ছিল না ; তাই বদাওনী মীনহাজের "গঙ্গার চেয়ে তিন-গুণ বড়" নদী ব্রহ্মপুত্র ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে মনে করেন নি।] অতএব মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট আলোচ্য বর্ধনকুঠি হতে পারে না।

খুব সম্ভব রেনেলের মানচিত্রের উপর নির্ভর করে ডক্টর ভট্টশালী করতোয়া নদীকে উপেক্ষা করে গেছেন। সেখানে করতোয়া একটি ক্ষীণকায়া নদী। তিনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে তিব্বত অভিযানের প্রায় ৫৭৪ বছর পরে প্রস্তুত এ মানচিত্র প্রকৃত ঘটনার সময়ের করতোয়া নদীর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পারে না। এ নদী সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে এককালে করতোয়া ছিল এক সুবিশাল জলস্রোত এবং রামায়ণ-মহাভারতের সময় [আমাদের বক্তব্য : রামায়ণ-মহাভারতের সময়ের কথা কী করে জানা গেল ?] থেকে আরম্ভ করে সুলতানী আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত করতোয়া নদী গৌড় ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দেশ করত। রেনেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত করতোয়ার আকার-আয়তনকে যদি এ নদীর সর্বকালের রূপ বলে ধরা হয়, তবে অবশ্য মেনে নেওয়া যায় যে এ নদী বরাবরই ক্ষীণকায়া ছিল।

সেটি অসম্ভব। [আমাদের বক্তব্য : অসম্ভব কেন ? এর চেয়েও ক্ষীণকায় নদী মন্ত্রেশ্বর হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা ও উড়িষ্যা রাজ্যের সীমারেখা ছিল।]

তা ছাড়া বর্ধনকুঠীর প্রাচীনত্ব এবং এ শহর মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময়ে আদৌ অস্তিত্বশীল ছিল কিনা সে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ আছে। বর্ধনকুঠীর জমিদারগণ এককালে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মোঘলদের আগে এ পরিবার ও তাঁদের নিবাস স্থল বর্ধনকুঠিকে টেনে নেওয়া যায় না। এখানে দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীনতর মন্দিরটি ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে রাজা ভগবান দাস নামক জনৈক জমিদার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে মন্দির গাত্রের শিলালিপি থেকে জানা যায়। তিনি ছিলেন এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় মন্দিরটি আরও পরবর্তীকালের। এ দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং পরবর্তীকালে নির্মিত জমিদারদের বিভিন্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং জমিদারদের দ্বারা খনিত একটি দীঘি ও কয়েকটি পুকুর ছাড়া বর্ধনকুঠীতে আর কোন প্রাচীনতর কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায় না। এটি ছিল মোঘল আমলের একটি জমিদার বাড়ি এবং ব্রিটিশ আমলেও তাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ তো দূরের কথা, সুলতানী আমলেও শহর হিসাবে এ স্থানের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। [আমাদের বক্তব্য : ছিল না—তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন সময়ের ইতিহাসে কোন স্থানের অনুল্লেখ থেকেই প্রমাণ হয় না যে ঐ সময়ে ঐ স্থান ছিল না।] অতএব এ স্থান মীনহাজ বর্ণিত বর্ধনকোট হতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্ধন নামকে কেন্দ্র করে কোন কোন পণ্ডিত বর্ধনকোটকে পুণ্ড্র-বর্ধন অর্থাৎ মহাস্থান বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন। এ ধারণাও নিছক কল্পনাপ্রসূত। মীনহাজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে ইখতিয়ার-উদ-দীন তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন (পূর্ব বঙ্গ অভিযানে নয়)। দেবকোট থেকে এমন কি লখনৌতি থেকেও তিব্বত অভিযানে যেতে হলে, তাঁর উত্তর, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্বদিকে যাওয়ার কথা—দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্বদিকে নয়। মহাস্থান দেবকোট ও লখনৌতির দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। তিব্বত অভিযানে আলী মেচের মত একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শকের উপস্থিতিতে ইখতিয়ার-উদ-দীন-উত্তর, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্বে না গিয়ে দক্ষিণ-পূর্বদিকে পূর্ববঙ্গের পথে অগ্রসর হবেন, তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা

বলে ধরা যায় না।

ডক্টর ভট্টশালীর বর্ণনায় ফিরে আসা যেতে পারে। তাঁর মতে ইখতিয়ার-উদ-দীন বর্ধনকুঠী থেকে রাঙ্গামাটি গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে শিলহাকো। তাঁর মতে রাঙ্গামাটি থেকে শিলহাকোর দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থানের আকাশপথের দূরত্ব প্রায় ১২৫ মাইলেরও বেশী। কোন সুনির্দিষ্ট রাস্তা ধরে গেলে সে দূরত্ব ২০০ মাইলেরও বেশী হবে। পথে ছোট বড় অসংখ্য নদী, বিল ও জলাভূমি অতিক্রমের প্রশ্নতো আছেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে অসংখ্য খাল-বিল, ছোট নদী ও জলাভূমির কথা বাদ দিলেও জলঢাকা, তোরশা, সনকোশ, মানস ও বেকী নদীর মত বিরাট আকারের নদী অতিক্রম করার প্রশ্ন সেখানে ছিল। এ সমস্ত নদীর সুবিস্তৃত মোহনা এলাকা এড়িয়ে আরও উত্তর দিক দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান রংপুর-গৌহাটি রেল লাইন বা পাশাপাশি কোন রাস্তা ধরে যদি যাওয়ার কথা চিন্তা করা যায়, তবে সে পথের দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইলের কম কিছুতেই হতে পারে না। ইখতিয়ার-উদ-দীন তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে মাত্র ১০ দিনে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, তা কল্পনারও বাইরে। পথের দূরত্বের চেয়ে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল ও জলাভূমি অতিক্রমের প্রশ্ন ছিল তখনকার দিনে এক বিরাট সমস্যা। সেখানে এত অল্প সময়ে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

ডক্টর ভট্টশালী কর্তৃক উদ্ধৃত মেজর হ্যানের বর্ণনায় দেখা যায় যে শিলহাকো প্রস্তর সেতুটি বড় নদী অথবা ব্রহ্মপুত্র নদীর একটি শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদি ডক্টর ভট্টশালীর অভিমত গ্রহণ করতে হয়, তবে বাকমতি বা বেগমতি নদীকে ব্রহ্মপুত্র নদী বলে ধরে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করার কথা, বড় নদী বা ব্রহ্মপুত্রের কোন শাখা নদীকে নয়। যদি তার মত মেনে নিতে হয়, তবে বলতে হয় যে ইখতিয়ার-উদ-দীন কোনদিনই বাঁকমতি অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করেননি। [আমাদের বক্তব্য : মীনহাজের বিবরণে আছে, ঐ নদীর "উর্ধ্বমুখে" (যাকারিয়া সাহেবের অনুবাদ) দশ দিন ধরে চলার পর বখতিয়ার সেতুটি পান। কোন নদীর উর্ধ্ব-মুখে দশ দিন ধরে চললে নদীর কোন এক tributary-তেও আসা যায়। বখতিয়ার ব্রহ্মপুত্র নদী ধরে দশ দিন চলে তার কোন এক tributaryতে ঐ সেতুটি পেয়েছিলেন—এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই।]

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জলঢাকা, তোরশা, প্রভৃতি বিরাট বিরাট নদী অতিক্রম করার পর, আনুমানিক ১০০ ফুট প্রশস্ত একটি পার্বত্য নদী অতিক্রমের ব্যাপারে কেমন করে এত বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে তা সত্যই বিস্ময়কর বটে। ২১টি খিলানে নির্মিত এ প্রস্তর সেতুর দৈর্ঘ (মেজর হ্যানের বর্ণনামতে) ছিল আনুমানিক ১২০ ফুট। সেক্ষেত্রে নদীর প্রশস্ততা ১০০ ফুটের বেশী হতে পারে না। শীতের শেষে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র নদীটি কি সত্যই এত বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে? [আমাদের বক্তব্য: পারে, যদি তার কোন অংশ গভীর হয়।]

ডক্টর ভট্টশালীর মতে শিলহাকো অতিক্রম করে ইখতিয়ার-উদ-দীন উত্তর-দিকে গিয়েছিলেন এবং ১৫ দিনে আনুমানিক ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে কোরিগুম্পা নামক স্থানের আনুমানিক ১০ মাইল দক্ষিণে এসে পৌছেছিলেন। তাঁর মতে এই কোরিগুম্পাই মীনহাজ বর্ণিত করপত্তন বা করবত্তন। এতে দেখা যাচ্ছে যে মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রতিদিন গড়ে মাত্র ৩ মাইল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অতি মন্থরগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডক্টর ভট্টশালী বলেন যে অভিযানকারীকে পার্বত্য অঞ্চল, দুর্গম গিরিপথ ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়েছিল বলে এর বেশী দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই যুক্তি সত্যই গ্রহণযোগ্য কিনা, তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে।

রাঙ্গামাটি থেকে শিলহাকো পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে ডক্টর ভট্টশালী ইখতিয়ার-উদ-দীনকে দিনে ২০ থেকে ২৫ মাইল গতিবেগ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, যদিও সেখানে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল, জলাভূমি অতিক্রম করার প্রশ্ন ছিল প্রায় পদে পদে। আর শিলহাকো থেকে কোরিগুম্পার দক্ষিণে অবস্থিত যে পার্বত্য অঞ্চলের কথা তিনি বলেছেন সে পথে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী তুর্কী অভিযানকারীদের পক্ষে চলা মোটেই অসুবিধাজনক হবার কথা নয়।

শিলহাকো থেকে ভুটানের সীমানা পর্যন্ত আনুমানিক ৪০ মাইল প্রশস্ত যে ভূখণ্ড আছে, তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাহাড় ঘেরা উঁচুভূমি হলেও এ অঞ্চলকে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল বলা যায় না কোন মতেই। এটিকে মোটামুটিভাবে উঁচু মালভূমি বলা যেতে পারে এবং এই ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করতে তুর্কী অভিযান-কারীদের বড় জোর ৪ দিন সময় লাগার কথা। সেক্ষেত্রে ডক্টর ভট্টশালীর মত মেনে নিলে বাকী ১০ মাইল পথ অতিক্রম করার জন্য তাদের প্রায় ১০।১১ দিন

সময় লেগেছিল বলা যেতে পারে। বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে।

[আমাদের বক্তব্য : রাঙ্গামাটি থেকে শিলহাকো পর্যন্ত বখতিয়ারের বাহিনী ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল বলে দিনে ২০ থেকে ২৫ মাইল গতিবেগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চল প্রধানত পায়ে হেঁটে ও ঘোড়াকেও হাঁটিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল—তাই সেখানে গতিবেগ মন্থর হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের মুখে পৌঁছে বখতিয়ারের বাহিনী পথ ঘাটের সন্ধান নেওয়ার জন্য কয়েকদিন নিশ্চল ছিল বলেও ধরা যেতে পারে।]

প্রস্তর সেতুর ব্যাপারে ডক্টর ভট্টশালী অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে এটিই একমাত্র সেতু যেটিকে তুর্কী অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং এটি ছাড়া বাঙলা ও আসামে এই মাপের আর কোন সেতুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেছেন যে প্রস্তর সেতু এদেশে কালজামের (black berry) মত প্রচুর নয়।

উত্তরে বলা যেতে পারে যে শুধু প্রস্তর সেতুর জন্যই ঘটনার স্থানকে সুদূর গৌহাটি অঞ্চলে টেনে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কালজামের মত প্রচুর না হলেও পাথরের সেতুর অস্তিত্ব এদেশে সে সময়ে এবং সে সময়ের আগেও ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত পাথরঘাটা (মাহীগঞ্জ) সেতুর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। থানা থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে তুলসী গঙ্গার উপরে নির্মিত এই প্রস্তর সেতুর ধ্বংসাবশেষ আজও টিকে আছে। আমরা বিগত ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরেও এই ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখে এসেছি। প্রায় ১৫০ ফুট দীর্ঘ এই সেতুটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও নদীর উভয় তীর সংলগ্ন প্রস্তরভিত্তি ও খিলানের কিছু অংশ আজও টিকে আছে। যেখানে সেতুটি ছিল সেখানে এবং কিছু ভাটি এলাকায় মৃতপ্রায় নদীর বুকে সেই সেতুর ভগ্নাবশেষের অসংখ্য বিরাট বিরাট প্রস্তর খণ্ড পড়ে আছে।

[আমাদের বক্তব্য : ডঃ ভট্টশালী লিখেছেন, পাথরের সেতু প্রচুর নয়। যাকারিয়া সাহেব একটি মাত্র পাথরের সেতুর কথা বলে প্রমাণ করলেন যে পাথরের সেতু সত্যিই প্রচুর নয়।]

সংখ্যায় কম হলেও এ রকম প্রস্তর সেতু বাঙলা ও আসামের অন্যত্রও ছিল, এমন ধারণা যুক্তিসহ বলে ধরা যেতে পারে। আর যদি প্রস্তর সেতুর অবস্থানই

ঘটনাস্থল নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হয় এবং অন্যান্য যুক্তিকে জোড়াতালি দিয়ে তার সঙ্গে খাপ খাওয়ান হয়, তবে তর্কের খাতিরে বলতে হয় যে আলোচ্য ঘটনাস্থল পাথরঘাটাতেই ছিল বলেই মেনে নিতে হয়। অবশ্য পাথরঘাটা ঘটনাস্থল ছিল না এবং হতেও পারে না। শিলহাকোতেও সে ঘটনা ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। সে আলোচনা পরে করা হয়েছে।

কানাই বড়শি গিরিলিপি

তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে অধিকতর যুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ডক্টর ভট্টশালী কানাই বড়শি গিরিলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। গৌহাটি শহরের পূর্ব প্রান্তের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর তীরে এক পাহাড়ের গায়ে যে লিপিটি আছে, সেটিকে কানাই বড়শি বাওয়া গিরিলিপি বলা হয়। ডক্টর ভট্টশালীর প্রবন্ধ থেকে গৃহীত লিপিটির ছবি অপর পৃঃ।

পাঠ ঃ

শাক ১১২৭

শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে।

কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাক্ষয় মায়যু ॥

ডক্টর ভট্টশালী এ লিপির যে ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

'In Saka (expressed by) horse, two and Isa (horse = 7, two = 2, Isa = 11 i. e. 1127) on the 13th of the month of Madhu (i.e. Caitra), the Turuskas obtained annihilation on arriving in Kamrupa.'

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এ গিরিলিপির প্রথম উল্লেখ করেন (I. H. Q. 1927, 843)। তিনি লিপির ১৩ই চৈত্রকে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শুরু ইংরেজী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৪ কি ১৫ এপ্রিল সাধারণতঃ পহেলা বৈশাখ হয়ে থাকে) এবং এটিই প্রচলিত ও সাধারণভাবে গৃহীত মত। সে হিসাবে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ২৭শে মার্চ যদি ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয়ের দিন বলে ধার্য করা হয়, তবে গিরিলিপির তাৎপর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, মীনহাজের বর্ণনায় আছে যে সেই চরম বিপর্যয়ের পরে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করলে অগণিত নিহত সৈনিকদের

পরিবার-পরিজনের ক্রন্দন ও গালিগালাজের সম্মুখীন হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ারের মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হত "সুলতান-ই-গাজী মু'ইজ্জ্-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম-এর কি এমন বিপদ ঘটেছে যে আমার ভাগ্য আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন এমন ঘটেছিল যে সে সময়েই সুলতান-ই-গাজী (তাব সারাহ) শাহাদৎ বরণ করেন।" (৪২ পৃঃ)।

মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু ঘটে ৬০২ হিজরী সনের ১লা শা'বান (১৫ই মার্চ, ১২০৬ খ্রীঃ)। মীনহাজের উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয় ও মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু প্রায় একই সময়ের ঘটনা, অর্থাৎ বিপর্যয়ের পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার যখন দেবকোটে ফিরে এসেছেন ঠিক তখন বা মাত্র দিন কয়েক আগে মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু ঘটেছিল এবং মোহাম্মদ বখতিয়ার তখন পর্যন্ত সে সংবাদ পাননি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত ২৭শে মার্চ যদি ইখতিয়ার-উদ-দীনের বিপর্যয়ের তারিখ হয়, তবে দেবকোটে পৌঁছতে বিপর্যস্ত তুর্কী অভিযানকারীর আরও দিন দশেক সময় লাগার কথা। অর্থাৎ এপ্রিল মাসের ৭ তারিখের দিকে ইখতিয়ার-উদ-দীন দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। মোহাম্মদ বখতিয়ারের খেদোক্তি আরও সপ্তাহকাল পরের ঘটনা বলে মীনহাজের বর্ণনা থেকে অতি সহজেই বোঝা যায়। এই একমাস সময়ের মধ্যে মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু সংবাদ তখনকার দিনেও দেবকোটে পৌঁছবার কথা। সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, মোহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু মোহাম্মদ বখতিয়ারের দেবকোট প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা বলে মীনহাজের উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এতে দেখা যায় যে ২৭শে মার্চ মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিপর্যয়ের তারিখ হলে গিরিলিপিটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ডক্টর ভট্টশালীর কাছে এ তাৎপর্য ধরা পড়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তিনি এ লিপির তারিখ ৭ই মার্চ ধার্য করে গেছেন। তিনি বলেন,

'The Mahamahupadhyaya has worked out the equivalent of the date as 27th March. 1206 A. D. The Saka dates are traditionally reckoned in completed years. So this date should mean when 1127 years had been completed and when it was the 13th Caitra of the next year. During this period the solar

year began on the 25th March, according to Julian Calender. So the last date of the month of Caitra, the 30th Caitra, corresponded to the 24th March. Thus 13th Caitra, the 1127 Saka, corresponded to the 7th March, 1206 A. D.

ডক্টর ভট্টশালী প্রদত্ত বিপর্যয়ের এ তারিখ (অর্থাৎ ২৭শে চৈত্র = ৭ই মার্চ) গ্রহণ করলে আলোচ্য গিরিলিপিটি অর্থবোধক হয়। ডক্টর ভট্টশালী ছিলেন মহাপণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও এ উক্তি সমভাবে প্রয়োজ্য। তাঁদের দুজনের মধ্যে কার উক্তি সঠিক তা আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে বলা দুষ্কর। [আমাদের বক্তব্য: ডঃ ভট্টশালীর কথাই যে ঠিক, তা Indian Ephemeries দেখলে বোঝা যাবে। এখন বাংলা মাস ইংরেজী মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়, তখন তা হত না। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের স্থলে গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এখন এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।] তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে ডক্টর ভট্টশালীর প্রচেষ্টায় লিপিটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এবং মহামহোপাধ্যায় এ তাৎপর্যের কথা বোধ হয় ভাবতেও পারেননি।

কানাই বড়শি গিরিলিপিটি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তবে ডক্টর ভট্টশালী কর্তৃক তাঁর প্রবন্ধে প্রদত্ত ছবিটি আমরা অতীব মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা লিপিতত্ত্ববিদ নই। তবে সাধারণ জ্ঞান (common sense) দিয়ে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে এ লিপিটিকে ত্রয়োদশ শতাব্দের বলে মেনে নিবার পিছনে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। লিপির 'শ', 'ক', 'তু', 'র', 'গ্যা', 'য়ো', 'ম', 'ধু', 'স', 'ত্র', 'দ', 'র্ক' ইত্যাদি ইত্যাদি অক্ষরগুলির অধিকাংশকে কেউ যদি উনবিংশ শতাব্দীর অক্ষর বলে মনে করে তবে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। আসামে ও বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 'র' অক্ষর পেটকাটা 'ব' (ব) রূপে লিখা হত। আর '১১২৭' সংখ্যাগুলিকে অতি সহজে বিংশ শতাব্দীর সংখ্যা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তদুপরি 'শাক ১১২৭' দেওয়ার পরেও এত ঘটা করে অশ্ব, ইশ, মধুমাস ইত্যাদির মাধ্যমে হেঁয়ালী সৃষ্টি করে আবারও একই সন দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়।

[আমাদের বক্তব্য : পুরোনো শিলালিপি, তাম্রশাসন, দলিল ও পুথিতে এই

জাতীয় তারিখের পুনরুক্তি বহু দেখা যায়। বাহুল্য বোধে দৃষ্টান্ত দিলাম না। আগেকার লোকদের সৌষম্যবোধ এখনকার মত ছিল না।]

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার নাকি এ লিপি সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। অনেক চেষ্টার পরও তাঁর প্রবন্ধটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। লিপিতত্ত্বের ব্যাপারে অজ্ঞতা বশতঃ ঢাকা যাদুঘরের তদানীন্তন সহকারী রক্ষক (Asstt Keeper) শ্রীরঞ্জিৎ কুমার শর্মা আমাদের অনুরোধে এ বিষয়ে তাঁর লিখিত অভিমত দিয়েছেন। সেই অভিমতের অংশ বিশেষ নিম্নে তুলে ধরা হল :

"আলোচ্য লিপিখানা তারিখযুক্ত। এতে যে কাল নিরূপক শব্দ ও সংখ্যা দেওয়া আছে তা থেকে যে সন আমরা পাই তা' হল ১১২৭ শকাব্দ বা ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দ। এই সময়কাল সম্পর্কে আমাদের কোন মতভেদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল উক্ত সময় কালকে আমরা লিপির উৎকীর্ণ সময় বলে গ্রহণ করতে পারি কিনা। যদি তা' করি তবে উত্তর ভারতীয় লিপির বিশেষ করে বাংলা লিপির ক্রম-বিকাশের লিপিতাত্ত্বিক বিচারে ভুল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আমরা লিপিতে দেওয়া ১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৫-৬ খ্রীস্টাব্দকে কানাই বড়শী শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল বলে গ্রহণ করতে পারি না।

"খৃষ্টীয় ১১শ শতকের শেষভাগ ও ১২শ শতকের প্রথম ভাগের প্রায় সমস্ত লিপিমালার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি অক্ষরের মাত্রার বামদিকের প্রান্তভাগে একটি শূন্যগর্ভ ত্রিকোণের অবস্থিতি। পরবর্তী যুগে এই শূন্যগর্ভ ত্রিকোণ ছাড়াও হুকের মত অপর একটি চিহ্ন দেখা যায়। বিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ জর্জ ব্যুলার এই চিহ্নকে "নেপালী হুক" নামে আখ্যায়িত করেছেন। ১৫শ শতকের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেও এই হুক চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু কালক্রমে এই শূন্যগর্ভ ত্রিকোণ ও নেপালী হুকের ব্যবহার সকল বাংলা লিপিতে পরিত্যক্ত হয়। লক্ষণীয় যে আমাদের আলাচ্য কানাই বড়শী শিলালিপিতে উক্ত বৈশিষ্ট্য-দ্বয়ের একটিও নেই। যদি এই লিপির উৎকীর্ণকাল লিপিতে উল্লিখিত সময়ের অনুরূপ হত তবে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটি হলেও আমাদের দৃষ্টিগোচর হত।

"এ ছাড়া আলোচ্য শিলালিপিতে আমরা তালব্য শ-য়ের চারবার ব্যবহার পাই। কিন্তু তথাকথিত এই প্রাচীন লিপিতে ব্যবহৃত এই তালব্য-শ ও আধুনিক কালের তালব্য-শয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

প্রাচীন তালব্য-শয়ের মোটামুটি দু' প্রকার রূপ দেখা যায়। একটি হ'ল তালব্য শ-য়ের বামে নীচের দিকে "লুপ" বা ফাঁসের মত ছিদ্রযুক্ত। আর অপরটি ছিল ডানদিকে দীর্ঘায়ত লম্ববিশিষ্ট ও বামদিকের বক্রস্থানে একটি ত্রিকোণাকার খাঁজ-যুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের এই তালব্য-শ বেশ কিছুকাল অব্যাবহৃত থাকার পর খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতকে আবার দেখা যায় এবং পরবর্তী প্রায় এক শতক পর্যন্ত এর বহুল ব্যবহার দেখা হয়। যদি আমাদের আলোচ্য শিলালিপি প্রকৃতই ১১২৭ শকে অর্থাৎ ১২০৫-৬ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হত তবে লিপিতে ব্যবহৃত চারটি তালব্য শ-য়ের অন্ততঃ একটিতেও আমরা উক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতাম।

"কানাই বড়শী শিলালিপিতে 'ক' অক্ষরটিও চারবার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু লিপিতে ব্যবহৃত 'ক' এবং আধুনিক 'ক' য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য লিপির ক'য়ের আধুনিক কালের 'ক'-য়ের মত ডানদিকে একটি হুক চিহ্ন আছে। অথচ ১১শ—১৩শ শতকের সকল 'ক' অত্যন্ত ছুঁচোল কোণবিশিষ্ট এবং তাদের ডান অঙ্গ সর্বদাই নিম্নমুখী লম্বাটে ধরনের। কিন্তু তথাকথিত প্রাচীন শিলালিপির কোন 'ক'-য়ে আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখি না।

"বর্তমান লিপির অপর একটি অক্ষর হ'ল 'ধ' যা সর্বাংশে আধুনিক। সকল আধুনিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই 'ধ'-য়ের তিনদিক বন্ধ ও বামে উপরিভাগে একটি বাঁকানো শিং-এর মত চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু কানাই বড়শী শিলালিপি অপেক্ষা প্রাচীন বা তার সমকালীন বা পরবর্তী কয়েক শতকের 'ধ'-য়ের উপরি-ভাগ একটু ফাঁকযুক্ত এবং সেখানে কোন রকম শিং-য়ের মত চিহ্ন নেই। যদি কখনো শিং জাতীয় কোন চিহ্ন থাকেও বা তা কখনো বাঁকা হয় না, বরং তা' সোজা এবং বাংলা রেফ-চিহ্নের মত। বাংলা রেফ-চিহ্ন সর্বদাই ডানদিকে হেলে থাকে আর প্রাচীন 'ধ'-য়ের এই শিং চিহ্ন থাকে বামদিকে হেলে। সুতরাং বাংলা-'ধ'-য়ের ক্রমবিকাশের এই বিচারে বলা যায় যে কানাই বড়শী লিপির বাঁকানো শিংযুক্ত 'ধ' সাম্প্রতিক কালের।

"অনুরূপভাবে এই লিপির কোণবিশিষ্ট 'দ'-য়ের আকারও আধুনিক। ১১শ—১৩শ' শতকের সকল লিপিতে ব্যবহৃত যে 'দ' আমরা পাই তার বামদিকে পশ্চাৎভাগ সর্বদাই বাঁকানো ধরনের। অথচ আলোচ্যলিপির 'দ'-য়ে এই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

"এ ছাড়া আলোচ্য লিপির 'তুরস্ক' এবং 'কামরূপং' শব্দদ্বয়ের 'ক' এবং 'রূ'-তে যে হ্রস্ব উকার ও দীর্ঘ উকার ব্যবহার করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আধুনিক। ১৯শ শতকের পূর্বের কোন লিপিতে এই ধরনের হ্রস্বউকারই ও দীর্ঘ উকারের ব্যবহার দেখা যায় না।

"সর্বোপরি কানাই বড়শী লিপির 'ক্ষয়মায়ষু' শব্দের 'ক্ষ' অক্ষরটি লিপি তাত্ত্বিক বিচারে বিবেচনা করলে এই লিপির সমস্ত প্রাচীন চরিত্র অসার ও ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। কেননা, ১০ম শতক থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত সময়ের কোন লিপিতেই আমরা এই 'ক্ষ' অক্ষরটির এই আধুনিক রূপ পাই না। লিপিতে ব্যবহৃত 'ক্ষ'-য়ের অনুরূপ 'ক্ষ' আমরা দেখি ১৯শ শতকের প্রথমদিকের কোন লিপিতে। সুতরাং এই বিচারে আলোচ্য লিপিকে কোন মতেই ১২০৫-৬ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ লিপি বলে মনে করা যায় না।

"পরিশেষে লিপিতে যে সকল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরও লিপি-তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের আলোচনা করা প্রয়োজন। ১ ও ২ সংখ্যকদ্বয় ১২শ/১৩শ শতকেই অনেকটা আধুনিক রূপ ধারণ করে। কিন্তু যে আকারে এই দুই সংখ্যাকে আমরা কানাই বড়শী লিপিতে পাই তা অতি আধুনিক। কেবলমাত্র ১৬শ শতকের পরেই ১ ও ২ সংখ্যাদ্বয়কে আমরা লিপিতে ব্যবহৃত আকারে পাই। তদুপরি ৭ সংখ্যাটিকে যে রূপে আমরা আলোচ্য লিপিতে দেখি তা'ও অতি আধুনিক রূপ। প্রকৃতপক্ষে ১৫শ শতক থেকেই ৭ সংখ্যাটি তার বর্তমান রূপ নিয়েছে। ৭ সংখ্যাটির প্রাচীন রূপ ছিল লাঠির মত বামদিকে ঈষৎ বাঁকানো এবং এই বাঁকানো অংশের নীচের দিকে খোলা। কিন্তু কানাই বড়শী লিপির ৭ সংখ্যাটি আধুনিক ৭ এর মত বাম দিকে বেঁকে ডানদিকের লম্বের সাথে মিশে গেছে।

"সুতরাং লিপিতাত্ত্বিক বিচারের মানদণ্ডে বহুল আলোচিত এই কানাই বড়শী শিলালিপিকে কোন মতেই আমরা ১১২৭ শক বা ১২০৫-৬-খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছে বলে মেনে নিতে পারি না। বরং একথা মনে করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে প্রাচীন বাংলালিপি সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আলোচ্য লিপিখানি অনেক পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ১৯শ শতকের শেষভাগে উৎকীর্ণ করেন। অন্ততঃ লিপির অক্ষর গঠন প্রণালী সেই সাক্ষ্যই দেয়। [আমাদের বক্তব্য : যাকারিয়া সাহেব ও রঞ্জিতবাবু যে সমস্ত

অক্ষর সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তাদের অধিকাংশই যে প্রাচীন অক্ষর— তা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বাংলা দেশের ইতিহাস' ১ম খণ্ডের শেষে প্রদত্ত 'বাংলা লিপির উৎপত্তি ক্রমবিকাশ' শীর্ষক চার্টে ১২শ শতাব্দীর অক্ষরের সঙ্গে মেলালেই বোঝা যাবে। বাকী অক্ষরগুলির জন্য আমরা অন্যান্য প্রাচীন লিপিবিশারদদের অভিমত আহ্বান করছি। কানাই বড়শী শিলালিপির 'ক্ষ' উনবিংশ শতাব্দীর আগে কোথাও মেলে না—রঞ্জিতবাবুর এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু পুথি আমরা দেখেছি, যাদের মধ্যে এখনকার অনুরূপ 'ক্ষ' পাওয়া যায়। কানাই-বড়শী শিলালিপি ১৯শ শতকের শেষভাগে উৎকীর্ণ হয়েছিল—এ মত অবিশ্বাস্য। এত আধুনিককালে একজন পণ্ডিত লোক হাতুড়ি ও ছেনি প্রভৃতি নিয়ে পাহাড়ের উপর বসে জাল শিলালিপি খোদাই করলেন—আর কেউ তা দেখল না? শিলালিপি জাল করা এত সহজ নয়। তা ছাড়া ১৯ শতকের শেষ দিকে যাঁরা বখতিয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন—তাঁরা কেউই বলেন নি যে বখতিয়ার ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ থেকে সসৈন্যে বিতাড়িত হয়েছিলেন। যিনি এই শিলালিপি আবিষ্কার করেন, সেই পদ্মনাথ ভট্টাচার্যও এ নিয়ে বিশেষ হৈ চৈ করেননি। সুতরাং আধুনিককালে কেউ এটি জাল করেছে বলা যায় না।] এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে আমাদের পূর্বসূরী পণ্ডিতেরা বর্তমান লিপিখানির অক্ষর বিচার না করেই যেন কিছুটা ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে লিপিখানিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।" [আমাদের বক্তব্য : সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করছি যে এই শিলালিপি ১১২৭ শকাব্দে উৎকীর্ণ না হয়ে তার দু' তিনশো বছর বাদেও উৎকীর্ণ হতে পারে; অর্থাৎ ১১২৭ শকের ১৩ই চৈত্রে কামরূপ থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের কথা ঐ সময়ে কিংবদন্তীর আকারে প্রচলিত ছিল এবং তা'ই সম্ভবত কোন রাজার উদ্যোগে খোদাই করা হয়েছিল। কিন্তু এই তারিখ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে। তাই এটি যদি কিংবদন্তীমূলক হয় তা হলে বলতে হবে সত্য কিংবদন্তী এর ভিত্তি।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। বখতিয়ারের নবাবিষ্কৃত "গৌড়বিজয়ে" মুদ্রার তারিখ ১২০৫ খ্রীঃর মে। এদিকে মুহম্মদ ঘোরী ১২০৬ খ্রীঃর অক্টোবরে পরলোকগমন করেন। সুতরাং কামরূপ থেকে বখতিয়ারের বাহিনীর বিতাড়ন এই দুই

তারিখের মাঝে কোন সময়ে পড়বে। আলোচ্য শিলালিপিতে পাওয়া তারিখটিও ঠিক এই সময়েই পড়ছে। সুতরাং আলোচ্য শিলালিপিটি উল্লিখিত ঘটনার সমসাময়িক হোক্ বা না হোক্, তাতে প্রদত্ত তারিখ—নিরপেক্ষ দুটি সূত্রে পাওয়া তারিখের (তার মধ্যে "গৌড়বিজয়ে" মুদ্রার সূত্রটির কথা তখন কেউ জানত না) দ্বারা সমর্থিত (corroborated) হচ্ছে। কাজেই এই তারিখকে সঠিক বলেই গ্রহণ করা যায়।]

কামরূপের সীমা রেখা ও রাজনৈতিক অবস্থা

ডক্টর ভট্টশালীর অভিমতের অসারতা প্রমাণের জন্য তদানীন্তন কামরূপ রাজ্যের সীমারেখা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। আসামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কামরূপ রাজ্যের পূর্ব সীমানা কোন কালেই স্থায়ী ছিল না। কিন্তু এ রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখা সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে সুলতানী আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত করতোয়া নদী যে এ রাজ্যের পশ্চিম সীমানা নির্দেশ করত সেকথা আগেই বলা হয়েছে। গুপ্তরা কামরূপ রাজ্য অধিকার করেছিলেন। তারপর পালেরা এবং সর্বশেষে সেনেরা এ রাজ্য অধিকার করে-ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকৃত হলেও কামরূপ রাজ্য সীমা রেখার ব্যাপারে তার স্বাতন্ত্র্যকে হারায়নি। অর্থাৎ অধিকৃত হবার পরেও তা পার্শ্ববর্তী পুণ্ড্র বা গৌড় রাজ্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়নি। গুপ্ত-পাল-সেন এমনকি প্রথম দিকে তুর্কী অধিকারের সময় পর্যন্ত সীমা রেখার ব্যাপারে কামরূপ তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন যখন 'নওদীহ' থেকে বিক্রমপুরে পালিয়ে যান তখন কামরূপ রাজ্য খুব সম্ভব তাঁর অধিকারের বাইরে চলে যায়। কামরূপের অধিপতি তখন কে ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে তাঁর আচরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনি একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারতে ও তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তবর্তী সমগ্র অঞ্চলে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্রুতগতি দেখে তিনি নিজ রাজ্যকে তুর্কী আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে উদগ্রীব ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্যই তিনি খুব সম্ভব লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরিত্যক্ত কামরূপের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত

গৌড়-লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার হাত প্রসারিত করেননি। তখনকার পরিস্থিতিতে এটা করা যে খুব বুদ্ধিমানের কাজ হত না, তা তিনি ভালভাবেই বুঝে নিয়েছিলেন।

তাঁর অধীনস্থ কামরূপ রাজ্য যে করতোয়া নদীর বাম তীরবর্তী ভূভাগে ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সে হিসাবে করতোয়ার ডান তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পঞ্চগড়, বোদা ও তেঁতুলিয়া থানার অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা, কোচবিহার রাজ্য, রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ, পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, সৈয়দপুর ও নীলফামারী থানা সমূহের কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র রংপুর জেলা, আসামের ধুবড়ী জেলা, কামরূপ জেলা ও এ জেলার পূর্বদিকে সংলগ্ন বিরাট অঞ্চল নিয়ে খুব সম্ভব তদানীন্তন কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল। দক্ষিণদিকে এ রাজ্যের বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত ছিল তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও উত্তর ময়মনসিংহ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলাত্রয়ের কিয়দংশ এ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয়।

গঙ্গা (পদ্মা), করতোয়া ও মহানন্দা নদীত্রয় বেষ্টিত ভূভাগ নিয়ে খুব সম্ভব নবগঠিত তুর্কী লখনৌতি রাজ্যের উত্তরভাগ গঠিত ছিল। বর্তমান পঞ্চগড়-আটোয়ারী পাকা সড়কের কাছাকাছি স্থানে অর্থাৎ করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান বরাবর ছিল খুব সম্ভব লখনৌতি রাজ্যের উত্তর সীমারেখা। পূর্বদিকে দেবীগঞ্জের পশ্চিম দিকে এ সীমারেখা প্রসারিত ছিল বলে ধরা যায়। দেবীগঞ্জের নিকট থেকে মহাস্থান পর্যন্ত করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল লখনৌতি রাজ্যের অধীন ও পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিল বলে ধরা যায়।

[আমাদের বক্তব্য : এই আনুমানিক সীমা-নির্ধারণ আমাদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য নয়। কামরূপের রাজা খাস কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, এর বেশি কিছু বলার মত উপকরণ আমাদের কাছে নেই।]

কামরূপ ও লখনৌতি রাজ্যের এই সম্ভাব্য সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর ভট্টশালীর অভিমতকে যাচাই করা যেতে পারে। তাঁর মতানুসারে শিলহাকোকেই যদি ঘটনাস্থল বলে ধরা হয়, তবে বিপর্যয়ের পরে নিজ রাজ্যের সীমানায় পৌছার জন্য ইখতিয়ার-উদ-দীনকে প্রায় ২৫০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। তাতে তাঁকে মানস, বেকী, সনকোশ, তোরশা, জলঢাকা ও করতোয়া নদীসহ

অসংখ্য ছোটবড় নদী, খালবিল ও জলাভূমি ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়েছিল। বিপর্যয়ের পরে এটা কি সম্ভবপর ছিল ?

মীনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে প্রস্তর সেতু অতিক্রম করার পর কামরূপ-রাজ দূত মারফত মোহাম্মদ বখতিয়ারকে সে বারের মত তিব্বত অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং পর বৎসর তিনি নিজের সৈন্যসহ মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে থেকে তিব্বত রাজ্যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কামরূপ রাজ, যে কোন কারণেই হোক, মোহাম্মদ বখতিয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। এটা যে নিছক ভাওতা এবং তুর্কীদের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করার কৌশল ছিল, তা তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। তুর্কী বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ক্ষমতা সে সময়ে খুব সম্ভব তাঁর ছিল না। তাই কৌশলে তিনি তাদেরকে এবারের মত কোন রকমে ফেরত পাঠিয়ে কিছু সময় লাভ করে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় ছিলেন বলে মনে হয়।

মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর কথা না শুনে যখন তিব্বতের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন থেকেই কামরূপ রাজ তুর্কীদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তথাকথিত তিব্বত রাজ্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর কোন যোগ-সাজশ ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশী

যদি কোন যোগসাজশ নাও থেকে থাকে তবে কামরূপ রাজ জানতেন যে তুর্কীদেরকে এপথেই ফিরে আসতে হবে এবং সেই অনুসারে তিনি পথিমধ্যে এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে প্রত্যাবর্তনের সময় তুর্কীরা নিজেদের জন্য এক মুষ্টি খাদ্য এবং অশ্বগুলির জন্য একখণ্ড তৃণও পায়নি। ফলে তুর্কীরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

এ সময়ে কামরূপ বাহিনী তুর্কীদেরকে আক্রমণ, বিশেষ করে গরিলা আক্রমণ করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে মীনহাজ নীরব। [আমাদের বক্তব্য : 'গরিলা আক্রমণ' ভুল, 'গেরিলা আক্রমণ' হবে। গরিলা (gorilla) এক ধরনের বন্য পশু, তার সঙ্গে গেরিলা (guerilla) যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই।] আক্রমণ যে হয়েছিল তা ঘটনা প্রবাহই প্রমাণ করে এবং মোহাম্মদ বখতিয়ারের বিরাট

বাহিনীর (দশ হাজার অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈন্য) সব সৈন্য, সামান্য কয়েক-জন (শতাধিক) ছাড়া, কামরূপের মাটিতেই যে বিনষ্ট হয়েছিল, মীনহাজের বর্ণনাই তা প্রমাণ করে।

অতএব কামরূপ রাজ যে মুসলিম বাহিনীর ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তা জলের মত পরিষ্কার। তা-ই যদি হয় তবে কামরূপ রাজ মোহাম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী দলকে (সংখ্যায় একশ কি কম বেশী) শিলহাকো থেকে লখনৌতি রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল পথ বিনা বাধায় অতিক্রম করতে দিবেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা! সে সময়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার যুদ্ধ ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সমুদয় সৈন্য হারিয়ে মনোবল বলে কোন পদার্থ তাঁর মধ্যে নেই এবং তাঁর সঙ্গে এমন সৈন্যবল নেই যে তিনি কামরূপ রাজের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেও নিজ রাজ্যে ফিরে আসার জন্য এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারেন। তদুপরি সেই সুদীর্ঘ পথে অসংখ্য বড় বড় নদী, খাল বিল, জলাভূমি ইত্যাদি অতিক্রম করার প্রশ্ন তো ছিলই। সেক্ষেত্রে কামরূপ রাজের পক্ষে ইখতিয়ার-উদ-দীন ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের সকলকে নিহত বা বন্দী করার পিছনে কোন অসুবিধাই ছিল না। তিনি কিছুই করেননি। যে-কামরূপ রাজ সুপরিকল্পিতভাবে সমুদয় তুর্কী বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন, তিনি তাদের নেতা ইখতিয়ার-উদ-দীন ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গীকে হাতের মুঠার মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিবেন এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে দেবকোটে এসে পৌছবেন তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই বটে। এটিকে একটি অবাস্তব গল্প ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না এবং একজন শিশুও এ গল্প বিশ্বাস করবে কিনা সন্দেহ।

প্রকৃত ঘটনা ছিল খুব সম্ভব সম্পূর্ণ অন্যরকম। নদী অতিক্রম করার পর কামরূপ রাজ যে ইখতিয়ার-উদ-দীন ও তাঁর সঙ্গীদের আক্রমণ করতে চাননি অথবা ইচ্ছা করেই তাঁর পিছনে অগ্রসর হননি, তা নয়। আক্রমণ করার সুযোগ বা শক্তি খুব সম্ভব তাঁর ছিল না। কারণ নদী অতিক্রম করে ইখতিয়ার-উদ-দীন খুব সম্ভব তাঁর নিজ রাজ্যের সীমানায় এসে পৌছেছিলেন এবং সেই নদীটি ছিল উভয় রাজ্যের সীমা নির্দেশক করতোয়া নদী। খুব সম্ভব শুধু একারণেই ইচ্ছা থাকলেও কামরূপাধিপতি ইখতিয়ার-উদ-দীনের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেননি অথবা করে থাকলেও খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি। [আমাদের বক্তব্য : এই বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। সেই 'জোর যার মুল্লুক তার'-এর

যুগে রাজ্যের সীমারেখা এমন কিছু পবিত্র ব্যাপার ছিল না, যা পার হয়ে বখতিয়ারকে আক্রমণ করতে কামরূপরাজ দ্বিধা বোধ করতে পারেন। সীমানার উপরে বখতিয়ারের কোন দুর্গও ছিল না। তা ছাড়া বখতিয়ারের রাজ্যই বা কী, আর সীমানাই বা কী? তিনি যা দখল করেন, তা'ই তাঁর রাজ্য; আর যতখানি অগ্রসর হন, তাই তাঁর সীমানা।]

গৌহাটির নিকটবর্তী শিলহাকো যদি প্রকৃত ঘটনাস্থল হত, তবে ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে জীবিত কি মৃত কোন অবস্থাতেই দেবকোটে ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল না। [আমাদের বক্তব্য : কেন সম্ভবপর ছিল না? নদীর ওপারে কামরূপরাজের কোন সৈন্যসামন্ত ছিল না—কিন্তু বখতিয়ারকে সাহায্য করার জন্য আলী মেচের আত্মীয়স্বজনরা ছিল।] অন্যান্য কারণ তর্কের খাতিরে বাদ দিলেও শুধু একারণেই ঘটনাস্থলকে শিলহাকোতে টেনে নেওয়া যেতে পারে না। প্রকৃত ঘটনাস্থল ছিল অন্যত্র এবং সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে। [আমাদের বক্তব্য : এই মত মানা যায় না। মুগীসুদ্দীন ইউজবক শাহের কামরূপ-অভিযান সম্বন্ধে মীনহাজ যা লিখেছেন, তার থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে "বাঁকমতী" বা "বেগমতী" নদী কামরূপ নগরের খুব কাছে অবস্থিত ছিল (এই বই, পৃঃ ৬১ ও ২০৮ দ্রঃ)। অতএব ঐ নদী ব্রহ্মপুত্র—করতোয়া নয়, এবং বিপর্যয়ের ঘটনাস্থল শিলহাকোই।

এর পর যাকারিয়া সাহেব র‍্যাভার্টির মত খণ্ডন করেছেন। নীচে তাঁর আলোচনা উদ্ধৃত হ'ল।]

রেভার্টির অভিমত

মেজর রেভার্টি আলোচ্য গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা কালে পাদটিকায় (৫৬২-৩ পৃঃ) বলেছেন,

"...it is evident that Muhammad, son of Bakhtyar—and his forces—marched from Diw-kot, or Dib-kot, in Dinajpur district, the most important post on the northern frontier of his territory, keeping the territory of Rajah of Kamrud on his right hand, and proceeding along the bank of the river Tistah, through Sikhim the tracts inhabited by the Kunch, Mej, and

Tiharu, to Burdhan-kot. They were not in the territory of the Rajah of Kamrud, as the message shows.

রেভার্টির মতে দেবকোট থেকে যাত্রা করে ইখতিয়ার-উদ-দীন তিস্তা নদীর পশ্চিম তীর বেয়ে উর্ধ্বমুখে অগ্রসর হয়ে কামরূপ রাজ্যকে ডানদিকে রেখে কোঁচ মেচ ও তিহারো জাতির বসবাস স্থল সিকিমের ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে কামরূপ রাজ্য ছিল তিস্তা নদীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলে এবং কামরূপ রাজ্যে তিনি যাননি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন (৫৬৩ পৃঃ),

"In my humble opinion, therefore, this great river here referred to is no other than the Tistah, which contains a vast sheet of water, and in Sikhim, has a bed of some 800 yards in breadth containing, at all seasons, a good deal of water, with swift stream broken by stones and rapids. The territory of a the Raes of Kamrud, in ancient times, extended as far east as this ; and the fact of the Rae of Kamrud having promised Muhammad-i Bakhtyar to precede the Musalman forces the following year, shows that the country indicated was to the north……The Sanpu, as the crow flies, is not more than 160 or 170 miles from Dinajpur, and it may have been reached ; but it is rather doubtful perhaps whether cavalry could reach that river from the frontier of Bengal in ten days."

রেভার্টির মতে এ নদী ছিল তিস্তা। এটি ছিল এক বিরাট নদী এবং সিকিম অঞ্চলে এর প্রশস্ততা ছিল প্রায় ৮০০ গজ। সেখানে এ নদী ছিল খরস্রোতা এবং স্থানে স্থানে পাথরের বাধা অতিক্রম করে এটি প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমানা এ নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তিস্তা নদীর কথা উল্লেখের সময়ে মেজর রেভার্টি খুব সম্ভব রেনেলের মানচিত্রকে সামনে রেখেই এ উক্তি করেছিলেন। (অবশ্য রেনেলের মানচিত্রের কোন উল্লেখ তিনি করেননি।) ইতিপূর্বে তিস্তা-আত্রাই সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে রেনেলের সময়ে তিস্তা-আত্রাই ছিল উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী। কিন্তু প্রাচীনকালে করতোয়ার

তুলনায় তিস্তা-আত্রাই যে মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং করতোয়াই যে সে অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জলধারা ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে এবং এই করতোয়াই যে কামরূপ ও গৌড় রাজ্যদ্বয়ের সীমারেখা নির্দেশ করত, তাও বলা হয়েছে।

মেজর রেভার্টি ইখতিয়ার-উদ-দীনের যাত্রা ও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। [আমাদের বক্তব্য : গ্রহণযোগ্য নয়।] কিন্তু বর্ধনকোট, প্রস্তর সেতু ও তুর্কীবাহিনীর যাত্রাপথ সম্বন্ধে তাঁর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। এ গুলি সম্পর্কে তিনি যে সব উক্তি করেছেন সেগুলিকে বিভ্রান্তিকর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

তিস্তা-আত্রাই নদীর যে-ধারার কথা রেভার্টি উল্লেখ করেছেন এবং যে-ধারাটি রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, দেবীগঞ্জের নিকট থেকে সে ধারার দক্ষিণের অংশ অনেক ক্ষীণকায়া হলেও মোটামুটিভাবে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময়েও ছিল বলে ধারণা করা যায়। সে ধারাটি আরও ক্ষীণকায়া হয়ে বর্তমানকালেও টিকে আছে। রেভার্টির মত মেনে নিয়ে এধারাকে যদি তদানীন্তন কামরূপ ও গৌড় রাজ্যের সীমারেখা বলে ধরা যায়, তবে পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান), ঘোড়াঘাট, পঞ্চনগরী, পাথরঘাটা (মাহীগঞ্জ), চরকাই-বিরামপুর, সীতাকোট-নওয়াবগঞ্জ, লোহানীপাড়া, পার্বতীপুর, বেলাই চণ্ডীপুর প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ইখতিয়ার-উদ-দীনের রাজ্য সীমার বাইরে এবং এই সমুদয় অঞ্চল ১২৫৫ খ্রীস্টাব্দে তুঘরীল ইউজবকের সময় পর্যন্ত কামরূপের অধীনে ছিল বলে ধরে নিতে হয়। এটিকে আদৌ সম্ভাব্য ঘটনা বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। ইখতিয়ার-উদ-দীনের রাজ্যসীমা যে অন্তত পক্ষে মহাস্থান ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিশেষ কোন মতভেদ নেই। তা ছাড়া তিস্তা-আত্রাই নদী কোনকালেই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমানা নির্দেশক বলে জানা যায় না।

সম্ভাবনার দিক থেকেও এ সীমারেখা'কে মেনে নেওয়া যায় না। দেবকোট থেকে মাত্র ১৫ মাইল পূর্বে ছিল আত্রাই নদীর অবস্থান। তা হলে এর পরেই কামরূপ রাজ্যের শুরু বলে ধরে নিতে হয়। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী দেবকোটের এত সন্নিকটে অবস্থিত কামরূপ রাজ্য অধিকার না করে শত্রুকে ঘরের কাছে রেখে ইখতিয়ার-উদ-দীন সুদূর তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হবেন, এত বড় নির্বোধ তিনি ছিলেন একথা কল্পনাও করা যায় না।

[আমাদের বক্তব্য : তিনি খানিকটা নির্বোধ ছিলেন বলেই আমরা মনে করি। সম্ভবত তিব্বতের ধনদৌলৎ সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা অনেক কাহিনী শুনে এই দেশ জয়ের জন্য তিনি অভিযানে বার হন—অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে।]

তর্কের খাতিরে রেভার্টির মত গ্রহণ করলে ধরে নিতে হয় যে ইখতিয়ার-উদ-দীন দেবকোট থেকে নির্গত হয়ে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব তীর বেয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে কান্তনগরে এসে উপস্থিত হন। আত্রাই নদীর একটি বিরাট শাখা গর্ভেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রাচীন কান্তনগর পর্যন্ত প্রাচীন কোটিবর্ষ (দেবকোট) থেকে একটি সড়ক থাকার কথা। রেভার্টির মত মেনে নিলে এ স্থানকে বর্ধনকোট বলে চিহ্নিত করতে হয় যদিও রেভার্টি এ স্থান বা বর্ধনকোটের সম্ভাব্য অবস্থানের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। এ স্থান ছাড়া, এর উত্তরে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু কান্তনগরের উত্তরে দেবীগঞ্জ-পঞ্চগড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য নদী-নালা ও নিম্নভূমির আধিক্যহেতু কান্তনগর থেকে উত্তরদিকে আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে কোন সুগম পথ ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, থাকার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, এই অঞ্চল ছিল নিম্নভূমির আধিক্যহেতু দুর্গম। রেনেলের মানচিত্রে কান্তনগর থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যে সড়ক দেখান হয়েছে, তা অনেক পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়েছে, সোজা উত্তরদিকে কোন পথের চিহ্ন নেই। সে পথ ধরে অভিযানে গেলে মোহাম্মদ বখতিয়ারের পক্ষে লখনৌতি থেকে যাত্রা করা অনেক সুবিধাজনক ছিল। সে পথ ধরে গেলে দেবকোট থেকে যাত্রা করার কোন মানেই ছিল না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে তুর্কীরা কান্তনগর থেকে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়েছিল, তবে ধরে নিতে হয় যে, তারা বোদা-পঞ্চগড় এলাকায় করতোয়া নদীর সম্মুখীন হয়েছিল। সেখানে করতোয়া অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পূর্বে করতোয়া নদী সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হবে যে পঞ্চগড় অঞ্চলেই করতোয়ার প্রশস্ততা ছিল খুবই বেশী। ক্ষুদ্র প্রস্তর সেতুটি সেখানে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। অভিযানে অগ্রসর হবার কালে এস্থানে কোন রকমে নদী অতিক্রম করা সম্ভব হলেও প্রত্যাবর্তনের সময় এ নদী অতিক্রম করা মোটেই সম্ভব ছিল না।

আরও উত্তরদিকে যেতে হলে মোহাম্মদ বখতিয়ারকে করতোয়া নদী ডাইনে রেখে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়ে পুনর্ভবা টাঙ্গন প্রভৃতি নদী পার হয়ে উত্তর মুখে ভজনপুর অতিক্রম করে করতোয়াকে ডান পাশে রেখে সিকিম রাজ্যে তিস্তা নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। সেখানে তিস্তা নদীর উপরে, রেভার্টির মত মেনে নিলে, প্রস্তর সেতুটি থাকার কথা। সেখান থেকে আরও ১৫ দিনের পথ অতিক্রম করে করবত্তনের কাছাকাছি কোন স্থানে মোহাম্মদ বখতিয়ার পৌঁছেছিলেন বলে ধরে নিতে হয়।

দেবকোট থেকে আকাশ পথে এই সম্ভাব্য প্রস্তর সেতুর স্থানের দূরত্ব ১৫৫ মাইলেরও বেশী এবং রাস্তা ধরে গেলে সে দূরত্ব ২৫৫ মাইলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। কান্তনগর থেকে আকাশপথে এর দূরত্ব হবে প্রায় ১২৫ মাইলের মত এবং রাস্তা ধরে গেলে হবে প্রায় ২০০ মাইল। অসংখ্য নদীনালা পরিপূর্ণ এই সমগ্র অঞ্চলে যে কোন ভাল রাস্তা-ঘাট ছিল না সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১০ দিনে তুর্কীদের পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না।

মোহাম্মদ বখতিযার এপথে গিয়ে থাকলে প্রত্যাবর্তনের সময় সুদূর সিকিমে অবস্থিত প্রস্তর সেতুর নিকট থেকে তাঁর পক্ষে প্রাণ নিয়ে দেবকোটে ফিরে আসা সম্ভবপর ছিল না। মোহাম্মদ বখতিয়ারের রাজ্য সীমা উত্তরে পঞ্চগড়ের দক্ষিণে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ধরা যেতে পারে। পঞ্চগড়ের উত্তরে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলাতে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল তা কল্পনাও করা যায় না। পঞ্চগড় থেকে মেজর রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রস্তর সেতুর দূরত্ব হবে কম পক্ষে ৭০ থেকে ৮০ মাইল। নদীনালার বাঁক ঘুরে আসতে গেলে সে দূরত্ব ১০০ মাইলেরও বেশী হবে। সিকিমে অবস্থিত প্রস্তর সেতুর নিকট এত বড় বিপর্যয়ের পর ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে বিরূপ কামরূপ রাজ্যের ভিতর দিয়ে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নির্বিঘ্নে দেবকোটে ফিরে আসাকে অবিশ্বাস্য ঘটনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

মেজর রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থানেই যদি প্রস্তর সেতুটি ছিল, তবে ইখতিয়ার-উদ-দীনের পক্ষে দেবকোট থেকে যাত্রা এবং সেখানেই প্রত্যাবর্তন করার প্রশ্নই উঠে না। তিনি অযথা বাঁকা পথ ধরে এবং দুর্গম স্থান অতিক্রম করতে যাবেন এমন ধারণা অবান্তর বলে মনে হয়। সেখানে যেতে হলে লখনৌতি

থেকে যাত্রা করে সোজা উত্তরদিকে তিনি যেতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে বিপর্যয়ের পরে তাঁর লখনৌতিতেই ফিরে আসার কথা। তা না করে তিনি দেবকোটে ফিরে এসেছিলেন। এতে ধরে নিতে হয় যে প্রস্তর-সেতুর নিকট থেকে দেবকোট ছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সহজগম্য স্থান।

এসব কারণে রেভার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রস্তর সেতুর অবস্থান স্থল মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য মোহাম্মদ বখতিয়ারের গন্তব্য স্থল সম্পর্কে তিনি যে-ইঙ্গিত দিয়েছেন তা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। [আমাদের বক্তব্য : র‍্যাভার্টির দেওয়া "ইঙ্গিত" মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।] কিন্তু তিস্তা নদীর পশ্চিম তীর বেয়ে উজান পথে সিকিমে গিয়ে সেখানে প্রস্তর সেতু অতিক্রম করার যে কাহিনী তিনি দিয়েছেন, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

[আমাদের বক্তব্য : অতঃপর যাকারিয়া সাহেব "মোহাম্মদ বখতিয়ারের সম্ভাব্য যাত্রাপথ", "বিপর্যয়" প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই। তবুও প্রয়োজন-বোধে তাঁর কতকগুলি উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

যেমন, যাকারিয়া সাহেব লিখেছেন, "যে কামরূপাধিপতি পথিমধ্যে অবস্থিত সমুদয় তৃণলতা পুড়িয়ে ও খাদ্য শস্য সরিয়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে তাদের বাহন অশ্বগুলি জবেহ করে প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য করেছিলেন এবং সেতু বিনষ্ট করে তাদের নদী অতিক্রমের পথ বন্ধ করে তাদেরকে দেব মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন, তিনি মুসলিম বাহিনীর মন্দিরে আশ্রয় নেওয়ার পর তাদের অসহায় অবস্থার কথা প্রথমবারের মত উপলব্ধি করেন, তা মীনহাজ কি করে উচ্চারণ করেন তা মানব বুদ্ধির অগম্য।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য : একে "মানব বুদ্ধির অগম্য" বলার হেতু নেই। বখতিয়ার দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অভিযানে যান। কামরূপরাজ তা জানতেন। পার্বত্য অঞ্চলে এক দিনের যুদ্ধে বখতিয়ারের "অত্যধিক" সৈন্য মারা পড়েছিল, এ কথা জানার সুযোগ কামরূপরাজের হয় নি। বখতিয়ারের নেতৃত্বে হতাবশিষ্ট যেসব সৈন্য এসে নদীর ধারে ও দেবমন্দিরে জড়ো হয়েছিল, কামরূপরাজ তাদের আক্রমণ করতে সাহস করেন নি—কারণ তুর্কী সৈন্যদের অসাধারণ ক্ষমতা ও দক্ষতার কথা (হয়ত অতিরঞ্জিত আকারে) তিনি শুনেছিলেন এবং অল্পসংখ্যক তুর্কী সৈন্যের হাতে লক্ষণসেন কীরকম

নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন, তা'ও তিনি জানতেন ; তার উপর তিনি ভাবছিলেন এদের পিছনে অন্য সৈন্যেরা রয়েছে, তারা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে (তারা যে মারা গেছে, তা কামরূপরাজ জানতেন না)। কিন্তু যখন তারা এল না এবং নদীর ধারে সমবেত সৈন্যেরা যেন-তেন-প্রকারেণ পালাবার চেষ্টা করছে বলে দেখা গেল, তখন তাদের "বিপর্যয় ও অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে কামরূদেব রায়ের প্রতীতি হল।"

তারপর যাকারিয়া সাহেব লিখেছেন, "মীনহাজের বর্ণনা থেকে ধারণা হয় যে নদীর জলে মুসলিম বাহিনীর যে অভিসম্ভাব্য পরিণতি ঘটবে সে সম্পর্কে আগে থেকেই কামরূপ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিল এবং অহিংস দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারা মুসলিম বাহিনীর পিছু পিছু আসছিল এবং তাদের অবস্থা দেখে শুধু মজা লুটছিল। বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাই বটে।"

আমাদের বক্তব্য : সেখানে কামরূপ-বাহিনী ছিল না, ছিল কামরূপের কিছু সাধারণ লোক। শত্রু যখন পালাচ্ছে এবং নদী পার হতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, তখন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মজা দেখাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বখতিয়ারের বাহিনীর সবাইকে মেরে ফেলা কামরূপরাজের বা তাঁর প্রজাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন তাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে ; সে উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে দেখে কামরূপের লোকরা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে ? বখতিয়ারের বাহিনীকে বধ করতে হলে তাদেরও জলে নামতে হত, তা তারা করে নি, তার কারণ তারা জানত জলে নামলে তারাও ডুবে মরবে। (গভীর জল সম্বন্ধে তারা নিশ্চয়ই "সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল" ছিল।) বিশেষত, শত্রুদের মারতে গেলে নিজেদের দু'এক জনেরও প্রাণ যাবার সম্ভাবনা ছিল। যে শত্রুদল পালাচ্ছে ও ডুবে মরতে চলেছে, তাদের বধ করতে গিয়ে দু'একজনের জীবনের ঝুঁকিই বা তারা নেবে কেন ?

এই সুদীর্ঘ পরিশিষ্ট শেষ করার আগে—যাকারিয়া সাহেবের আর একটি মত (যা ইতিপূর্বে যথাযথভাবে খণ্ডন করা হয় নি) খণ্ডন করা দরকার। যাকারিয়া সাহেব বলেন, যেহেতু লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে (১২০৩ খ্রী:) 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি'র 'বরেন্দ্রভূমি'র অন্তর্গত 'দাপুনিয়া পাটক' গ্রামের ভূমি তিনি দান করেন ধার্যগ্রামের জয়স্কন্ধাবার থেকে, অতএব "নওদীহ্"র কাছেই ধার্যগ্রাম অবস্থিত ছিল ('তবকাত-ই নাসিরী', পৃঃ ২৭১)। কিন্তু তা হওয়া কখনই

সম্ভব নয়, কারণ লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন (১২০৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরেও ধার্যগ্রাম থেকে তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন -ভুক্তির বাশ্চসা-আবৃত্তির অন্তর্গত বটুস্বী চতুরকের ভূমি দান করেছিলেন—(J R A S B, 1942, Letters, p. 1 ff. দ্রষ্টব্য), যখন "নওদীহ" তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ধার্যগ্রাম (ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে প্রকৃত নাম ধার্যাগ্রাম) কোথায়, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায়, এটি এমন একটি স্থান যা বখতিয়ারের নদীয়া-জয়ের আগে ও পরে লক্ষ্মণসেনের অধীন ছিল এবং ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন ধার্যগ্রামে গিয়ে ঐন্দ্রী মহাশান্তি যজ্ঞ ও ভূমিদান করে আবার নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন।]

(২) তুগরল খান ও বুগরা খানের মুদ্রা

তুগরল খান দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, এ তথ্য সকলেরই জানা। কিন্তু তিনি যে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন, এ কথা এত দিন কেউ জানতেন না। সম্প্রতি কলকাতার বিশিষ্ট মুদ্রা-সংগ্রাহক ও মুদ্রা-তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত পরিমল রায় তুগরলের একটি মুদ্রা আবিষ্কার করেছেন। মুদ্রাটি ৬৭৮ হিজরাতে উৎকীর্ণ (বলবন তখন বাংলা অভিমুখে যাত্রা সুরু করেছেন, কিন্তু তখনও সম্ভবত বাংলায় এসে পৌঁছোন নি)।

সেইরকম বলবনের মৃত্যুর (৬৮৭ হিঃ) পর বুগরা খান নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ নাম নিয়ে ঐ বছরে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন—একথা জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন। সম্প্রতি নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ ওরফে বুগরা খানেরও কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি শ্রীযুক্ত পরিমল রায়ের সংগ্রহে আছে।

পরিমলবাবুর সৌজন্যে আমরা এই দুই মুদ্রার বিবরণ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করলাম। মুদ্রা দু'টির বিবরণ প্রস্তুত করেছেন শ্রীযুক্ত স্মরণ দাস।

(ক) তুগরলের মুদ্রার বিবরণ :—

সামনের দিক :

সুলতান অল-আজম মুইজ্জুদ্‌দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর তুগরল অস্-সুলতান

পিছনের দিক :

অল-ইমাম অল-মুস্তাসিম আমীর অল-মু'মিনিন

টাকশাল : লখনৌতি

তারিখ : ৬৭৮ হিজরা

'তারিখ-ই মুবারক শাহী'তে য়াহিআ বিন শিরহিন্দী লিখেছেন যে তুগরল 'মুইজ্জুদ্দীন' নাম নিয়ে সুলতান হয়েছিলেন (এই বই, পৃঃ ৭৯ দ্রঃ)। তাঁর কথাই যে ঠিক, তা তুগরলের প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে প্রমাণ হচ্ছে। জিয়াউদ্দীন

বারনি লিখেছেন (এবং এই বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় আমরা তাঁর কথাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছিলাম) যে তুগরল 'মুগীসুদ্দীন' নাম নিয়েছিলেন ; এ কথা ভুল।

(খ) বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের মুদ্রার বিবরণ :—

সামনের দিক :

অস্‌-সুলতান অল-আজম নাসিরুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল-মুজাফফর মাহমুদ অস্‌-সুলতান বিন সুলতান

পিছনের দিক :

অল-ইমাম অল-মুস্তাসিম আমীর অল মু'মিনিন

টাকশাল : লখনৌতি

তারিখ : ৬৮৭ হিজরা

হিজরা ও খ্রীষ্টাব্দ

[খ্রীষ্টাব্দের যে মাসের যে দিনে হিজরা আরম্ভ, তার উল্লেখ করা হয়েছে]

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দ
৬০১	১২০৪ আগস্ট ২৯	৬২৫	১২২৭ ডিসেম্বর ১২
৬০২	১২০৫ আগস্ট ১৮	৬২৬	১২২৮ নভেম্বর ৩০
৬০৩	১২০৬ আগস্ট ৮	৬২৭	১২২৯ নভেম্বর ২০
৬০৪	১২০৭ জুলাই ২৮	৬২৮	১২৩০ নভেম্বর ৯
৬০৫	১২০৮ জুলাই ১৬	৬২৯	১২৩১ অক্টোবর ২৯
৬০৬	১২০৯ জুলাই ৬	৬৩০	১২৩২ অক্টোবর ১৮
৬০৭	১২১০ জুন ২৫	৬৩১	১২৩৩ অক্টোবর ৭
৬০৮	১২১১ জুন ১৫	৬৩২	১২৩৪ সেপ্টেম্বর ২৬
৬০৯	১২১২ জুন ৩	৬৩৩	১২৩৫ সেপ্টেম্বর ১৬
৬১০	১২১৩ মে ২৩	৬৩৪	১২৩৬ সেপ্টেম্বর ৪
৬১১	১২১৪ মে ১৩	৬৩৫	১২৩৭ আগস্ট ২৪
৬১২	১২১৫ মে ২	৬৩৬	১২৩৮ আগস্ট ১৪
৬১৩	১২১৬ এপ্রিল ২০	৬৩৭	১২৩৯ আগস্ট ৩
৬১৪	১২১৭ এপ্রিল ১০	৬৩৮	১২৪০ জুলাই ২৩
৬১৫	১২১৮ মার্চ ৩০	৬৩৯	১২৪১ জুলাই ১২
৬১৬	১২১৯ মার্চ ১৯	৬৪০	১২৪২ জুলাই ১
৬১৭	১২২০ মার্চ ৮	৬৪১	১২৪৩ জুন ২১
৬১৮	১২২১ ফেব্রুয়ারী ২৫	৬৪২	১২৪৪ জুন ৯
৬১৯	১২২২ ফেব্রুয়ারী ১৫	৬৪৩	১২৪৫ মে ২৯
৬২০	১২২৩ ফেব্রুয়ারী ৪	৬৪৪	১২৪৬ মে ১৯
৬২১	১২২৪ জানুয়ারী ২৪	৬৪৫	১২৪৭ মে ৮
৬২২	১২২৫ জানুয়ারী ১৩	৬৪৬	১২৪৮ এপ্রিল ২৬
৬২৩	১২২৬ জানুয়ারী ২	৬৪৭	১২৪৯ এপ্রিল ১৬
৬২৪	১২২৬ ডিসেম্বর ২২	৬৪৮	১২৫০ এপ্রিল ৫

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দ
৬৪৯	১২৫১ মার্চ ২৬
৬৫০	১২৫২ মার্চ ১৪
৬৫১	১২৫৩ মার্চ ৩
৬৫২	১২৫৪ ফেব্রুয়ারী ২১
৬৫৩	১২৫৫ ফেব্রুয়ারী ১০
৬৫৪	১২৫৬ জানুয়ারী ৩০
৬৫৫	১২৫৭ জানুয়ারী ১৯
৬৫৬	১২৫৮ জানুয়ারী ৮
৬৫৭	১২৫৮ ডিসেম্বর ২৯
৬৫৮	১২৫৯ ডিসেম্বর ১৮
৬৫৯	১২৬০ ডিসেম্বর ৬
৬৬০	১২৬১ নভেম্বর ২৬
৬৬১	১২৬২ নভেম্বর ১৫
৬৬২	১২৬৩ নভেম্বর ৪
৬৬৩	১২৬৪ অক্টোবর ২৪
৬৬৪	১২৬৫ অক্টোবর ১৩
৬৬৫	১২৬৬ অক্টোবর ২
৬৬৬	১২৬৭ সেপ্টেম্বর ২২
৬৬৭	১২৬৮ সেপ্টেম্বর ১০
৬৬৮	১২৬৯ আগস্ট ৩১
৬৬৯	১২৭০ আগস্ট ২০
৬৭০	১২৭১ আগস্ট ৯
৬৭১	১২৭২ জুলাই ২৯
৬৭২	১২৭৩ জুলাই ১৮
৬৭৩	১২৭৪ জুলাই ৭
৬৭৪	১২৭৫ জুন ২৭
৬৭৫	১২৭৬ জুন ১৫
৬৭৬	১২৭৭ জুন ৪

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দ
৬৭৭	১২৭৮ মে ২৫
৬৭৮	১২৭৯ মে ১৪
৬৭৯	১২৮০ মে ৩
৬৮০	১২৮১ এপ্রিল ২২
৬৮১	১২৮২ এপ্রিল ১১
৬৮২	১২৮৩ এপ্রিল ১
৬৮৩	১২৮৪ মার্চ ২০
৬৮৪	১২৮৫ মার্চ ৯
৬৮৫	১২৮৬ ফেব্রুয়ারী ২৭
৬৮৬	১২৮৭ ফেব্রুয়ারী ১৬
৬৮৭	১২৮৮ ফেব্রুয়ারী ৬
৬৮৮	১২৮৯ জানুয়ারী ২৫
৬৮৯	১২৯০ জানুয়ারী ১৪
৬৯০	১২৯১ জানুয়ারী ৪
৬৯১	১২৯১ ডিসেম্বর ২৪
৬৯২	১২৯২ ডিসেম্বর ১২
৬৯৩	১২৯৩ ডিসেম্বর ২
৬৯৪	১২৯৪ নভেম্বর ২১
৬৯৫	১২৯৫ নভেম্বর ১০
৬৯৬	১২৯৬ অক্টোবর ৩০
৬৯৭	১২৯৭ অক্টোবর ১৯
৬৯৮	১২৯৮ অক্টোবর ৯
৬৯৯	১২৯৯ সেপ্টেম্বর ২৮
৭০০	১৩০০ সেপ্টেম্বর ১৬
৭০১	১৩০১ সেপ্টেম্বর ৬
৭০২	১৩০২ আগস্ট ২৬
৭০৩	১৩০৩ আগস্ট ১৫
৭০৪	১৩০৪ আগস্ট ৪

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দ
৭০৫	১৩০৫ জুলাই ২৪	৭২৩	১৩২৩ জানুয়ারী ১০
৭০৬	১৩০৬ জুলাই ১৩	৭২৪	১৩২৩ ডিসেম্বর ৩০
৭০৭	১৩০৭ জুলাই ৩	৭২৫	১৩২৪ ডিসেম্বর ১৮
৭০৮	১৩০৮ জুন ২১	৭২৬	১৩২৫ ডিসেম্বর ৮
৭০৯	১৩০৯ জুন ১১	৭২৭	১৩২৬ নভেম্বর ২৭
৭১০	১৩১০ মে ৩১	৭২৮	১৩২৭ নভেম্বর ১৭
৭১১	১৩১১ মে ২০	৭২৯	১৩২৮ নভেম্বর ৫
৭১২	১৩১২ মে ৯	৭৩০	১৩২৯ অক্টোবর ২৫
৭১৩	১৩১৩ এপ্রিল ২৮	৭৩১	১৩৩০ অক্টোবর ১৫
৭১৪	১৩১৪ এপ্রিল ১৭	৭৩২	১৩৩১ অক্টোবর ৪
৭১৫	১৩১৫ এপ্রিল ৭	৭৩৩	১৩৩২ সেপ্টেম্বর ২২
৭১৬	১৩১৬ মার্চ ২৬	৭৩৪	১৩৩৩ সেপ্টেম্বর ১২
৭১৭	১৩১৭ মার্চ ১৬	৭৩৫	১৩৩৪ সেপ্টেম্বর ১
৭১৮	১৩১৮ মার্চ ৫	৭৩৬	১৩৩৫ আগস্ট ২১
৭১৯	১৩১৯ ফেব্রুয়ারী ২২	৭৩৭	১৩৩৬ আগস্ট ১০
৭২০	১৩২০ ফেব্রুয়ারী ১২	৭৩৮	১৩৩৭ জুলাই ৩০
৭২১	১৩২১ জানুয়ারী ৩১	৭৩৯	১৩৩৮ জুলাই ২০
৭২২	১৩২২ জানুয়ারী ২০		

নির্ঘণ্ট

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
২৭	৪	খ্রীষ্টাব্দে	শকাব্দে
৭২	১	জিয়াউদ্দীন বারনির	য়াহিআ বিন শিরহিন্দীর
১০০	২১	ইতগীন।	ইতগীন—এঁর নাম কায়-কাউসের দেবীকোট ও ত্রিবেণী শিলালিপিতে পাওয়া যায়।
১৭৩	১৫-১৭	জলঙ্গী বেয়ে…মনে করি।	জলঙ্গী বেয়ে পদ্মায় পড়ে পূর্ব বঙ্গে যেতে পারেন।

চিত্র ১

কানাই বড়শী শিলালিপি
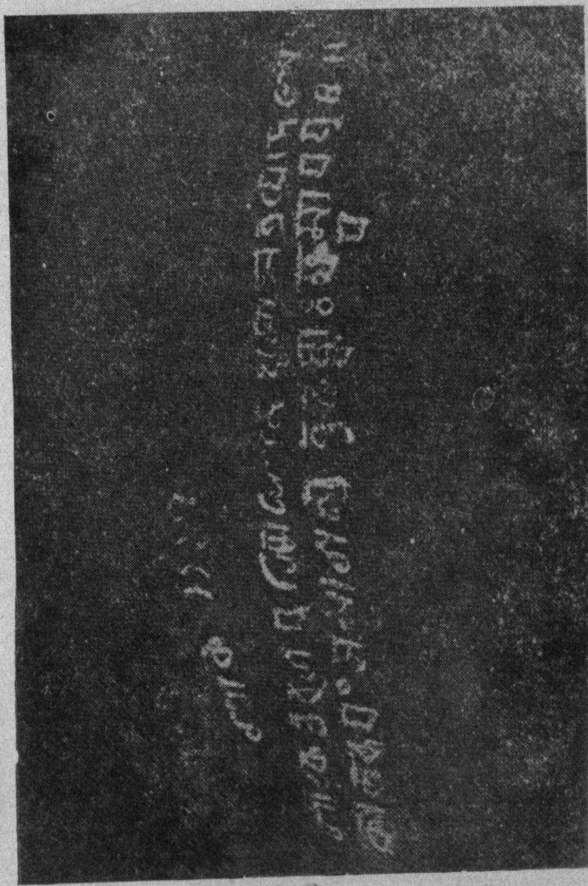
[পৃঃ ১৯-২০]

চিত্র ২

সিয়ান গ্রামের শিলালিপি (ডান দিক)

[পৃঃ ৪০-৪১]

চিত্র ৩

সিয়ান গ্রামের শিলালিপি (বাঁ দিক)

[পৃঃ ৪০-৪১]

চিত্র ৪

তুগরল খান বা মুইজ্জুদ্দীন তুগরল শাহের মুদ্রা (সামনের দিক)
[পৃঃ ২৩৬]

চিত্র ৫

তুগরল খান বা মুইজ্জুদ্দীন তুগরল শাহের মুদ্রা (পিছনের দিক)
[পৃঃ ২৩৬]

চিত্র ৬
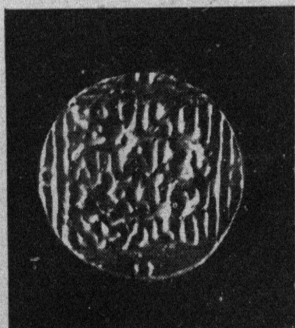
বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মৃদ শাহের মুদ্রা (সামনের দিক)
[পৃঃ ২৩৭]

চিত্র ৭

বুগরা খান বা নাসিরুদ্দীন মাহমৃদ শাহের মুদ্রা (পিছনের দিক)
[পৃঃ ২৩৭]